খাচ্ছো না ... কাপড়খানা কেচে আল্‌নায় রেখে গিইচি, কাচা কাপড়খানা জল ছিটিয়ে এঁটো ক'রে বসে আছো ?

মেজকাকীমার এক পিসী না মাসী এ বাড়িতে থাকে, বুড়ী ভারী বাগড়াটে আর জ্যাঠাইমার খোসামুদে। বয়স পঞ্চাশ-ষাট হবে, কালো, একহারা, দড়িপাকানো গড়ন—সীতা আর আমি আড়ালে বলি—তাড়কা রাক্কুসী। নানা ছুতো-নাতায় মাকে অনেকবার বকুনি খাইয়েচে জ্যাঠাইমা-কাকীমাদের কাছে। ওকে দু-চক্ষে আমরা দেখতে পারিনে। জ্যাঠাইমার গলার স্বর শুনে রান্নাঘরের উঠোন থেকে বুড়ী ছুটে এল।

—কি হয়েচে বৌমা, কি হয়েচে ?

জ্যাঠাইমা বললেন—সন্দেবেলা আহ্নিক ক'রবো ব'লে কাপড়খানা কেচে আল্‌নায় দিয়ে রেখেচি মাসী—আর বুড়ো ধাড়ি ছোঁড়া করেচে কি, এখানে মুড়ি খেয়ে সেই বাটীতেই জল দিয়ে হাত ধুয়েচে, আর এই রোয়াকের ধারেই ত কাপড়—তুমি কি বলতে চাও কাপড়ে লাগেনি জলের ছিটে ?

বুড়ী অবাক হবার ভান ক'রে বললে—ওমা সে কি কথা! লাগেনি আবার, একশো বার লেগেচে।

আমি ভাবলাম, বারে! এতে আর হয়েচে কি ? জল যদি লেগেই থাকে, দু-চার ফোঁটা লেগেচে বইতো নয় ? জ্যাঠাইমাকে বললাম—জল তো ওতে লাগেনি জ্যাঠাইমা, আর যদিও একটু লেগে থাকে, এখনও রোদ রয়েচে, এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে'খন।

বুড়ী বললে—শোন কথা। ও ছোঁড়ার জ্ঞান-কাণ্ড একেবারেই নেই—একেবারে স্লেচ্ছো—ওর মাও তাই। হিঁদুয়ানি তো শেখেনি কোনোদিন—

—তোমরা শোন মাসী, আমি শুনে শুনে হদ্দ হয়ে গিয়েচি। ঘরে ঠাকুর রয়েচেন, আর এই সব অনাচার কি ক'রে ...

তুমি? আমার কোনও ছেলেমেয়ে ওরকম করবে? অত বড় ধাড়ী ছেলে হ'ল, মুড়ির বাটীতে জল ঢাললে যে শকড়ী হয় সে ও জানে না! শুনবে কোথা থেকে, মেলেচ্ছো খিরিষ্টানের মধ্যে এতকাল কাটিয়ে এসেচে, ভাল শিক্ষে দিয়েচে কে? হিঁদুর বাড়িতে কি এ-সব পোষায়? বল তো তুমি—

বুড়ী বললে—ওর মা জানে না তা ও জানবে কোথা থেকে? সেদিন ওর মা করেচে কি, পুকুর ঘাটে তো বড় নৈবিদ্যির বারকোশখানা ধুতে নিয়ে গিয়েচে—যেদিন ঠাকুর এলেন (বুড়ী উদ্দেশ্যে দু-হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলে) তার পরের দিন—আমি দাঁড়িয়ে ঘাটে, কাপড় কেচে যখন উঠলি তখন ধোওয়া বারকোশখানা আর একবার জলে ডুবো—না ডুবিয়েই অমনি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্চে। আমি দেখে বলি, ও কি কাণ্ড বউ? ভাগ্যিস্ দেখে ফেললাম তাই তো—

মায়ের দোষ দেওয়াতেই হোক্, বা আমাকে আগের ওই সব কথা বলাতেই হোক্, আমার রাগ হ'ল। তা ছাড়া আমার মন বললে এতে কোন দোষ হয়নি—মুড়ির বাটীতে জল ঢালার দরুণে মুড়ির বাটী অপবিত্র হবে কেন? মা বারকোশ ধুয়ে জলের ধারে রেখে স্নান সেরে উঠে যদি সে বারকোশ নিয়ে এসে থাকেন, তাতে মা কোন অন্যায় কাজ করেন নি। বললাম—ওতে দোষ কি জ্যাঠাইমা, মুড়িও খাবার জিনিষ, জলও খাবার জিনিষ—দুটোতে মেশালে খারাপ হবে কেন, ছুঁতে থাকবেই বা না কেন?

জ্যাঠাইমা অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে উঠলেন—তোর কাছে শাস্তর শুনতে আসিনি, ফাজিল ছোঁড়া কোথাকার—তোরা তো খিরিষ্টান, হিঁদুর আচারব্যাভার তোরা জানিস্ কি, তোর মা-ই বা জানে কি? ওইটুকু ছেলে গাল টিপলে দুধ বেরোয়, উনি আবার আমায় শাস্তর বোঝাতে আসেন। শিখবি কোত্থেকে, তোর মা তোদের কি কিছু শিখিয়েচে, না

কিছু জানে? পয়সা রোজগার করেচে আর দু-হাতে উড়িয়েচে তোর বাবা—মদ খেয়ে খিরিষ্টানি কোরে—

বুড়ী বললে—মোলোও সেই রকম। যেমন-যেমন কম্মফল তেমন-তেমন মিত্যু! দশেধম্মে দেখলে সবাই, যে কম্মের যে শাস্তি—ঘর থেকে মড়া বেরোয় না, ও পাড়ার হরিদাস না এসে পড়লে ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকতো—

বাবার মৃত্যু সম্পর্কে এ কথা বলাতে আমার রাগ হ'ল। তাঁর মরণের পরে এখন তাঁর কথা ভেবে আমার বড় কষ্ট হয়, যদিও সে কথা কাউকে বলিনে। বললাম—ভাল মরণ আর মন্দ মরণ নিয়ে বাহাদুরী কি দিদিমা? এই তো মাঘ মাসে ওই তেঁতুলতলায় যাদের বাড়ি, ওই বাড়ির সেই বুড়ো গাঙ্গুলী-মশায় মারা গেলেন, তিনি তো খুব ভালমানুষ ছিলেন সবাই বলে, পুকুরের ঘাটে এক বেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করতেন, তবে তিনি পেনসন্ আনতে গিয়ে ও-রকম ক'রে সেখানে মারা গেলেন কেন? সেখানে কে তাঁর মুখে জল দিয়েচে, কে মড়া ছুঁয়েছে, কোথায় ছিল ছেলেমেয়ে, ও-রকম হ'ল কেন?

আমার বোকামি! আমি ভেবেছিলাম ঠিকমত যুক্তি দেখিয়ে বুড়ীকে তর্কে হারাবো, কিন্তু তার ধরণের ঝগড়ায় মজবুত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে যে অত সহজে হার মেনে নেবে, এ ধারণা করাই আমার ভুল হয়েছিল? সে যুক্তির পথে গেলই না।

—মরুক বুড়ো গাঙ্গুলী, তবুও খবর পেয়ে তার ছেলেজামাই গিয়ে তাকে এনে গঙ্গায় দিয়েছিল, তোর বাবার মত দোগেছের মাঠে ডোবার জলে আধপোড়া ক'রে ফেলে রেখে আসেনি! আমি সব জানি, আমায় ঘাঁটাসনে, অনেক আড্ডিনাড়ির কথা বেরিয়ে যাবে। কাঠ জোটেনি, খেজুরের ডাল দিয়ে পুড়িয়েছিল, সব শুনিচি আমি। দোগেছের মাঠে সন্দের পর লোক যায় না, সবাই বলে এখনও ভূত হয়—

কথা সবই সত্যি, শেষেরটুকু ছাড়া। ঐটুকুর ওপরই জোর দিয়ে বললাম—মিথ্যে কথা, বাবা কথ্খনো—তারপর যুক্তির অকাট্যতা প্রমাণ করবার জন্যে এমন একটা কথা ব'লে ফেললাম যা কখনো কারুর কাছে বলিনি বা খুব রেগে মরিয়া না হ'য়ে উঠলে বলতামও না এদের কাছে। বললাম—জানেন, আমি ভূত দেখতে পাই, অনেক দেখেছি, বাবাকে তা'হলে নিশ্চয়ই আমি দেখতে পেতাম, জানেন? চা-বাগানে থাকতে আমি কত—

এই পর্য্যন্ত বলেই আমি চুপ করে গেলাম। দিদিমা খিল্ খিল্ ক'রে হেসেই খুন।—হি হি, এ ছোঁড়াও পাগল ওর বাপের মত—হি হি—শুনেচো বউমা, হি হি—কি বলে শুনেচো একবার—

জ্যাঠাইমা বললেন—যা এখান থেকে এই মুড়ির বাটি তুলে ধুয়ে নিয়ে আয় পুকুর থেকে, এই গাড়ুর জল দিয়ে ধুয়ে দে। আমার কাপড়খানাও কেচে নিয়ে আয় অমনি, তোর সঙ্গে কে এখন সন্দে অবধি তক্কো করে? তবে ব'লে দিচ্চি, হিঁদুর ঘরে হিঁদুর মত ব্যাভার না করলে এ বাড়িতে জায়গা হবে না। পষ্ট কথায় কষ্ট নেই, কই আমাদের বুলু, ভুন্টি, হারু কি সতীশ তো কখনও এমন করে না, যা বলি তখুনি তাই তো শোনে, কই এক দিনের জন্যও তো—

দিদিমা বললেন—ওমা, বুলু, হারু, সতীশের কথা ব'লো না, তারা আমার বেঁচে থাক, সোনার চাঁদ ছেলে মেয়ে সব। তারা হিঁদুয়ানির যা জানে ওর মা তা জানে না তো ও! সেদিন সতীশকে বল্‌চি, সতু দাদাভাই, তেলের ভাঁড়টা বাইরের উঠোনে নিয়ে কলুকে দিয়ে এসো তো? তো বলচে—আমার বিছানার কাপড়, আমি তো ভাঁড় ছোঁব না। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, ভ্যাগো শিক্ষের গুণ ভ্যাগো—কেমন ঘরে মানুষ তারা। আহা বেঁচে থাক্—সব বেঁচে থাক্—

মনে মনে সতীশের প্রশংসা করতে চেষ্টা করলাম। সতীশ যে স্বীকার করেচে তার কাপড় বাসি, এটা অবিশ্যি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বাসি কাপড়ে কিছু ছোঁয়া যে খারাপ কাজ, এ বিশ্বাস যার নেই, তাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কি ক'রে, এ আমি বুঝতে পারিনে। যেমন, এখনই আমার মনে একটা প্রশ্ন এসেছে যে, নিমু কলু কি কাচা, ধোওয়া, শুদ্ধ গরদের জোড় প'রে তেল বেচতে এসেছিল? সতীশের ভেবে দেখবার ক্ষমতা ও বুদ্ধির চেয়ে যদি কারুর বুদ্ধি ও বুঝবার শক্তি বেশী থাকে, তার জন্যে তাকে কি নরকে পচে মরতে হবে?

২

তিন বছর এখনও হয়নি, আমরা এ গাঁয়ে এসেছি। তার আগে ছিলাম কার্সিয়ঙের কাছে একটা চা-বাগানে, বাবা সেখানে চাকরি করতেন। সেখানেই আমি ও সীতা জন্মেছি, (কেবল দাদা নয়, দাদা জন্মেছে হনুমাননগরে, বাবা তখন সেখানে রেলে কাজ করতেন) সেখানেই আমরা বড় হয়েছি, এখানে আসবার আগে এত বড় সমতলভূমি কখনো দেখিনি। আমরা জানতাম চা-ঝোপ, ওক আর পাইনের বন, ধুরা গাছের বন, পাহাড়ী ডালিয়ার বন, ঝর্ণা, কন্‌কনে শীত, দূরে বরফে ঢাকা বড় বড় পাহাড়-পর্ব্বতের চূড়া, মেঘ, কুয়াসা, বৃষ্টি। এখানে প্রায়ই মাঝে মাঝে চা-বাগানের কথা, আমাদের নেপালী চাকর থাপার কথা, উম্‌প্রাঙের ডাক-রানার খড়্গ সিং—আমাদের বাংলোতে মাঝে মাঝে ভাত খেতে আসতো—তার কথা, মিস্ নর্টনের কথা, পচাং বাগানের মাসীমার কথা, আমাদের বাগানের নীচে সেই অদ্ভুত রাস্তাটার কথা, মনে হয়।

সেই সব দিনই আমাদের সুখে কেটেচে। দুঃখের সুরু হয়েছে যে-দিন বাংলা দেশে পা দিয়েছি। এই জন্যে এই তিন বছরেও বাংলা দেশকে ভাল লাগ্‌লো না—মন ছুটে যায় আবার সেই সব জায়গায়, চা-বাগানে, সেওলা-ঝোলা বড় বড় ওকের বনে, উমপ্লাঙের মিশন-হাউসের মাঠে—যেখানে আমি, সীতা, দাদা কতদিন সকালে ফুল তুলতে যেতাম, বড়দিনের সময় ছবির কার্ড আন্‌তে যেতাম, কেমন মিষ্টি কথা বলতো, ভালবাস্‌তো মিস্ নর্টন। ভাবতে বসলে এক-একটা দিনের কথা এমন চমৎকার মনে আসে!···

শীতের সকাল।

বাড়ির বার হয়েই দেখি চারিধারে বনে জঙ্গলে পাহাড়ের ঢালুর গায়ে পাইন গাছের ফাঁকে বেশ রোদ। আমি উঠতাম খুব সকালেই, সীতা ও দাদা তখন লেপের তলায়, চা না পেলে এই হাড়কাঁপানো শীতে উঠতে কেউ রাজী নয়।

শীতও পড়েছে দস্তুরমত। আমাদের বাগানের দক্ষিণে কিছু দূরে যে বড় চা-বাগানটা নতুন হয়েছে, যার বাংলোগুলোর লাল টালির ঢালু ছাদ আমাদের এখান থেকে দেখা যায় পাইন গাছের ফাঁকে, আজ তাদের লোকজনেরা চায়ের চারাগাছ খড়ের পালুটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে, বোধ হয় বরফ পড়বার ভয়ে। আকাশ পরিষ্কার, সুনীল, কোনোদিকে এতটুকু কুয়াসা নেই; বরফ পড়বার দিন বটে।

একটু পরে সীতা উঠল। সে রোগা, ফর্সা, ছিপ্‌ছিপে। সে ও দাদা খুব ফর্সা, তবে অত ছিপ্‌ছিপে আর কেউ নয়। সীতা বললে, বাবা কোথায় গেল দাদা? আজ ও সোনাদা যাবে? বাজার থেকে একটা জিনিষ আনতে দেবো।

আমি বললাম,—কি জিনিষ রে?

সীতা দুষ্টমির হাসি হেসে বললে, বলবো কেন? তোমরা যে কত জিনিষ আনো, আমায় বলো?

একটু পরে থাপা এল। সে হপ্তায় দু-দিন সোনাদা বাজারে যায় তরকারী আর মাংস আন্‌তে। সীতা চুপি চুপি তাকে কি আন্‌তে ব'লে দিলে, আড়ালে থাপাকে জিগ্যেস ক'রে জান্‌লাম জিনিষটা একপাতা সেফটি পিন্। এরই জন্যে এতো!

একটু বেলায় বরফ পড়তে সুরু হ'ল। দেখতে দেখতে বাড়ির ছাদ, গাছপালার মাথা, পথঘাট যেন নরম থোলা থোলা পেঁজা কাপাস তুলোতে ঢেকে গেল। এই সময়টা ভারি ভাল লাগে, আগুনের আংটাতে গণগণে আগুন—হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে আগুনের চারিধারে বসে আমি, দাদা ও সীতা লুডো খেল্‌তে সুরু ক'রে দিলাম।

এই সময় বাবা এলেন আফিস থেকে। ম্যানেজারের কুঠীর পাশেই আপিস-ঘর, আমাদের বাংলো থেকে প্রায় মাইলখানেক, কি তার একটু বেশী। বাবা বেলা এগারোটার সময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া ক'রে একটু বিশ্রাম করেন, তিনটের পরে বেরোন, ওদিকে রাত আটটা ন'টায় আসেন।

বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে খেতে ভালবাসতেন। সীতাকে ডেকে বললেন—খুকী থাপাকে বলে দে নাইবার জন্যে জল গরম করতে —আর তোরা সব আজ আমার সঙ্গে খাবি—নিতুকে বলিস্ নইলে সে আগেই খাবে।

মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। সীতা গিয়া বললে—মা, দাদাকে আগে ভাত দিও না, আমরা সবাই বাবার সঙ্গে খাবো।

সীতার কথা শেষ না হ'তে দাদা গিয়ে রান্নাঘরে হাজির। দাদা খিদে মোটে সহ্য করতে পারে না—তাই আমাদের সকলের আগে মা

তাকে খেতে দিতেন। এদিকে আমাদের ক' ভাই-বোনের মধ্যে বাবা সকলের চেয়ে ভালবাসতেন দাদাকে ও সীতাকে। দাদাকে খাওয়ার সময়ে কাছে বসে না খেতে দেখলে তিনি কেমন একটু নিরাশ হ'তেন—যেন অনেকক্ষণ ধরে যেটা চাইছিলেন, সেটা হ'ল না।

সীতা বললে—দাদা তুমি খেও না, বাবা আজ সকলকে নিয়ে খাবেন। বাবা নাইচেন, এক্ষুনি আমরা খেতে বসবো—

দাদা কড়া থেকে মাকে একটুক্‌রো মাংস তুলে দিতে বললে এবং গরম টুক্‌রোটা মুখে পূরে দিয়ে আবার তখুনি তাড়াতাড়ি বার ক'রে ফেলে, বার-দুই ফুঁ দিয়ে আবার মুখে পুরে নাচতে নাচতে চলে গেল। দাদাকে আমরা সবাই খুব ভালবাসি, দাদা বয়সে সকলের চেয়ে বড় হলেও এখনও সকলের চেয়ে ছেলে মানুষ। ও সকলের আগে খাবে, সকলের আগে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুরিয়ে কথা বললে বুঝবে না, অন্ধকারে একলা ঘরে শুতে পারবে না—ওর বয়স যদিও বছর চোদ্দ হ'ল, কিন্তু এখনও আমাদের চেয়ে ও ছেলেমানুষ, প্রথম সন্তান ব'লে বাপ-মায়ের বেশী আদর ওরই ওপর।

আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। বাবা সীতাকে একপাশে ও দাদাকে আর একপাশে নিয়ে খেতে বসেচেন। মাংসের বাটি থেকে বাবা চর্ব্বি বেছে বেছে ফেলে দিতেই সীতা বললে—বাবা আমি খাবো,—

দাদা বললে—তুই সব খাস্‌নে, আমাকে দু-খানা দে সীতা—

বাবা অত চর্ব্বি ওদের খেতে দিলেন না। ওদের এক এক টুক্‌রে দিয়ে বাকী টুকরোগুলো বেরালদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমায় বললেন—জিতু, গায়ের মাপটা দিস্ তো তোর, ওবেলা সায়েবের দর্জ্জি আস্‌বে, তার কাছে তোর জামা করতে দেবো—

সীতা বলল—আমার আর একটা জামা দরকার বাবা—

—তবে তুইও দিস্ গায়ের মাপটা,—ওই সঙ্গেই দিস্—

মা বললেন—তার দরকার কি, তুমি তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিও না? আমি সব দেখে শুনে দেবো—আরও কয়বার জিনিস রয়েচে—নিতুর মোটে দুটো জামা, ওর ওভার-কোটটা পুরনো হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে—যেমন শীত পড়েছে এবার, ওর একটা ওভার কোট করে দাও—

বিকেলে মেমেরা মাকে পড়াতে এল।

মাইল দুই দূরে মিশনরীদের একটা আড্ডা আছে। আমি একবার মেমসাহেবদের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম। এখান থেকে খোসালডি চা-বাগানে যে রাস্তাটা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমেচে—তারই ধারে ওদের বাংলো। অনেকগুলো লাল টালির ছোট বড় ঘর, বাঁশের জাফ্‌রীর বেড়ায় ঘেরা কম্পাউণ্ড, এই শীতকালে অজস্র ডালিয়া ফোটে, বড় বড় ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছ। আমাদের বাগানেও বড় সাহেবের বাংলোতে দুটো ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছ আছে।

এরা মাকে পড়ায়, সীতাকেও পড়ায়। মিস্ নর্টন দিনাজপুরে ছিল, বেশ বাংলা বলতে পারে। নানা ধরণের ছবিওয়ালা কার্ড, লাল সবুজ রঙের ছোট ছোট ছাপানো কাগজ, তাতে অনেক মজার গল্প থাকে। দাদার পড়াশুনায় তত ঝোঁক নেই, আমি ও সীতা পড়ি। একবার একখানা বই দিয়েছিল—একটা গল্পের বই—‘সুবর্ণবণিক পুত্র’। এ কথায় আমি *বুঝেছিলাম বণিকপুত্র সোনা দিয়ে গড়া অর্থাৎ সোনার মত ভাল। পাপের পথ থেকে উক্ত বণিকপুত্র কি করে ফিরে এসে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করলে, এরই গল্প। অনেক কথা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু বইখানা এমন ভাল লাগ্‌তো!...*

মেম আস্‌তো দু-জন। একজনের বয়স বেশী—মায়ের চেয়েও বেশী। আর একজনের বয়স খুব কম। অল্প বয়সী মেমটির নাম মিস্ নর্টন—একে আমার খুব ভাল লাগতো—নীল চোখ, সোনালি চুল, আমার কাছে মিস্ নর্টনের মুখ এত সুন্দর লাগতো, বার-বার ওর

মুখের দিকে চাইতে ইচ্ছে করত, কিন্তু কেমন লজ্জা হ'ত—ভাল ক'রে চাইতে পারতাম না—অনেক সময় সে অন্যদিকে চোক ফিরিয়ে থাক্‌বার সময় লুকিয়ে এক চমক দেখে নিতাম। তখনি ভয় হ'ত হয়ত সীতা দেখছে—সীতা হয়ত এ নিয়ে ঠাট্টা করবে। ওরা আসতো বুধবারে ও শনিবারে। সপ্তাহে অন্যদিনগুলো যেন কাটতে চাইত না, দিন গুণতাম কবে বুধবার আস্‌বে, কবে শনিবার হবে। মিস্ নর্টনের মত সুন্দরী মেয়ে আমি কখনো দেখিনি—আমার এই এগার-বার বছরের জীবনে।

কিন্তু মাঝে মাঝে এমনি হতাশ হ'তে হ'ত! দিন গুণে গুণে বুধবার এল, কিন্তু প্রৌঢ়া মেমটি হয়ত সেদিন এল একা, সঙ্গে মিস্ নর্টন নেই—সারা দিনটা বিস্বাদ হ'য়ে যেতো, মিস্ নর্টনের ওপর মনে মনে অভিমান হ'ত, অথচ কেন আজ মিস্ নর্টন এল না সে কথা কাউকে জিগ্যেস করতে লজ্জা হ'ত।

মেমেরা এক এক দিন আমাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শেখাতো। মা তখন থাকতেন না। আমি, সীতা ও দাদা চোখ বুজতাম—মিস্ নর্টন ও তার সঙ্গিনী চোখ বুজতো। 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা সদাপ্রভু'—সবাই একসঙ্গে গম্ভীর সুরে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখতুম সবাই চোখ বুজে আছে, কেবল সীতা চোখ খুলে একবার জিব বার করেই আমার দিকে চেয়ে একবার দুষ্টুমির হাসি হাস্‌লে—পরক্ষণেই আবার প্রার্থনায় যোগ দিলে।

সীতা ঐ রকম, ও কিছু মানে না, নিজের খেয়াল খুশীতে থাকে, যাকে পছন্দ করবে তাকে খুবই পছন্দ করবে, আবার যাকে দেখতে পারবে না তার কিছুই ভাল দেখবে না। ওর সাহসও খুব, দাদা যা করতে সাহস করে না, এমন কি আমিও যা অনেক সময় করতে ইতস্ততঃ করি—ও তা নির্ব্বিচারে করে। আমাদের বাংলো থেকে খানিকটা দূরে বনের মধ্যে একটা দেবস্থান আছে—পাহাড়ীদের ঠাকুর থাকে।

একটা বড় সরল গাছের তলায় কতকগুলো পাথর—ওরা সেখানে মুরগী বলি দেয়, ঢাক বাজায়। সবাই বলে ওখানে ভূত আছে, জায়গাটা যেমন অন্ধকার তেমনি নির্জ্জন,—একবার দাদা তর্ক তুলে বললে আমরা কখনই ওখানে একা যেতে পারবো না। আমি ভেবে উত্তর দেওয়ার আগেই সীতা বাংলোর বার হ'য়ে চ'লে গেল একাই—কোনো উত্তর না দিয়েই ছুট দিলে পাহাড়ীদের সেই নির্জ্জন ঠাকুরতলার দিকে।···ওই রকম ওর মেজাজ।···

মিস্ নর্টন সীতাকে খুব ভালবাসে। মাঝে মাঝে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যায় ওদের মিশনবাড়িতে, ওকে ছবির বই, পুতুল, কেক, বিস্কুট, কত কি দেয়—ছবি আঁক্‌তে শেখায়, বুন্‌তে শেখায়—এরই মধ্যে সীতা বেশ পশমের ফুল তুলতে পারে, মানুষের মুখ, কুকুর আঁক্‌তে পারে। ওরা আমাকেও অনেক বই দিয়েচে—মথি-লিখিত সুসমাচার, লুক-লিখিত সুসমাচার, যোহন-লিখিত সুসমাচার, সদাপ্রভুর কাহিনী—আরও অনেক সব। যীশু একটুক্‌রো মাছ ও আধখানা রুটিতে হাজার লোককে ভোজন করালেন—গল্পটা পড়ে একবার আমার হঠাৎ মাছ ও রুটী খাবার সাধ হ'ল। কিন্তু মাছ এখানে মেলে না—মা ভরসা দিলেন খাওয়াবেন, কিন্তু দু-মাসের মধ্যেও সেবার মাছ পাওয়া গেল না, আমার সখও ক্রমে ক্রমে উবে গেল।

বাবার বন্ধু দু-একজন বাঙ্গালী মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এসে দু-একদিন থাকেন। মেমেরা মাকে পড়াতে আসে, এ ব্যাপারটা তাঁদের মনঃপূত নয়। বাবাকে তাঁরা কেউ কেউ বলেছেনও এ নিয়ে। কিন্তু বাবা বলেন—ওরা আসে, এজন্য এক পয়সা নেয় না—অথচ সীতাকে ছবি আঁকা, সেলাইয়ের কাজ শেখাচ্ছে—কি ক'রে ওদের বলি তোমরা আর এসো না? তা ছাড়া ওরা এলে মেয়েদের সময়ও ভালই কাটে, ওদের কেউ সঙ্গী নেই, এই নির্জ্জন চা-বাগানের এক পাশে পড়ে থাকে

—একটা লোকের মুখ দেখতে পায় না, কথা বলবার মানুষ পায় না—ওরা যদি আসেই তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি কি ?

মায়ের মনের একটা গোপন ইচ্ছা ছিল, সেটা কিন্তু পূর্ণ হয়নি। বাবা অত্যন্ত মদ খান—এবং যেদিন খুব বেশী ক'রে খেয়ে আসেন, সেদিন আমাদের বাংলো ছেড়ে পালাতে হয়। নইলে সবাইকে অত্যন্ত মারধর করেন। সে সময়ে তাঁকে আমরা যমের মত ভয় করি—এক সীতা ছাড়া। সীতা আমাদের মত পালায় না—চা-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে যায় না। সে বাংলোতেই থাকে, বলে মারবে বাবা ?··· না হয় মরে যাবো—তা কি হবে ? রোজ এ রকম ছুটোছুটি করার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। বাবার এই ব্যাপারের জন্যে আমাদের সংসারে শান্তি নেই—অথচ বাবা যখন প্রকৃতিস্থ থাকেন, তখন তাঁর মত মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার—এত শান্ত মেজাজ। যখন যা চাই এনে দেন, কাছে ডেকে আদর করেন, নিয়ে খেলা করেন, বেড়াতে যান—কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদ্‌লে গিয়ে অন্য মূর্ত্তি ধরেন, তখন বাংলো থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর আমাদের অন্য উপায় থাকে না।

মা'র ইচ্ছে ছিল মেমেদের ধর্ম্মের বই পড়ে যদি বাবার মতিগতি ফেরে। মেমেরা মদ্যপানের কু-ফলের বর্ণনাসূচক ছোট ছোট বই দিয়ে যেতো—মা সেগুলো বাবার বিছানায় রেখে দিতেন—কে জানে বাবা পড়তেন কিনা—কিন্তু এই দেড় বৎসরের মধ্যে আমাদের মাসের মধ্যে তিন-চার বার চা-ঝোপের আড়ালে লুকানো বন্ধ হয়নি।

প্রায়ই আমি আর সীতা কার্ট রোড ধ'রে বেড়াতে বেরুই। আমাদের বাগান থেকে মাইল দুই দূরে একটা ছোট ঘর আছে, আগে এখানে পোষ্ট আপিস ছিল, এখন উঠে যাওয়াতে শুধু ঘরটা পড়ে আছে—

উম্‌প্লাঙের ডাক-রাণার ঝড়-বৃষ্টি বা বরফপাতের সময়ে এখানে মাঝে মাঝে আশ্রয় নেয়। এই ঘরটা আমাদের ভ্রমণপথের শেষসীমা, এর ওদিকে আমরা যাই না যে তা নয়, কিন্তু সে কালেভদ্রে, কারণ ওখান থেকে উমপ্লাং পর্য্যন্ত খাড়া উৎরাই নাকি এক মাইলের মধ্যে প্রায় এগারো-শ ফুট নেমে গিয়েচে, মিস নর্টনের মুখে শুনেচি—যদিও বুঝিনে তার মানে কি। আমাদের অত দূর যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল না, যা আমরা চাই তা পোষ্ট আপিসের ভাঙা ঘর পর্য্যন্ত গেলেই যথেষ্ট পেতাম —দু-ধারে ঘন নির্জ্জন বন—আমাদের বাগানের নীচে গেলে আর সরলগাছ নেই—বনের তলা আর পরিষ্কার নেই, পাইন বন নেই, সে বন অনেক গভীর, অনেক নিবিড়, যেমন দুষ্প্রবেশ্য তেমনি অন্ধকার, কিন্তু আমাদের এত ভাল লাগে! বনের ফুলের অন্ত নেই—শীতে ফোটে বুনো গোলাপ, গ্রীষ্মকালে রডোড্রেণ্ডন বনের মাথায় পাহাড়ের দেওয়ালে লাল আগুনের বন্যা আনে, গায়ক পাখীরা মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে চারিধারের নির্জ্জন বনানী গানে মুখরিত ক'রে তোলে—ঝর্ণা শুকিয়ে গেলে আমরা শুকনো ঝর্ণার পাশের পথে পাথর ধ'রে ধ'রে নীচের নদীতে নামতাম—অতি সন্তর্পণে পাহাড়ের দেওয়াল ধ'রে ধ'রে, সীতা পেছনে, আমি আগে। দাদাও এক-একদিন আসতো—তবে সাধারণতঃ সে আমাদের এই-সব ব্যাপারে যোগ দিতে ভালবাসে না।

এক-একদিন আমি একাই আসি। নদীর খাতটা অনেক নীচে—তার পথ পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছে—যেমন পিছল তেমনি দুর্গম—নদীর খাতে একবার পা দিলে মনে হয় যেন একটা অন্ধকার পিপের মধ্যে ঢুকে গিয়েচি—দু-ধারে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল উঠেচে—জল তাদের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে জায়গায় জায়গায়—কোথাও অনাবৃত, কোথাও গাছপালা, বনফুল, লতা—মাথার ওপরে আকাশটা যেন

নীল কার্ট রোড—ঠিক অতটুকু চওড়া, ঐ রকম লম্বা, ওদিকে ওদিকে চলে গিয়েচে, মাঝে মাঝে টুক্‌রো মেঘ কার্ট রোড বেয়ে চলেচে, কখনও বা পাহাড়ের এ-দেওয়াল ও-দেওয়াল পার হয়ে চলে যাচ্ছে—মেঘের ঐ খেলা দেখতে আমার বড় ভাল লাগত—নদী-খাতের ধারে একখানা শেওলা ঢাকা ঠাণ্ডা পাথরের ওপর ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ উঁচু ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখতাম—বাড়ি ফিরবার কথা মনেই থাক্‌ত না।

মাঝে মাঝে আমার কি একটা ব্যাপার হ'ত। ওই রকম নির্জ্জন জায়গায় কতবার একটা জিনিষ দেখেচি।...

হয়ত দুপুরে চা-বাগানের কুলীরা কাজ সেরে সরল গাছের তলায় খেতে বসেচে—বাবা ম্যানেজারের বাংলোতে গিয়েচেন, সীতা ও দাদা ঘুমুচ্ছে—আমি কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে কার্ট রোড ধ'রে অনেক দূরে চলে যেতাম—আমাদের বাসা থেকে অনেক দূরে উমপ্রাঙের সেই পোড়ো পোষ্ট আপিস ছাড়িয়েও চ'লে যেতাম—পথ ক্রমে যত নীচে নেমেচে, বন জঙ্গল ততই ঘন, ততই অন্ধকার, লতাপাতায় জড়াজড়ি ততই বেশী—বেতের বন, বাঁশের বন সুরু হ'ত—ডালে ডালে পরগাছা ও অর্কিড ততই ঘন, পাখী ডাকত—সেই ধরণের একটা নিস্তব্ধ স্থানে একা গিয়ে বসতাম।

চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে দেখেচি অনেক দূরে পাহাড়ের ও বনানীর মাথার ওপরে নীলাকাশ বেয়ে যেন আর একটা পথ—আর একটা পাহাড় শ্রেণী—সব যেন মৃদু হলুদ রঙের আলো দিয়ে তৈরি—সে অন্য দেশ, সেখানেও এমনি গাছপালা, এমনি ফুল ফুটে আছে, হলুদ আলোর বিশাল জ্যোতির্ম্ময় পথটা এই পৃথিবীর পর্ব্বতশ্রেণীর ওপর দিয়ে শূন্য ভেদ ক'রে মেঘরাজ্যের ওদিকে কোথায় চ'লে গিয়েছে—দূরে আর একটা অজানা লোকালয়ের বাড়িঘর, তাদের লোকজনও দেখেছি, তারা আমাদের মত মানুষ নয়—তাদের মুখ ভাল দেখতে

পেতাম না—কিন্তু তারাও আমাদের মত ব্যস্ত, হলুদ রঙের পথটা তাদের যাতায়াতের পথ। ভাল ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখেছি সে-সব মেঘ নয়, মেঘের ওপর পাহাড়ী রঙের খেলার ধাঁধা নয়—সে-সব সত্যি, আমাদের এই পৃথিবীর মতই তাদের বাড়িঘর, তাদের অধিবাসী, তাদের বনপর্ব্বত, সত্যি—আমার চোখের ভুল যে নয় এ আমি মনে মনে বুঝতাম, কিন্তু কাউকে বলতে সাহস হ'ত না—মাকে না, এমন কি সীতাকেও না—পাছে তারা হেসে উঠে সব উড়িয়ে দেয়।

এ রকম একবার নয়, কতবার দেখেছি। আগে আগে আমার মনে হ'ত আমি যেমন দেখি, সবাই বোধ হয় ওরকম দেখে। কিন্তু সেবার আমার ভুল ভেঙে যায়। আমি একদিন মাকে জিগ্যেস করেছিলাম—আচ্ছা মা, পাহাড়ের ওদিকে আকাশের গায় ওসব কি দেখা যায়?···

মা বললেন—কোথায় রে?···

—ওই কার্ট রোডের ধারে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় বসেছিলাম, তাই দেখলাম আকাশের গায়ে একটা নদী—আমাদের মত ছোট নদী নয়—সে খুব বড়, কত গাছপালা—দেখনি মা?···

—দূর্ পাগ্‌লা—ও মেঘ, বিকেলে ওরকম দেখায়।

—না মা, মেঘ নয়, মেঘ আমি চিনিনে? ও আর একটা দেশের মত, তাদের লোকজন পষ্ট দেখেচি যে—তুমি দেখনি কখনও?

—আমার ওসব দেখবার সময় নেই, ঘরকন্না তাই ঠেলে উঠতে পারিনে, নিতুটার আবার আজ প'ড়ে পা ভেঙে গিয়েচে—আমার মরবার অবসার নেই—ও-সব তুমি দেখগে বাবা।

বুঝলাম মা আমার কথা অবিশ্বাস করলেন। সীতাকেও একবার বলেছিলাম—সে কথাটা বুঝতেই পারলে না। দাদাকে কখনও কিছু বলিনি।

আমার মনে অনেকদিন ধ'রে এটা একটা গোপন রহস্যের মত ছিল—যেন আমার একটা কি কঠিন রোগ হয়েছে—সেটা যাদের কাছে বলছি, কেউ বুঝতে পারছে না, ধরতে পারছে না, সবাই হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে। এখন আমার সয়ে গিয়েছে। বুঝতে পেরেছি—ও সবাই দেখে না—যারা দেখে, চুপ ক'রে থাকাই তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল।

আমাদের বাসা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সব সময়ই চোখে পড়ে। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখে আসচি বহুদূর দিক্‌চক্রবালের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত তুষারমৌলি গিরিচূড়ার সারি—বাগানের চারিধারের পাহাড়-শ্রেণীর যেন একটুখানি ওপরে ব'লে মনে হ'ত—তখনও পর্য্যন্ত বুঝিনি যে ও-গুলো কত উঁচু। কাঞ্চনজঙ্ঘা নামটা অনেকদিন পর্য্যন্ত জানতাম না, আমাদের চাকর থাপাকে জিগ্যেস্ করলে বল্‌ত, ও সিকিমের পাহাড়। সেবার বাবা আমাদের সবাইকে (সীতা বাদে) দার্জ্জিলিং নিয়ে গিয়েছিলেন বেড়াতে—বাবার পরিচিত এক হিন্দুস্থানী চায়ের এজেণ্ট ওখানে থাকে, তার বাসায় গিয়ে দু-দিন আমরা মহা আদর-যত্নে কাটিয়েছিলাম—তখন বাবার মুখে প্রথম শুনবার সুযোগ হ'ল যে ওর নামটি কাঞ্চনজঙ্ঘা। সীতার সেবার যাওয়া হয়নি, ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বাবা বাজার থেকে ওর জন্যে রঙীন্ গার্টার, উল আর উল বুন্‌বার কাঁটা কিনে এনেছিলেন।

এই কাঞ্চনজঙ্ঘার সম্পর্কে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে।...

সেদিনটা আমাদের বাগানের কল্‌কাতা আপিসের বড় সাহেব আস্‌বেন বাগান দেখতে। তাঁর নাম লিণ্টন সাহেব। বাবা ও ছোট সাহেব তাকে আন্‌তে গিয়েচেন সোনাদা ষ্টেশনে—আমাদের বাগান থেকে প্রায় তিন-চার ঘণ্টার পথ। ঘোড়া ও কুলী সঙ্গে গিয়েছে।

তখন মেয়েরা পড়াতে আস্‌ত না, বিকেলে আমরা ভাইবোনে মিলে বাংলোর উঠোনে লাট্টু খেল্‌ছিলাম। সূর্য্য অস্ত যাবার বেশী দেরি নেই—মা রান্নাঘরে কাপড় কাচবার জন্যে সোডা সাবান জলে ফোটাচ্ছিলেন, থাপা লণ্ঠন পরিষ্কার কাজে খুব ব্যস্ত—এমন সময় আমার হঠাৎ চোখে পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘার দূর শিখররাজির ওপর আর একটা বড় পর্ব্বত, স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাদের ঢালুতে ছোট বড় ঘরবাড়ি, সমস্ত ঢালুটা বনে ঢাকা, দেবমন্দিরের মত সরু সরু ঘরবাড়ির চূড়া ও গম্বুজগুলো অদ্ভুত রঙের আলোয় রঙীন—অস্তসূর্য্যের মায়াময় আলো যা কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে পড়েছে তা নয়—তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও সম্পূর্ণ অপূর্ব্ব ধরণের। সে-দেশ ও ঘরবাড়ি যেন একটা বিস্তীর্ণ মহাসাগরের তীরে—কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর থেকে সে মহাসাগর কতদূর চলে গিয়েছে, আমাদের এদিকেও এসেছে, ভুটানের দিকে গিয়েছে তার কূল-কিনারা নেই; যদি কাউকে দেখাতাম সে হয়তো বল্‌ত আকাশ ওই রকম দেখায়, আমায় বোকা বল্‌ত। কিন্তু আমি বেশ জানি যা দেখেচি তা মেঘ নয়, আকাশ নয়—সে সত্যিই সমুদ্র। আমি সমুদ্র কখনও দেখিনি তাই কি, সমুদ্র কি রকম তা আমি জানি। বাবার মুখে গল্প শুনে আমি যে রকম ধারণা করেছিলাম সমুদ্রের, কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরকার সমুদ্রটা ঠিক সেই ধরণের। এর বছর দুই পরে মেয়েরা আমাদের বাড়ি পড়াতে আসে, তারা দাদাকে একখানা ছবিওয়ালা ইংরেজী গল্পের বই দিয়েছিল, বইখানার নাম রবিন্‌সন ক্রুশো—তাতে নীল সাগরের রঙীন ছবি দেখেই হঠাৎ আমার মনে প'ড়ে গেল এ আমি দেখেছি, জানি—আরও ছেলেবেলায় কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর এক সন্ধ্যায় এই ধরণের সমুদ্র আমি দেখেছিলাম—কূলকিনারা নেই, অপার···ভুটানের দিকে চলে গিয়েছে···

মিস্ নর্টনকে এ-সব কথা বল্‌বার আমার ইচ্ছে ছিল। অনেকদিন

মিস্ নর্টন আমায় কাছে ডেকে আদর করেছে, আমার কানের পাশের চুল তুলে দিয়ে আমার মুখ দু-হাতের তেলোর মধ্যে নিয়ে কত কি মিষ্টি কথা বলেছে—হয়ত অনেক সময় তখন বুড়ী মেম ছাড়া ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না—অনেকবার ভেবেছি এইবার বল্ব—কিন্তু বলি-বলি ক'রেও আমার সে গোপন কথা মিস্ নর্টনকে বলা হয়নি। কথা বলা ত দূরের কথা আমি সে-সময়ে মিস্ নর্টনের মুখের দিকে লজ্জায় চাইতে পারতাম না—আমার মুখ লাল হয়ে উঠত, কপাল ঘেমে উঠত··· সারা শরীরের সঙ্গে জিবও যেন অবশ হয়ে থাক্ত···চেষ্টা ক'রেও আমি মুখ দিয়ে কথা বার করতে পারতাম না। অথচ আমার মনে হ'ত এখনও মনে হয় যদি কেউ আমার কথা বোঝে, তবে মিস্ নর্টনই বুঝবে।

মাস দুই আগে আমাদের বাড়িতে এক নেপালী সন্ন্যাসী এসেছিল। পচাং বাগানের বড়বাবু বাবার বন্ধু, তিনিই বাবার ঠিকানা দেওয়াতে সন্ন্যাসীটী সোনাদা ষ্টেশনে যাবার পথে আমাদের বাসায় আসে। সে একবেলা এখানে ছিল, যাবার সময় বাবা টাকা দিতে গিয়েছিলেন, সে নেয়নি। সন্ন্যাসী আমায় দেখেই কেমন একটু বিস্মিত হ'ল, কাছে ডেকে তার পাশে বসালে, আমার মুখের পানে বার-বার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইতে লাগল—আমি কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, তখন সেখানে আর কেউ ছিল না। তারপর সে আমার হাত দেখলে, কপাল দেখলে, ঘাড়ে কি দাগ দেখলে। দেখা শেষ ক'রে সে চুপ ক'রে রইল, কিন্তু চলে যাবার সময় বাবাকে নেপালী ভাষায় বললে—তোমার এই ছেলে সুলক্ষণযুক্ত, এ জন্মেছে কোথায় ?

বাবা বললেন—এই চা-বাগানেই।

সন্ন্যাসী আর কিছু না ব'লেই চলে যাচ্ছিলেন, বাবা এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস্ করলেন—ওর হাত কেমন দেখলেন ?···

সন্ন্যাসী কিছু জবাব দিল না, ফিরলেও না, চলে গেল।

আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম। আমি মাঝে মাঝে নির্জ্জনে যে নানা অদ্ভুত জিনিষ দেখি, সন্ন্যাসী সেই সম্বন্ধেই বলেছিলেন। সে যে আর কেউই বুঝবে না, আমি তা জান্‌তাম। সেইজন্যেই ত আজকাল কাউকে ও-সব কথা বলিও নে।

পচাং চা-বাগানের কেরাণীবাবু ছিলেন বাঙালী। তাঁর স্ত্রীকে আমরা মাসীমা ব'লে ডাক্‌তাম। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন রংপুরে, সোনাদা ষ্টেশন থেকে ফিরবার পথে মাসীমা আমাদের বাসায় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মা না খাইয়ে তাঁদের ছাড়লেন না, খেতেদেতে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। আমাদের বাসা থেকে পচাং বাগান তিন মাইল দূরে, ঘন জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী সরু পথ বেয়ে যেতে হয়, মাঝে মাঝে চড়াই উৎরাই। আমি, সীতা ও দাদা তাঁদের সঙ্গে এগিয়ে দিতে গেলাম—পচাং পৌঁছুতে বেলা তিনটে বাজল। আমরা তখনি চলে আস্‌ছিলাম, কিন্তু মাসীমা ছাড়লেন না, তিনি ময়দা মেখে পরোটা ভেজে, চা তৈরী ক'রে আমাদের খাওয়ালেন; রাত্রে থাক্‌বার জন্যেও অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু আমাদের ভয় হ'ল বাবাকে না ব'লে আসা হয়েছে। বাড়ী না ফির্‌লে বাবা আমাদেরও বক্‌বেন, মাও বকুনি খাবেন। বনজঙ্গলের পথে হ'লেও আরও অনেক বার আমরাও মাসীমার এখানে এসেচি। আমি একাই কতবার এসেছি গিয়েছি। আমরা যখন রওনা হই তখন বেলা খুব কম আছে। অন্ধকার এরই মধ্যে নেমে আস্‌ছে—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড়বৃষ্টির খুব সম্ভাবনা। পচাং বাগান থেকে আধ মাইল যেতেই ঘন জঙ্গল—বড় বড় ওক্ আর

পাইন—আবার উৎরাইয়ের পথে নামলেই জঙ্গল অন্য ধরণের, আরও নিবিড় গাছের ডালে পুরু কম্বলের মত শেওলা ঝুলচে, ঠিক যেন অন্ধকারে অসংখ্য ভূত প্রেত ডালে ডালে নিঃশব্দে দোল খাচ্ছে। সীতা খুশীর সুরে বললে—যদি দাদা আমাদের সাম্‌নে ভালুক পড়ে?···হি হি—

সীতার ওপর আমাদের ভারী রাগ হ'ল, সবাই জানে এ পথে ভালুকের ভয় কিন্তু সে কথা ওর মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার কি ছিল? বাহাদুরী দেখাবার বুঝি সময় অসময় নেই?

অন্ধকার ক্রমেই খুব ঘন হয়ে এল, আর খানিকটা গিয়ে সরু পায়ে-চলার পথটা বনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুড়ি বৃষ্টি সুরু হ'ল—তেম্‌নি কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া! শীতে হাত পা জমে যাওয়ার উপক্রম হ'ল···গাছের ডালের শেওলা বৃষ্টিতে ভিজে এক ধরণের গন্ধ বার হয় এ আমরা সকলেই জান্‌তাম, কিন্তু সীতা বার-বার জোর ক'রে বল্‌তে লাগল ও ভালুকের গায়ের গন্ধ!—দাদা আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল, মাঝখানে সীতা, পেছনে আমি—হঠাৎ দাদা থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। সাম্‌নে একটা ঝর্ণা—তার ওপরটায় কাঠের গুঁড়ির পুল ছিল—পুলটা ভেঙে গিয়েছে। সেটার তোড় যেমন বেশী, চওড়াও তেম্‌নি। পার হ'তে সাহস করা যায় না। দাদা বললে—কি হবে জিতু!···চল পচাঙে মাসীমার কাছে ফিরে যাই। সীতা বললে—বাবা পিঠের ছাল তুলবে আজ না ফিরে গেলে বাসায়। না দাদা, বাড়িই চলো। দাদা ভেবে বললে—এক কাজ করতে পারবি? পাকদণ্ডীর পথে ওপরে উঠতে যদি পারিস—ওখান দিয়ে লিশ্‌টন বাগানের রাস্তা। আমি চিনি, ওপরে জঙ্গলও কম! যাবি?

দাদা তা হ'লে খুব ভীতু তো নয়!

পাকদণ্ডীর সে পথটা তেমনি দুর্গম, সারা পথ শুধু বনজঙ্গল ঠেলে ঠেলে উঠতে হবে, পা একটু পিছ্‌লে গেলেই, কি বড় পাথরের চাঁই

আল্‌গা হয়ে খসে পড়লে আট শ' কি হাজার ফুট নীচে প'ড়ে চুরমার হ'তে হবে! অবশেষে ঘন বনের বৃষ্টিভেজা পাতা-লতা, পাথরের পায়ের ছোট ফার্ণের ঝোপ ঠেলে আমরা ওপরে ওঠাই সুরু করলাম—অন্য কোন উপায় ছিল না! কাপড়-চোপড় মাথার চুল বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হ'য়ে গেল—রক্ত জমে হাত পা নীল হয়ে উঠ্‌ল। পাকদণ্ডীর পথ খুব সরু, তু-জন মানুষে কেনোগতিকে পাশাপাশি যেতে পারে, বাঁয়ে হাজার ফুট খাদ্‌, ডাইনে ঈষৎ ঢালু পাহাড়ের দেওয়াল খাড়া উঠেছে তাও হাজার-বার-শ ফুটের কম নয়। বৃষ্টিতে পথ পিছল, কাজেই আমরা ডাইনের দেওয়াল ঘেঁসে ঘেঁসেই উঠছি। পথ মানুষের কেটে তৈরি করা নয় ব'লেই হোক, কিংবা এ-পথে যাতায়াত নেই বলেই হোক—ছোটখাট গাছপালার জঙ্গল খুব বেশী কিন্তু ডাইনের পাহাড়ের গায়ের বড় গাছের ডালপালাতে সারা পথটা ঝুপসি ক'রে রেখেছে, মাঝে মাঝে সেগুলো এত নিবিড় যে সামনে কি আছে দেখা যায় না।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমরা ক'জনেই থমকে দাঁড়ালুম। সবাই চুপ ক'রে গেলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম শব্দটা কিসের। ভয়ে আমাদের বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। সীতাকে আমি জড়িয়ে ধ'রে কাছে নিয়ে এলুম। অন্ধকারে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে, কিন্তু আমরা জান্‌তাম ভালুক যে পথে আসে, পথের ছোটখাট গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে আসে। একটা কোনো ভারী জানোয়ারের অস্পষ্ট পায়ের শব্দের সঙ্গে কাঠকুটো ভাঙার শব্দে আমাদের সন্দেহ রইল না যে, আমরা যে-পথ দিয়ে এইমাত্র উঠে এসেচি, সেই পথেই ভালুক উঠে আসছে আমাদের পেছনে পেছনে। আমরা প্রাণপণে পাহাড় ঘেঁসে দাঁড়ালাম, ভরসা যদি অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে সামনের পথ দিয়ে চলে যায়···আমরা কাঠের

পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি, নিঃশ্বাস পড়ে কি না-পড়ে—এমন সময়ে পাকদণ্ডীর মোড়ে একটা একাণ্ড কালো জমাট অন্ধকারের স্তূপ দেখা গেল—স্তূপটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে বেঁকে বেঁকে আস্‌ছে—যতটা ডাইনে, ততটা বাঁয়ে নয়—আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দশ গজের মধ্যে এল—তার ঘন ঘন হাঁপানোর ধরণের নিঃশ্বাসও শুনতে পাওয়া যাবে—আমাদের নিজেদের নিঃশ্বাস তখন আর বইছে না···কিন্তু মিনিটখানেকের জন্য—একটু পরেই আর স্তূপটাকে দেখতে পেলাম না—যদিও শব্দ শুনে বুঝলাম সেটা পাকদণ্ডীর ওপরকার পাহাড়ী ঢালুর পথে উঠে যাচ্চে। আরও দশ মিনিট আমরা নড়লাম না, তারপর বাকী পথটা উঠে এসে লিণ্টন বাগানের রাস্তা পাওয়া গেল। আধ মাইল চলে চলে আস্‌বার পরে উমপ্লাঙের বাজার। এই বাজারের অমৃত সাউ মিঠাই দেয় আমাদের বাসায় আমরা জান্‌তাম—দাদা তার দোকানটাও চিন্‌ত। দোরে ধাক্কা দিয়ে ওঠাতে সে বাইরে এসে আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেল। আমাদের তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আগুনের চারিধারে বসিয়ে দিলে—আগুনে বেশী কাঠ দিলে ও বড় একটা পেতলের লোটায় চায়ের জল চড়ালে। তার বৌ উঠে আমাদের শুক্‌নো কাপড় দিলে পরবার—ও ময়দা মাখতে বস্‌ল। রাত তখন দশটার কম নয়। আমরা বাসায় ফিরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছি—বললাম—আমরা কিছু খাবো না, আমরা এবার যাই। অমৃত সাউ একা আমাদের ছেড়ে দিল না, তার ভাইকে সঙ্গে পাঠালে। রাত প্রায় সাড়ে এগারটার সময় বাগানে ফিরে এসে দেখি হৈ-হৈ কাণ্ড। বাবা বাসায় নেই, তিনি সে-দিন খুব মদ খেয়ে ফেরেন নি, তার ওপরে আমরাও ফিরিনি, মা পচাঙে লোক পাঠিয়েছিলেন, সে লোক ফিরে এসে বলেছে ছেলেমেয়েরা তো সন্ধ্যের আগেই সেখান থেকে রওনা হয়েছে। এদিকে নাকি খুব ঝড় হয়ে গিয়েছে, আমরা

আরও উঁচুতে থাক্‌বার জন্যে ঝড় পাইনি—নীচে নাকি অনেক গাছপালা ভেঙে পড়েছে। এই সব ব্যাপারে মা ব্যস্ত হয়ে সাহেবের বাংলোয় খবর পাঠান—ছোটসাহেব চারিধারে আমাদের খুঁজতে লোক পাঠিয়েছে। মা এতক্ষণ কাঁদেন নি, আমাদের দেখেই আমাদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন—সে এক ব্যাপার আর কি!

কিন্তু পরদিন যে ঘটনা ঘটল তা আরও গুরুতর। পরদিন চা-বাগানে বাবার চাকরি গেল। কেন গেল তা জানি না। অনেক দিন থেকেই সাহেবরা নাকি বাবার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, সেল মাষ্টার বাগান দেখতে এসে বাবার নামে কোম্পানীর কাছে কয়েক বার রিপোর্টও করেছিল, বাবা মদ খেয়ে ইদানীং কাজকর্ম্ম নাকি ভাল ক'রে করতে পারতেন না, এই সব জন্যে। আমরা যে-রাত্রে পথ হারিয়ে যাই, সে রাত্রে বাবা মদ খেয়ে বেহুঁস্ হ'য়ে কুলী লাইনের কোথায় পড়েছিলেন—বড় সাহেব সেজন্যে ভারি বিরক্ত হয়। আরও কি ব্যাপার হয়েছিল না-হয়েছিল আমরা সে-সব কিছু শুনি নি।

বাবা যখন সহজ অবস্থায় থাক্‌তেন, তখন তিনি দেবতুল্য মানুষ। তখন তিনি আমাদের ওপর অত্যন্ত স্নেহশীল, অত ভালবাস্‌তে মাও বোধ হয় পারতেন না। আমরা যা চাইতাম বাবা দার্জ্জিলিং কি শিলিগুড়ি থেকে আনিয়ে দিতেন। আমাদের চোখছাড়া করতে চাইতেন না। আমাদের নাওয়ানো, খাওয়ানোর গোলমাল বা এতটুকু ব্যতিক্রম হ'লে মাকে বকুনি খেতে হ'ত। কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদলে যেতেন, সামান্য ছল-ছুতোয় আমাদের মারধর করতেন। হয়ত আমায় বললেন—এক্সারসাইজ করিস্‌নে কেন? বলেই ঠাস্ ক'রে এক চড়। তারপর বললেন—উঠবস্ কর। আমি ভয়ে ভয়ে একবার উঠি আবার বসি—হয়ত ত্রিশ চল্লিশ বার ক'রে ক'রে পায়ে খিল ধ'রে গেল—বাবার সে দিকে খেয়াল নেই। মা থাক্‌তে না পেরে এসে

আমাদের সাম্‌লাতেন। সেই জন্যে ইদানীং বাবা সহজ অবস্থায় না থাকলেই আমরা বাসা থেকে পালিয়ে যাই—কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে?

এই সবের দরুণ আমরাও বাবাকে ভয় যতটা করি ততটা ভালবাসিনে।

দু-চারদিন ধরে বাবা-মায়ে পরামর্শ চল্‌ল কি করা যাবে এ অবস্থায়। আমরা বাইরে বাইরে বেড়াই কিন্তু সীতা সব খবর রাখে। একদিন সীতাই চুপি চুপি আমায় বললে—শোন দাদা, আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাব বাবা বলেছে। বাবার হাতে এখন টাকাকড়ি নেই কি-না—তাই দেশে ফিরে দেশের বাড়িতে থেকে চাকরির চেষ্টা করবে। শীগ্‌গীর যাব আমরা—বেশ মজা হবে দাদা—না?…দেশে চিঠি লেখা হয়েছে—

আমরা কেউ বাংলা দেশ দেখিনি, আমাদের জন্ম এখানেই। দাদা খুব ছেলেবেলায় একবার দেশে গিয়েছিল মা-বাবার সঙ্গে, তখন ওর বয়স বছর তিনেক—সে-কথা ওর মনে নেই। আমরা তো আজন্ম এই পর্ব্বত, বনজঙ্গল, শীত, কুয়াসা, বরফ-পড়া দেখে আস্‌ছি—কল্পনাই করতে পারিনে এ-সব ছাড়া আবার দেশ থাকা সম্ভব। তা ছাড়া সমাজের মধ্যে কোন দিন মানুষ হইনি ব'লে আমরা কোন বন্ধনে অভ্যস্ত ছিলাম না, সামাজিক নিয়মকানুনও ছিল আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। মানুষ হয়েছি এরই মধ্যে, যেখানে খুশী গিয়েছি, যা খুশী করেছি। কাজেই বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার কথা যখন উঠল, তখন এক দিকে যেমন অজানা জায়গা দেখবার কৌতূহলে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে উঠল, অন্যদিকে মনটা যেন একটু দমেও গেল।

থাপাকে বিদায় দেওয়া হ'ল। সে আমাদের মানুষ করেছিল, বিশেষ ক'রে সীতাকে। তাকে এক মাসের বেশী মাইনে, দুখানা

কাপড় আর বাবার একটা পুরোনো কোট দেওয়া হ'ল। থাপা বেশ সহজ ভাবেই বিদায় নিলে, কিন্তু বিকালে আবার ফিরে এসে বললে সে আমাদের যাওয়ার দিন শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে তবে নিজের গাঁয়ে ফিরে যাবে। শিলিগুড়ি ষ্টেশনে সে আমাদের সবাইকে সন্দেশ কিনে খাওয়ালে—ওর মাইনের টাকা থেকেই বোধ হয়। মা রাঁধলেন, সে সব জোগাড় ক'রে দিলে। ট্রেণ যখন ছাড়ল তখনও থাপা প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে বোকার মত হাস্‌ছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ভালবাসি, সে যে আমাদের ছেলেবেলা থেকে সাথী, এই বিরাট পর্ব্বতপ্রাচীর, ওক্ পাইনের বন, অর্কিড, শেওলা, ঝর্ণা, পাহাড়ীনদী, মেঘ-রোদ-কুয়াসার খেলা—এরই মধ্যে আমরা জন্মেছি—এদের সঙ্গে আমাদের বত্রিশ নাড়ীর যোগ।...তখন এপ্রিল মাস, আবার পাহাড়ের ঢালুতে রাঙা রডোড্রেণ্ডন ফুলের বন্যা এসেছে—সারা পথ দাদা বলতে বলতে এল চুপিচুপি—কেন বাবা অত মদ খেতেন, তা না হ'লে ত আর চাকরি যেত না—বাবারই ত দোষ।

৩

আমাদের দেশের গ্রামে পৌছলাম পরদিন বেলা ন'টার সময়ে। বাবার মুখে শুনেছিলাম গ্রামের নাম আটঘরা, ষ্টেশন থেকে মাইল দুই-আড়াই দূরে, জেলা চব্বিশ-পরগণা। এত বাঙালী পরিবারের বাস একসঙ্গে দেখে মনে বড় আনন্দ হ'ল। আমরা কখন ফসলের ক্ষেত দেখিনি, বাবা চিনিয়ে দিলেন পাটের ক্ষেত কোন্‌টা, ধানের ক্ষেত কোন্‌টা। এ ধরণের সমতলভুমি আমরা দেখিনি কখনও—রেলে

আস্‌বার সময় মনের অভ্যাসে কেবলই ভাবছিলাম এই বড় মাঠটা ছাড়ালেই বুঝি পাহাড় আরম্ভ হবে। সেটা পার হ'য়ে গেলে মনে হচ্ছিল এইবার নিশ্চয়ই পাহাড়। কিন্তু পাহাড় ত কোথাও নেই, জমি উঁচু-নীচুও নয়, কি অদ্ভুত ধরণের সমতল! যতদূর এলাম শিলিগুড়ি থেকে সবটা সমতল—ডাইনে, বাঁয়ে, সাম্‌নে সবদিকে সমতল, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। দাদা এর আগে সমতলভূমি দেখেছে, কারণ সে জন্মেছিল হনুমান নগরে, নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল আমার ও সীতার।

আমাদের বাড়িটা বেশ বড়, দোতলা, কিছু পুরনো ধরণের। বাড়ির পেছনে বাগান, ছোট একটা পুকুর। আমরা যখন গাড়ী থেকে নাম্‌লাম—বাড়ির মেয়েরা কেউ কেউ দোরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তার মধ্যে জ্যাঠাইমা, কাকীমারাও ছিলেন। মা বললেন, প্রণাম করো। পাড়ার অনেক মেয়ে দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা সীতাকে দেখে বলাবলি করতে লাগলেন, কি চমৎকার মেয়ে দেখেছ? এমন রং আমাদের দেশে হয় না, পাহাড়ের দেশে ব'লে হয়েছে। দাদাকে নিয়েও তারা খুব বলাবলি করলে, দাদার ও সীতার রং নাকি 'দুধে-আল্‌তা'—আমার মুখের চেয়ে দাদার মুখ সুন্দর, এ-সব কথা এই আমরা শুন্‌লাম। চা-বাগানে এ-সব কথা কেউ বলেনি। আর একটা লক্ষ্য করলাম আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা প্রায়ই কালো, চা-বাগানের অনেক কুলীমেয়ে এর চেয়ে ফর্সা।

আমাদের থাক্‌বার ঘর দেখে ত আমরা অবাক্! এত বড় বাড়ি এ-ঘরটা ছাড়া ত আরও কত ঘর রয়েছে। নীচের একটা ঘর, তার মেজের মাটির কড়িকাঠ ঝুলে পড়েছে ব'লে বাঁশের খুঁটির ঠেক্‌নো। কেন ওপরে দোতলায় ত কত ঘর, এত বড় বাড়ি ত! অন্য ঘরে জায়গা হবে না কেন? এ খারাপ ঘরটাতে আমরা থাক্‌বো কেন?

দেখলাম বাবা মা বিনা প্রতিবাদে সেই ঘরটাতেই আমাদের জিনিষপত্র তুললেন।

দিন-চারেক পরে জ্যাঠাইমা একদিন আমায় জিগ্যেস করলেন,—হ্যাঁ রে, তোর মাকে নাকি সেখানে মেমে পড়াতো ?

আমি বললাম,—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা।

গর্ব্বের সুরে বললাম, আমাকে, দাদাকে, সীতাকেও পড়াতো। জ্যাঠাইমা বললেন, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ছিল নাকি তোদের ?

আমি বাহাদুরী ক'রে বললাম—তারা এসে চা খেত আমাদের বাড়ি। আমাদের বিস্কুট দিত, কেক্ দিত খেতে তাদের ওখানে গেলে—চা খাওয়াতো—

জ্যাঠাইমা টানা টানা সুরে বললেন—মাগো মা ! কি হবে, আমাদের ঘরে দোরে ত যখন তখন উঠছে, হিঁদুর ঘরের জাতজন্ম আর রইল না।

আমি তখন বুঝতে পারিনি কেন জ্যাঠাইমা এ রকম বলছেন। কিন্তু শুধু এ-কথা নয়—আমি ছেলেমানুষ, অনেক কথাই তখন জান্‌তাম না। জান্‌তাম না যে এই বাড়িতে আমার বাবার অংশটুকু অনেক দিন বিক্রী হ'য়ে গিয়েছে, এখন যে এঁদো ঘরে আমরা আছি, সে-ঘরে কোনো ন্যায্য অধিকার আমাদের নেই—জ্ঞাতি জ্যাঠামশাইরা অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার সঙ্গে থাক্‌তে দিয়েছেন মাত্র। জান্‌তাম না যে, আমার বাবা বর্ত্তমানে অর্থহীন, অসুস্থ ও চাকুরীহীন, সরিকের বাড়িতে আশ্রয়-প্রার্থী। আরও জান্‌তাম না যে, বাবা বিদেশে থাকেন, ইংরেজী জানেন ও ভাল চাকুরি করেন ব'লে এঁদের চিরদিন ছিল হিংসে—আজ এ অবস্থায় হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে তাঁরা যে এতদিনের সঞ্চিত গায়ের ঝাল মেটাতে ব্যগ্র হয়ে উঠবেন সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। চাকুরির অবস্থায় মাকে নিয়ে বাবা কয়েক বার এখানে এসে চাল দেখিয়ে

গিয়েছিলেন, এরা সে কথা ভোলেনি। ছেলেমানুষ বলেই এত কথা তখন বুঝতাম না।

আমরা কখনও দোতলা বাড়ি দেখিনি—গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে দোতলা কোঠা বাড়ী দেখতে আমাদের ভারি ভাল লাগতো, বিশেষ ক'রে সীতার। সীতা আজ এসে হয়ত বলে—কাল যেও আমার সঙ্গে দাদা, ও-পাড়ার বাঁড়ুয্যে-বাড়ি কত বড় দেখে এসো—দোতলার ওপরে আবার একটা ছোট ঘর, সত্যি দাদা।

আমাদের গ্রামে খুব লোকের বাস—এক এক পাড়াতে ষাট-সত্তর ঘর ব্রাহ্মণ। এত ঘন বসতি কখনও দেখিনি—কেমন নতুনতর মনে হয়, কিন্তু ভাল লাগে না। এতে যেন মন হাত পা ছড়াবার জায়গা পায় না। সদাই কেমন অস্বস্তি বোধ হয়—রাস্তায় বেজায় ধুলো, পুরনো নোনাধরা ইটের বাড়িই অধিকাংশ, বিশেষ কোনো শ্রীছাঁদ নেই, পথের ধারে মাঝে মাঝে গাছপালা, সে সব গাছপালা আমি চিনিনে, নামও জানিনে, কেবল চিনি কচুগাছ ও লালবিছুটি। এদের হিমালয়ে দেখেছি ব'লে নয়, কচুর ডাঁটার তরকারী এখানে এসে খেয়েছি বলে। আর আমার খুড়তুতো ভাই বিশু একদিন সীতাকে বিছুটির পাতা দেখিয়ে বলেছিল,—এর পাতা তুলে গায়ে ঘসতে পারিস্?…বেচারী সীতা জানতো না কিছু, সে বাহাদুরী দেখিয়ে একমুঠো পাতা তুলে বাঁ-হাতে আচ্ছা ক'রে ঘসেছিল—তারপর আর যায় কোথা!…

এ-সব জায়গা আমার চোখে অত্যন্ত কুশ্রী মনে হয়, মন ভরে ওঠে এমন একটা দৃশ্য এর কোনো দিকেই নেই—ঝর্ণা নেই, বরফে ঢাকা পর্ব্বত-পাহাড় নেই—আরও কত কি নেই। সীতারও তাই, একদিন সে চুপি চুপি বললে—এখানে থাকতে তোমার ইচ্ছে হয় দাদা? আমায় যদি এখুনি কেউ বলে চা-বাগানে চল, আমি বেঁচে যাই। আর একটা কথা শোনো দাদা—জ্যাঠাইমা কি খুড়ীমার ঘরে অত যেও না যেন।

ওরা আমাদের দেখতে পারে না। ওদের বিছানায় গিয়ে বসেছিলে কেন দুপুর বেলা? তুমি উঠে গেলে কাকীমা তোমায় বললে, অসভ্য পাহাড়ী ভূত, আচার নেই বিচের নেই, যখন তখন বিছানা ছোঁায়। যেও না ওদের ঘরে যখন-তখন বুঝলে?

ছোট বোনের পরামর্শ বা উপদেশ নিতে আমার অগ্রজগর্ব্ব সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল, বললাম—আচ্ছা যা যা, তোকে শেখাতে হবে না। কাকীমা মন্দ ভেবে কিছু বলেন নি, আমায় ডেকে তারপরে কত বুঝিয়ে দিলেন পাছে আমি রাগ করি। জানিস্ তা?

বলা বাহুল্য আমায় ডেকে কাকিমার কৈফিয়ৎ দেওয়ার কথাটা আমার কল্পনাপ্রসূত। আমাদের জীবনের যে অভিজ্ঞতা এই চার মাসের মধ্যেই সঞ্চয় করেছি, তা বোধ হয় সারাজীবনেও ভুলবো না। আমরা সত্যই জানতাম না যে, সংসারের মধ্যে এত সব খারাপ জিনিষ আছে, মানুষ মানুষের প্রতি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে, যাদের কাছে জ্যেঠিমা, কাকীমা, দিদি ব'লে হাসিমুখে ছুটে গিয়েছি, তারা এতটা হৃদয়হীন ব্যবহার সত্যি সত্যিই করতে পারে, কি ক'রে জানবোই বা এসব?

মুস্কিল এই যে এত সাবধানে চল্‌লেও পদে পদে আমরা জ্যেঠাইমাদের কাকীমাদের কাছে অপরাধী হ'য়ে পড়ি; আমরা লোকালয়ে কখনও বসবাস করিনি বলেই হোক্ বা এদের এখানকার নিয়ম-কানুন জানিনে বলেই হোক্, বুঝতে পারিনে যে কোথায় আমাদের অপরাধ ঘট্‌ছে বা ঘটতে পারে। রাত্রে যে কাপড়খানা প'রে শুয়ে থাকি, সেইখানা পরনে থাক্‌লে সকলে যে আল্‌না ছুঁতে নেই, তার দরুণ আল্‌নাসুদ্ধ কাচা কাপড় সব নোংরা হয়ে যায়, বা বাড়ীর আশ-পাশের খানিকটা সুনির্দ্দিষ্ট অংশ পবিত্র, কিন্তু সীমানা পেরিয়ে গেলেই হাত-পা না ধুয়ে বা গঙ্গাজল মাথায় না দিয়ে ঘরেদোরে ঢুকতে নেই—এসব কথা আমরা জানিনে, শুনিওনি—যুক্তির দিক দিয়েও বুঝতে

পারিনে। আমাদের বাড়ির খিড়কীতে খানিকটা বন, একদিন বিকেলে আমি, সীতা ও দাদা সেখানে কুঁড়েঘর বাঁধবার জন্যে নোনাগাছের ডাল কাটছি—কাকিমা দেখতে পেয়ে বললেন, ওখানে গিয়ে কাটছ সব? ভাগ্যিস্ চোখে পড়ল? এক্ষুণি তো অই সব নি[illegible] উঠতে এসে দোতলার দালানে?…মা গো মা, মেলেচ্ছ খিরিষ্টানের মত ব্যাভার, আঁস্তাকুড় ঘেঁটে খেলা হচ্চে গ্যাখো!

সবাই সন্ত্রস্ত হ'য়ে চারিধারে চেয়ে দেখলাম, আঁস্তাকুড়ের অন্য কোন লক্ষণ ত নেই! দিব্যি পরিষ্কার জায়গা, ঘাসের জমি আর বনের গাছপালা। আমি অবাক্ হয়ে বললাম—কাকীমা, এখানে ত কিচ্ছু নোংরা নেই?…এসে দেখুন বরং, কেমন পরিষ্কার—

কাকীমার মুখ দিয়ে খানিক ক্ষণ কথা বার হ'ল না—তিনি এমন কথা জীবনে কখনো শোনেন নি। তারপর ব'লেন, চোখে কি ঢ্যালা বেরিয়েছে না কি? এঁটো হাঁড়িকল্সী ফেলা রয়েছে দেখছ না সামনে? …কাচা কাপড় প'রে কোন্ ছেলেমেয়েটা এই বিকেলে পথ [illegible]কে অত দূরে বনজঙ্গলের মধ্যে যায়? ওটা আঁস্তাকুড় হ'ল না?…আবার সমানে তক্কো!

তারপর খুড়িমা হুকুম দিলেন আমাদের সবাইকে এক্ষুণি নাইতে হবে। আমরা অবাক্ হ'য়ে গেলাম—নাইতে হবে কেন?

সাম্নে হাত তিনচার দূরে গোটাকতক ভাঙা হাঁড়িকুঁড়ি পড়ে আছে বটে, কিন্তু তার দরুণ গোটা বোনটা অপরিষ্কার কেন হবে তা [illegible]তে পারলাম না আমরা তিনজনের কেউই। বিশেষ ক'রে এটা আরও বুঝ্তে পারলাম না যে, পথ থেকে দূরে বনের মধ্যে বিকেলে কাপড় প'রে যেতে দোষটা কিসের। চা-বাগানে থাক্তে ত কত দূর দূর আমরা চলে যেতাম, কার্ট রোড্, পচাঙের বাজার, এখানেই বা কি বন

সেখানকার সেই সুনিবিড় বনানী পদচিহ্নহীন, নির্জ্জন, আধ অন্ধকার—কতদূরে যেখানে যেখানে গিয়েছি কাপড় প'রেই ত গিয়েছি ?

দাদা একটু ভীতু, সে ভয়ে নাইতে রাজী হ'ল। আমি বললাম—সীতা, তুই আর আমি নাবো না, কখনো না। আমি যা বলি তাই শোনা সীতার স্বভাব—সে বললে, খুড়ীমা খুন ক'রে ফেললেও আমি নাবো না দাদা।

খুড়ীমা আমাদের সাধ্যমত নির্য্যাতনের কোন ত্রুটী করলেন না; বাড়ি ঢুকতে দিলেন না, তাঁর বড় ছেলে হারুদাকে বলে দিলেন আমাদের শাসন করতে, মাকে বললেন—তোমার ওই ডাকাত মেয়ে আর ডাকাত ছেলেকে আজ কি দশা করি তা টেরই পাবে—আমার সঙ্গে সমানে সমানে তক্কো ত করলেই আবার আমার কথার ওপর একগুঁয়েমি ?

মা ওঁদের বাড়িতে এখন এসে রয়েছেন, ভয়ে কিছু বল্‌তে পারলেন না। আমি সীতাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেলাম। ও-পাড়ায় পথের ধারে শ্যাম বাগ্‌চীদের পোড়ো বাড়ি, পেছনে ওদের বগোন, সেও পোড়ো। সারাদিন আমরা সেখানে কাটালাম, সন্ধ্যার সময় দাদা গিয়ে ডেকে আন্‌লে। বাড়িতে ঢুকতে যাব কাকা দোতলা থেকে হেঁকে বললেন—ওদের বাড়ি ঢুক্‌তে দিও না বল্‌ছি—ওরা যেন খবরদার আমার বাড়ি না মাড়ায়, সাবধান—যেখানে হয় যাক, এত বড় আস্পদ্দা সব—

মা কিছু বল্‌তে সাহস কর্‌লেন না, বৌমানুষ। বাবা বাড়ি ছিলেন না, চাক্‌রির চেষ্টায় আজকাল তিনি বড় এখানে ওখানে ঘোরেন, কিছু পান না বোধ হয়—দু-এক দিন পরে শুকনো মুখে ফিরে আসেন—সংসার একেবারে অচল। আমরা এক প্রহর রাত পর্য্যন্ত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। জ্যাঠাইমা, খুড়ীমা, জ্যাঠামশায়, দিদিরা কেউ একটা

কথাও বললেন না। তারপর যখন ওদের দোতলায় খাওয়া-দাওয়া সারা হ'ল, আলো নিব্‌ল, মা চুপি চুপি আমাদের বাড়িতে ঢুকিয়ে নিলেন, বললেন,—জিতু, খুড়ীমার কথা শুন্‌লি নে কেন? ছিঃ—

আমি বললাম—উনি যে কথা বলেন মা, তার মানে হয় না। আচ্ছা মা, তুমিই বলো আমরা সেখানে বনে বনে বেড়াতাম না? আমরা কি নাইতুম? আর বন কি আঁস্তাকুড়? অন্যায় কথা ওঁর কখ্‌খনো শুন্‌বো না মা। এতে উনি মারুন আর খুনই করুন—

মা অতি কষ্টে কান্না সাম্‌লাচ্চেন মনে হ'ল। বললেন—তুই যদি এরকম করিস্ তা হ'লে এ বাড়িতে ওরা আমাদের থাক্‌তে দেবে না। আমাদের কি চেঁচিয়ে কথা বল্‌বার জো আছে এখানে? ছিঃ বাবা জিতু ওরা যা বলে শুন্‌বি। ওরা লোক ভাল না—আগে জান্‌লে ভিক্ষে ক'রে খেতাম, তবুও এখানে আস্‌তাম না। তোর বাবার যে একটা কিছু হ'লে হয়।

বাবা কলকাতা থেকে দুপুরে বাড়ি ফিরলেন। কাপড় জামা এত ময়লা কখনও বাবার গায়ে দেখিনি। আমায় কাছে ডেকে বললেন,—শোন্ জিতু, এই পুঁটুলিটা তোর মাকে দিয়ে আয়, আমি একবার ও-পাড়া থেকে আসি। ভটচায্যিদের নস্যির কারখানায় একটা লোকের নামে চিঠি দিয়েছে—ওদের দিয়ে আসি।

আমি বললাম—এখন যেও না বাবা। চিঠি আমি দিয়ে আসবো'খন, তুমি এসে চা-টা খাও,—বাবা শুন্‌লেন না, চলে গেলেন। বাবার মুখ শুক্‌নো, দেখে বুঝলাম যে-জন্যে গিয়েছেন তার কোনো জোগাড় হয়নি, অর্থাৎ চাক্‌রি। চাক্‌রি না হলেও আর এদিকে চলে না।

হাতের টাকা ক্রমশঃ ফুরিয়ে এসেছে। আমরা নীচের যে ঘরে থাকি, গরুবাছুরেরও সেখানে থাকতে কষ্ট হয়। আমরা এসেছি প্রায় মাস-চারেক হ'ল, এই চার মাসেই যা দেখেছি শুনেছি, তা বোধ করি সারা জীবনেও ভুলবো না। যাদের কাছে জ্যেঠিমা, কাকীমা, দিদি ব'লে হাসিমুখে ছুটে যাই, তারা যে কেন আমাদের ওপর এমন বিরূপ, কেন তাঁদের ব্যবহার এত নিষ্ঠুর, ভেবেই পাই নে এর কোন কারণ। আমরা তো আলাদা থাকি, আমাদের খরচে আমাদের রান্না হয়, ওঁদের তো কোনই অসুবিধের মধ্যে আমরা ফেলিনি, তবু কেন বাড়িসুদ্ধু লোকের আমাদের ওপর এত রাগ?

আমার বাবার আপন ভাই নেই, ওঁরা হ'লেন খুড়তুত—জ্যাঠতুত ভাই। জ্যাঠামশায়ের অবস্থা খুবই ভাল—পাটের বড় ব্যবসা আছে, দুই ছেলে গদিতে কাজ দেখে, ছোট একটি ছেলে এখানকার স্কুলে পড়ে, আর একটি মেয়ে ছিল, সে আমাদের আসবার আগে বসন্ত হ'য়ে মারা গিয়েছে। মেজকাকার তিন মেয়ে—ছেলে হয়নি, বড় মেয়ের বিয়ে হয়েচে—আর দুই মেয়ে ছোট। ছোটকাকার বিয়ে হয়েছে বেশী দিন নয়—বৌও এখানে নেই। ছোটকাকা অত্যন্ত রাগী লোক, বাড়িতে সর্ব্বদা ঝগড়াঝাঁটি করেন, গানবাজনার ভক্ত, ওপরের ঘরে সকাল নেই সন্ধ্যে নেই হারমোনিয়ম বাজাচ্ছেন।

জ্যাঠাইমার বয়স মায়ের চেয়ে বেশী, কিন্তু বেশ সুন্দরী—একটু বেশী মোটাসোটা। গায়ে ভারী ভারী সোনার গহনা। এঁর বিয়ের আগে নাকি জ্যাঠামশায়ের অবস্থা ছিল খারাপ—তারপর জ্যাঠাইমা এ বাড়িতে বধূরূপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে উন্নতিরও সূত্রপাত। প্রতিবেশীরা খোসামোদ ক'রে বলে—আমার সামনেই আমি কত বার শুনেছি—তোমার মত ভাগ্যিমাণি ক'জন আছে বড়-বৌ? এদের কি-ই বা ছিল, তুমি এলে আর সংসার সব দিক থেকে উথ্‌লে উঠ্‌লো, কপাল

বলে একেই বটে!···সামনে বলা নয়—এমন মন আজকাল ক'জনের বা আছে? দেওয়ায়-থোওয়ায়, খাওয়ানোয়-মাখানোয়—আমার কাছে বাপু হক্ কথা।

···মেজখুড়ীমা ওর মধ্যে ভাল লোক। কিন্তু তিনি কারুর সপক্ষে কথা বলতে সাহস করেন না, তাঁর ভাল করবার ক্ষমতা নেই, মন্দ করবারও না। মেজকাকা তেমন কিছু রোজগার করেন না, কাজেই মেজখুড়ীমার কোনো কথা এ বাড়িতে খাটে না।

বছরখানেক কেটে গেল। বাবা কোথাও চাক্‌রি পেলেন না। কত জায়গায় হাঁটাহাঁটি করলেন, শুক্‌নো মুখে কত বার বাড়ি ফিরলেন। হাতে যা পয়সা ছিল ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে এল।

সকালে আমরা বাড়ির সামনে বেলতলায় খেলছিলাম। সীতা বাড়ীর ভেতর থেকে বার হ'য়ে এল, আমি বললুম—চা হয়েচে সীতা?

সীতা মুখ গম্ভীর ক'রে বললে—চা আর হবে না। মা বলেছে চা চিনির পয়সা কোথায় যে চা হবে? কথাটা আমার বিশ্বাস হ'ল না, সীতার চালাকি আমি যেন ধরে ফেলেছি, এই রকম সুরে তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললুম,—যাঃ, তুই বুঝি খেয়ে এলি? চা-বাগানে আমাদের জন্ম, সকালে উঠে চা খাওয়ার অভ্যাস আমাদের জন্মগত, চা না খেতে পাওয়ার অবস্থা আমরা কল্পনাই করতে পারিনে। সীতা বললে—না দাদা, সত্যি, তুমি দেখে এসো—চা হচ্চে না। তারপরে বিজ্ঞের সুরে বললে—বাবার যে চাকরি হচ্ছে না, মা বল্‌ছিল দু-দিন পরে আমাদের ভাতই জুটবে না তো চা!···আমরা এখন গরিব হ'য়ে গিয়েছি যে।

সীতার কথায় আমাদের দারিদ্র্যের রূপটি নূতনতর মূর্ত্তিতে আমার চোখের সাম্‌নে ফুটল। জানতুম যে আমরা গরিব হ'য়ে গিয়েছি, পরের বাড়িতে পরের মুখ চেয়ে থাকি, ময়লা বিছানায় শুই, জলখাবার খেতে পাইনে, আমাদের কারুর কাছে মান নেই সবই জানি। কিন্তু এসবেও নিজেদের দারিদ্র্যের স্বরূপটি তেমন ক'রে বুঝিনি, আজ সকালে চা না খেতে পেয়ে সেটা যেমন ক'রে বুঝলুম।

বিকেলের দিকে বাবা দেখি পথ বেয়ে কোথা থেকে বাড়িতে আসছেন। আমায় দেখে বললেন—শোন্ জিতু, চল্ শিমুলের তুলো কুড়িয়ে আনিগে—

আমি শিমুল তুলোর গাছ এই দেশে এসে প্রথম দেখেছি—গাছে তুলো হয় বইয়ে পড়লেও চোখে দেখেছি এখানে এসে এই বৈশাখ মাসে। আমার ভারি মজা লাগল—উৎসাহ ও খুশীর সুরে বললুম—শিমুল তুলো? কোথায় বাবা?···চল যাই—সীতাকে ডাক্‌বো?···

বাবা বললেন—ডাক্ ডাক্, সবাইকে ডাক্—চল্ আমরা যাই—

বাবাও আমার পেছনে পেছনে বাড়ী ঢুকলেন। পরের দিন ষষ্ঠী ও দাদার জন্ম-বার। মা কোথা থেকে খানিকটা দুধ জোগাড় ক'রে রান্নাঘরের দাওয়ার উনুনে বসে বসে ক্ষীরের পুতুল গড়ছিলেন—বাবার স্বর শুনেই মুখ তুলে চেয়ে এক চমক বাবার দিকে দেখেই একবার চকিত দৃষ্টিতে ওপরে জ্যাঠাইমাদের বারান্দার দিকে একবার কি জন্যে চাইলেন—তারপর পুতুল-গড়া ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বাবার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন—যা জিতু, বাইরে খেলা কর গে যা—

আমি অবাক হ'য়ে গেলুম। বল্‌তে যাচ্ছিলাম—মা, বাবা যে শিমুল তুলো কুড়োবার—কিন্তু মার মুখের দিকে চেয়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। একটা কিছু হয়েছে যেন—কিন্তু কি হয়েছে আমি বুঝলাম না। বাবা মদ খেয়ে আসেন নি নিশ্চয়—মদ খেলে আমরা

বুঝতে পারি—খুব ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্‌ছি, দেখলেই বুঝি। তবে বাবার কি হ'ল ?.........

অবাক হ'য়ে বাইরে চলে এলুম।

এখানকার স্কুলে আমি ভর্ত্তি হয়েছি, কিন্তু দাদা আর পড়তে চাইলে না ব'লে তাকে ভর্ত্তি করা হয়নি। প্রথম কয় মাস মাইনের জন্যে মাষ্টার-মশায়ের তাগাদার চোটে আমার চোখে জল আস্‌ত—সাড়ে ন' আনা পয়সা মাইনে—তাও বাড়িতে চাইলে কারুর কাছে পাইনে, বাবার মুখের দিকে চেয়ে বাবার কাছে তাগাদা করতে মন সরে না।

শনিবার, সকালে স্কুলের ছুটি হবে। স্কুলের কেরাণী রামবাবু একখানা খাতা নিয়ে আমাদের ক্লাসে ঢুকে মাইনের তাগাদা সুরু করলেন। আমার মাইনে বাকী দু-মাসের—আমায় ক্লাস থেকে উঠিয়ে দিয়ে বললেন—বাড়ি গিয়ে মাইনে নিয়ে এস খোকা, নইলে আর ক্লাসে বস্‌তে দেবো না কাল থেকে। আমার ভারি লজ্জা হ'ল—দুঃখ তো হ'লই। আড়ালে ডেকে বল্‌লেই তো পারতেন রামবাবু, ক্লাসে সকলের সাম্‌নে—ভারি—

দুপুরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। স্কুলের বাইরে একটা নিমগাছ। ভারি সুন্দর নিমফুলের ঘন গন্ধটা। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম কি করা যায়। মাকে বল্‌ব বাড়ি গিয়ে? কিন্তু জানি মায়ের হাতে কিছু নেই, এখুনি পাড়ায় ধার করতে বেরুবে, পাবে কি না-পাবে, ছোট মুখ ক'রে বাড়ি ফিরবে—ওতে আমার মনে বড় লাগে।

হঠাৎ আমি অবাক্ হয়ে পথের ওপারে চেয়ে রইলুম—ওপারে সামু নাপিতের মুদীখানার দোকানটা আর নেই, পাশেই সে ফিতে ঘুন্সির দোকানটাও নেই—তার পাশের জামার দোকানটাও নেই—একটা খুব

বড় মাঠ, মাঠের ধারে বড় বড় বাঁশগাছের মত কি গাছের সারি, কিন্তু বাঁশগাছ নয়। দুপুরবেলা নয়, বোধ হয় যেন রাত্রি—জ্যোৎস্না রাত্রি—দূরে সাদা রঙের একটা অদ্ভুত গড়নের বাড়ি, মন্দিরও হ'তে পারে।

নিমগাছের গুঁড়িটাতে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল দেখতে পাওয়া গেল, তখনও তাই আছে—জ্যোৎস্নাভরা একটা মাঠ, কি গাছের সারি—দূরের সাদা বাড়িটা। দু-মিনিট···পাঁচ মিনিট। তাড়াতাড়ি চোখ মুছলাম আবার চাইলুম—এখনও অবিকল তাই। একেবারে এত স্পষ্ট, গাছের পাতাগুলো যেন গুণ্‌তে পারি, পাখীদের ডানার সব রং বেশ ধরতে পারি।···

তার পরেই আবার কিছু নেই, খানিকক্ষণ সব শূন্য—তার পরেই সামু নাপিতের দোকান, পাশেই ফিতে ঘুন্সির দোকান।

বাড়ি চলে এলুম। যখনই আমি এই রকম দেখি, তখন আমার গা কেমন করে—হাতে পায়ে যেন জোর নেই, এমনি হয়। মাথা যেন হালকা মনে হয়। কেন এমন হয় আমার? কেন আমি এ-সব দেখি, কাউকে একথা বল্‌তে পারিনে, মা, বাবা, দাদা, সীতা, কাউকে নয়। আমার এমন কোনো বন্ধু বা সহপাঠী নেই, যাকে আমি বিশ্বাস ক'রে সব কথা খুলে বলি। আমায় মনে যেন কে বলে—এরা এ-সব বুঝবে না। বন্ধুরা হয়ত হেসে উঠবে কি ওই নিয়ে ঠাট্টা করবে।

ওবেলা খেয়ে যাইনি। রান্নাঘরে ভাত খেতে গিয়ে দেখি শুধু সিমভাতে আর কুম্‌ড়োর ডাঁটা চচ্চড়ি। আমি ডাঁটা খাইনে—সিম যদি বা খাই সিমভাতে একেবারেই মুখে ভাল লাগে না। মাকে রাগ ক'রে বললুম—ও দিয়ে ভাত খাবো কি করে? সিমভাতে দিলে কেন? সিমভাতে আমি খাই কখনও?

কিন্তু মাকে যখন আমি বক্‌ছিলুম আমার মনে তখন মায়ের ওপর রাগ ছিল না। আমি জানি আমাদের ভাল খাওয়াতে মায়ের যত্নের ত্রুটি কোনো দিন নেই, কিন্তু এখন মা অক্ষম, অসহায়—হাতে পয়সা নেই, ইচ্ছে থাক্‌লেও নিরুপায়। মায়ের এই বর্ত্তমান অক্ষমতার দরুণ মায়ের ওপর যে করুণা সেটাই দেখা দিল রাগে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে। চেয়ে দেখি মায়ের চোখে জল। মনে হ'ল এ সেই মা—চা-বাগানে থাক্‌তে মিস নর্টনের কাছ থেকে আমাদের খাওয়ানোর জন্যে কেক্‌ তৈরি করবার নিয়ম শিখে বাজার থেকে ঘি-ময়দা কিস্‌মিস্‌ ডিম চিনি সব আনিয়ে সারা বিকেল ধরে পরিশ্রম ক'রে কতকগুলো স্বাদগন্ধহীন নিরেট ময়দার ঢিপি বানিয়ে বাবার কাছে ও পরদিন মিস্‌ নর্টনের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন। তারপর অবিশ্যি মিস্‌ নর্টন ভাল ক'রে হাতে ধরে শেখায় এবং মা ইদানীং খুব ভাল কেক্‌ই গড়তে পারতেন।

মা বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের ধরণ-ধারণ, রান্না, আচার-ব্যবহার ভাল জান্‌তেন না—অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে চা-বাগানে চ'লে গিয়েছিলেন, সেখানে একা একা কাটিয়েছেন চিরকাল সমাজের বাইরে—পাড়াগাঁয়ের ব্রত-নেম্‌ পূজোআচ্চা আচার এ-সব তেমন জানা ছিল না। এদের এই ঘোর আচারী সংসারে এসে পড়ে আলাদা থাক্‌লেও মাকে কথা সহ্য করতে হয়েছে কম নয়। পয়সা থাকলে যেটা হয়ে দাঁড়াত গুণ—হাত খালি থাকাতে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠাট্টা, বিদ্রূপ, শ্লেষের ব্যাপার—জংলীপনা খিরিষ্টানি বা বিবিয়ানা। মার সহ্যগুণ ছিল অসাধারণ, মুখ বুজে সব সহ্য করতেন, কোনদিন কথাটিও বলেন নি। ভয়ে ভয়ে ওদের চালচলন, আচার-ব্যবহার শিখবার চেষ্টা করতেন—নকল করতে যেতেন—তাতে ফল অনেক সময়ে হ'ত উল্টো।

আরও মাসকতক কেটে গেল। এই ক-মাসে আমাদের যা অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো, জীবনে ভাবিনিও কোনো দিন যে অত কষ্টের মধ্যে

পড়তে হবে। দু-বেলা ভাত খেতে আমরা ভুলে গেলাম। স্কুল থেকে এসে বেলা তিনটের সময় খেয়ে রাত্রে কিছু খাওয়ার ইচ্ছেও হ'ত না। ভাত খেয়ে স্কুলে যাওয়া ঘটত না প্রায়ই, অত সকালে মা চালের জোগাড় করতে পারতেন না, সেটা প্রায়ই ধার ক'রে নিয়ে আসতে হ'ত। সব সময় হাতে পয়সা থাক্‌ত না—এর মানে আমাদের চা-বাগানের সৌখীন জিনিষপত্র, দেরাজ, বাক্স—এই সব বেচে চল্‌ছিল—সব সময়ে তার খদ্দের জুটতো না। মা বৌমানুষ, বিশেষতঃ এটা অপরিচিত স্থান, নিজের শ্বশুরবাড়ী হলেও এর সঙ্গে এত কাল কোনো সম্পর্কই ছিল না—কিন্তু মা সব মানতেন না, লজ্জা ক'রে বাড়ি বসে থাকলে তাঁর চলত না, যে-দিন ঘরে কিছু নেই, পাড়ায় বেরিয়ে যেতেন, দু-একটা জিনিষ বেচবার কি বন্ধক দেবার চেষ্টা করতেন পাড়ায় মেয়েদের কাছে—প্রায়ই সৌখীন জিনিষ, হয়ত একটা ভাল কাচের পুতুল, কি গালার খেল্‌না, চন্দনকাঠের হাতপাখা—এই সব—সেলাইয়ের কলটা ছোটকাকীমা সিকি দামে কিনেছিলেন। বাবার গায়ের ভারি পুরু পশমী ওভারকোটটা সরকাররা কিনে নিয়েছিল আট টাকায়। মোটে এক বছর আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাবা সেটা তৈরি করেছিলেন।

চাল না-হয় একরকম ক'রে জুটলো, কিন্তু আমাদের পরণের কাপড়ের দুর্দ্দশা ক্রমেই বেড়ে উঠেছিল। আমাদের সবারই একখানা ক'রে কাপড়ে এসে ঠেকেছে—তাও ছেঁড়া, আমার কাপড়খানা তো তিন জায়গায় সেলাই। সীতা বল্‌ত, তুই বড় কাপড় ছিঁড়িস দাদা। কিন্তু আমার দোষ কি? পুরোনো কাপড়, একটু জোরে লাফালাফি করাতেই ছিঁড়ে যেত, মা অম্‌নি সেলাই করতে বসে যেতেন।

বাবা আজকাল কেমন হয়ে গেছেন, তেমন কথাবার্ত্তা বলেন না—বাড়ীতেও থাকেন না প্রায়ই। তাঁকে পাওয়াই যায় না যে কাপড়ের

কথা বলি। তা ছাড়া বাবার মুখের দিকে চেয়ে কোনো কথা বলতেও ইচ্ছে যায় না। তিনি সব সময়ই চাকরির চেষ্টায় এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু কোথাও এ পর্য্যন্ত কিছু জোটেনি। মাস দুই একটা গোলদারী দোকানে খাতাপত্র লেখবার চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর সে চাক্‌রি নেই—সেজজ্যাঠামশায়ের ছেলে নবীন বল্‌ছিল, নাকি মদ খেয়ে গেছে। কিন্তু এখানে এসে বাবা এক দিনও মদ খেয়েছেন ব'লে আমার মনে হয় না, বাবা মদ খেলেই উৎপাত করেন আমরা ভাল করেই জানি, কিন্তু এখানে এসে পর্য্যন্ত দেখ্‌চি বাবার মত শান্ত মানুষটি আর পৃথিবীতে নেই। এত শান্ত, এত ভালমানুষ স্নেহময় লোকটি মদ খেলে কি হয়েই যেতেন! চা-বাগানের সে-সব রাতের কীর্ত্তি মনে হলেও ভয় করে।

রবিবার। আমার স্কুল নেই আমি সারাদিন বসে বসে ম্যাজেণ্টা গুলে রং তৈরি করেছি, দু-তিনটে শিশিতে ভর্ত্তি করে রেখেছি, সীতার পাঁচ-ছখানা পুতুলের কাপড় রঙে ছুপিয়ে দিয়েছি—ক্লাসের একটা ছেলের কাছ থেকে অনেকখানি ম্যাজেণ্টার গুঁড়ো চেয়ে নিয়েছিলুম।

সন্ধ্যার একটু পরেই খেয়ে শুয়েচি। কত রাত্রে যেন ঘুম ভেঙে গেল—একটু অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখি আমাদের ঘরের দোরে জ্যাঠাইমা আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনের দল, ছোটকাকা—সবাই দাঁড়িয়ে। মা কাঁদচেন—সীতা বিছানায় সবে ঘুম ভেঙে উঠে বসে চোখ মুছচে। আমার জ্যাঠতুত ভাই হেসে বললেন—ঐ ছাখ্ তোর বাবা কি করচে! চেয়ে দেখি ঘরের কোণে খাটে বাবা তিনটে বালিশের তুলো ছড়ে পুঁটুলি বাঁধচেন। তুলোতে বাবার চোখমুখ, মাথার চুল, সারা গা এক অদ্ভুত রকম হয়েছে দেখতে। আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলুম —কি হয়েছে বাবা?

বাবা বললেন—চা-বাগানে আবার চাকরি পেয়েছি—ছোট সাহেব

তার করেচে; সকালের গাড়ীতে যাব কি না তাই পুঁটুলিগুলো বেঁধেছেঁদে এখন না রাখলে—ক'টা বাজল রে খোকা?

আমার বয়স কম হলেও আমার বুঝতে দেরি হ'ল না যে এবার বাবা মাতাল হন্ নি। এ অন্য জিনিষ। তার চেয়েও গুরুতর কিছু। ঘরের দৃশ্যটা আমার মনে চিরকালের একটা ছাপ ক'রে দিয়েছিল—জীবনে কখনও ভুলিনি—চোখ বুজলেই উত্তরজীবনে আবার সে রাত্রির দৃশ্যটা মনে এসেছে। একটা মাত্র কেরোসিনের টেমি জ্বলচে ঘরে—তারই রাঙা ক্ষীণ আলোয় ঘরের কোণে বাবার তুলো-মাখা চেহারা—মাথায় মুখে, কানে পিঠে সর্ব্বাঙ্গে ছেঁড়া বালিসের লাল্‌চে পুরানো বিচি-ওয়ালা তুলো, মেজেতে বসে মা কাঁদচেন—দরজার কাছে কৌতুক দেখতে খুড়ীমা জ্যেঠাইমারা জড় হয়েছেন—খুড়তুতো ভাই বোনেরা হাসচে।...দাদাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম না, বোধ হয় বাইরে কোথাও গিয়ে থাক্‌বে।

পর দিন সকালে আমাদের ঘরের সাম্‌নে উঠানে দলে দলে লোক জড় হ'তে লাগল। এদের মুখে শুনে প্রথম বুঝলাম বাবা পাগল হ'য়ে গিয়েচেন। সংসারের কষ্ট, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, পরের বাড়ির এই যন্ত্রণা—এই সব দিনরাত ভেবে ভেবে বাবার মাথা গিয়েছে বিগ্‌ড়ে। অবিশ্যি এ-সব কারণ অনুমান করেছিলুম বড় হ'লে অনেক পরে।

বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তে, যারা কোনো দিন এর আগে বাবার সঙ্গে মৌখিক ভদ্র আলাপটা করতেও আসেনি তারা মজা দেখতে আসতে লাগল দলে দলে।

বাবার মূর্ত্তি হয়েছে দেখতে অদ্ভুত। রাত্রে না ঘুমিয়ে চোখ বসে গিয়েছে—চোখের কোণে কালি মেড়ে দিয়েছে যেন। সর্ব্বাঙ্গে তুলো মেখে বাবা সেই রাতের বিছানার ওপরই বসে আপন মনে কত কি বক্‌ছেন। ছেলেপিলের দল এপাড়া-ওপাড়া থেকে এসেছে। তারা

ঘরের দোরে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে। কেউ বা উঁকি মেরে দেখচে—হাসাহাসি করচে। আমাদের সঙ্গে পড়ে এই পাড়ার নবীন বাঁড়ুয্যের ছেলে শান্টু—সে একবার উঁকি মেরে দেখতেই বাবা তাকে কি একটা ধমক দিয়ে উঠলেন। সে ভাণ-করা ভয়ের সুরে ব'লে উঠল—ও বাবা! মারবে নাকি?—বলেই পিছিয়ে এল। ছেলের দলের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ পড়ে গেল।

এক জন বললে—আবার কি রকম ইংরিজি বলছে গ্যাখ্—

আমি ও সীতা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি! আমরা কেউ কোন কথা বল্‌চি নে।

আর একটু বেলা হ'লে জ্যাঠামশায় কি পরামর্শ করলেন সব লোকজনের সঙ্গে—আমার মাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—বৌমা সবই তো দেখতে পাচ্চ—তোমাদের কপাল ছাড়া আর কি বলব। ভূষণকে এখন বেঁধে রাখতে হবে—সেই মতই সবাই করেছেন। ছেলেপিলের বাড়ি—পাড়ার ভেতরকারকাণ্ড—ওরকম অবস্থায় কখন কি ক'রে বসে, তা বলা যায় না···তা তোমায় একবার বলাটা দরকার তাই—

আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল—বাবাকে বাঁধবে কেন? বাবা তো এক বকুনি ছাড়া আর কারুর কিছু অনিষ্ট করতে যাচ্ছেন না?—কেন তবে—

আমার মনের ভাষা বাক্য খুঁজে পেলে না প্রকাশের—মনেই রয়ে গেল। বাবাকে সবাই মিলে বাঁধলে। আহা, কি কসে কসেই বাঁধলে! অন্য দড়ি কোথাও পাওয়া গেল না বা ছিল না—জ্যাঠামশায়দের খিড়কী-পুকুর ধারের গোয়াল বাড়ি থেকে গরু বাঁধবার দড়ি নিয়ে এল—তাই দিয়ে বাঁধা হ'ল।

আমার মনে হ'ল অতটা জোর ক'রে বাবাকে বাঁধবার দরকার কি! বাবার হাতের শির দড়ির মত ফুলে উঠেছে যে। সেজকাকাকে চুপি

চুপি বললুম—কাকাবাবু বাবার হাতে লাগচে, অত ক'সে বেঁধেচে কেন? বলুন না ওদের?

কাকা সে-কথা জ্যাঠামশায়কে ও নিতাইয়ের বাবাকে বললেন—তুমিও কি খেপলে নাকি রমেশ? হাত আলগা থাকবে পাগলের?···তা হলে পা খুলতে কতক্ষণ—তারপরে আমার দিকে চেয়ে জ্যাঠামশায় বললেন—যাও জিতু বাবা—তুমি বাড়ির ভেতরে যাও—নয়তো এখন বাইরে গিয়ে বসো।

আবার বাবার হাতের দিকে চেয়ে দেখলুম—দড়ির দাগ কেটে বসে গিয়েচে বাবার হাতে। সেই রকম তুলোমাখা অদ্ভুত মূর্ত্তি!···

বাইরে গিয়ে আমি একা গাঁয়ের পেছনের মাঠের দিকে চলে গেলুম—একটা বড় তেঁতুলগাছের তলায় সারা দুপুর ও বিকেল চুপ ক'রে বসে রইলুম।

দিনকতক এই ভাবে কাট্‌ল। তারপর পাড়ার দু-পাঁচ জন লোকে এসে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কি পরামর্শ করলে। বাবাকে কোথায় তারা নিয়ে গেল, সবাই বললে কলকাতায় হাঁসপাতালে নিয়ে গেছে। তারা ফিরেও এল, শুনলুম বাবাকে নাকি হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করে নিয়েছে। শীগ্‌গিরই সেরে বাড়ী ফিরবেন। আমরা আশ্বস্ত হলুম।

দশ-বার দিন পরে একদিন বিকেলের দিকে আমি ও সীতা পথে খেলা করচি, এমন সময় সীতা বললে—ঐ যে বাবা!···দূরে পথের দিকে চেয়ে দেখি বাবাই বটে। ছুটে আমরা বাড়িতে মাকে খবর দিতে গেলুম। একটু পরে বাবা বাড়ি ঢুকলেন—এক হাঁটু ধূলো, রুক্ষ চুল। ওপর থেকে জ্যাঠাইমা নেমে এলেন, কাকারা এলেন। বাবাকে

দেখে সবাই চটে গেলেন। সবাই বুঝতে পারলে বাবা এখনও সারেন নি, তবে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসার কি দরকার?

বাবা একটু বসে থেকে বললেন ভাত আছে? কাল ওই দিকের একটা গাঁয়ে দুপুরে দুটো খেতে দিয়েছিল, আর কিছু খাইনি সারাদিন, খিদে পেয়েছে। কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে আসচি—ছেলেপিলে ছেড়ে থাক্‌তে পারলাম না—চলে এলাম।

একটু পরেই বোঝা গেল বাবা হাঁসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং যেমন পাগল তেমনি আছেন। এবার আমাদের রাগ হ'ল—মায়ের কথা বল্‌তে পারিনে, কারণ তাঁকে রাগ প্রকাশ করতে কখনও দেখিনি—কিন্তু আমি সীতা দাদা তিন ভাইবোনে খুব চটলাম।

আমাদের চটবার কারণও আছে—খুব সঙ্গত কারণই আছে। আমাদের প্রাণ এখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বাবা আবার পুরোমাত্রায় পাগল হ'য়ে উঠলেন—তিনি দিন রাত বসে বসে বকেন আর কেবল খেতে চান। মা দুটি বাসি মুড়ি, কোনো দিন বা ভিজে চাল, কোনো দিন শুধু একটু গুড়—এই খেতে দেন। তাও সব দিন বা সব সময় জোটানো কষ্টকর। আমরা দুপুরে খাইতো রাতে আর কিছু খেতে পাইনে—নয়ত সারাদিন পরে হয়ত সন্ধ্যার সময় খাই। মা কোথা থেকে চাল জোগাড় করে আনেন আমরা জানিনে—কখনও জিগ্যেসও করিনি। কিন্তু বাড়ীতে আর আমাদের তিষ্ঠুবার যো নেই। বাড়ীশুদ্ধ লোক আমাদের ওপর বিরূপ—দু-বেলা তাদের অনাদর আর মুখ নাড়া সহ্য করা আমাদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। চা-বাগানের দিনগুলোর কথা মনে হয়, সেখানে আমাদের কোন কষ্ট ছিল না—অবস্থা ছিল অত্যন্ত সচ্ছল ছেলেবেলায় সীতাকে ভুটিয়া চাকরে নিয়ে বেড়াত আর থাপা মানুষ করেছিল আমাকে। ছ-বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি থাপার কাঁধে উঠে বেড়াতাম মনে আছে। আমাদের এই বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য

বাবাকে আমরা মনে মনে দায়ী করেছি। বাবা কেন আবার ভাল হ'য়ে সেরে উঠন না? তা হ'লে আর আমাদের কোনো দুঃখই থাকে না। কেন বাবা ওরকম পাগলামি করেন? ওতে লজ্জায় যে ঘরে বাইরে আমাদের মুখ দেখাবার যো নাই।

সে দিন সকালে সেজখুড়ীমা এসে আমাদের সঙ্গে খুব ঝগড়া বাধালেন। মেজখুড়ীমাও এসে যোগ দিলেন। তাঁদের বাগানে বাতাবী নেবু গাছ থেকে চার-পাঁচটা পাকা নেবু চুরি গিয়াছে। খুড়ী মা এসে মাকে বললেন—এ আমাদেরই কাজ—আমরা খেতে পাইনে, আমরাই নেবু চুরি ক'রে ঘরে রেখেচি। তাঁরা সবাই মিলে আমাদের ঘর খানাতল্লাসী করতে চাইলেন। মা বললেন—এসে দেখে যান মেজদি, আমার ঘরে তো লোহার সিন্দুক নেই যেখানে আমার ছেলে মেয়েরা নেবু লুকিয়ে রেখেছে···এসে দেখুন—

শেষ পর্য্যন্ত বাবা ঘরে আছেন ব'লে তাঁরা ঘরে ঢুকতে পারলেন না, কিন্তু সবাই ধরে নিলেন যে নেবু আমাদের ঘরেই আছে, খানাতল্লাসী করলেই বেরিয়ে পড়ত। খুব ঝগড়া ঝাঁটি হ'ল—তবে সেটা হ'ল এক-তরফা, কারণ এ-পক্ষ থেকে তার জবাব কেউ দিলে না।

জ্যাঠাইমা এ-বাড়ীর কর্ত্রী, তাঁকে সবাই মেনে চলে, ভয়ও করে। তিনি এসে বললেন—হয় তোমরা বাড়ী থেকে চলে যাও নয়ত ঘরের ভাড়া দাও।

সীতা এসে আমাকে বললে—জ্যাঠাইমা এবার বাড়িতে আর থাকতে দেবে না, না দেবে না দেবে, আমরা কোথাও চলে যাই চল দাদা।

দিন দুই পরে জ্যাঠামশাইদের সঙ্গে কি একটা মিট মাট হ'ল। ঠিক হ'ল যে দাদা চাকুরির যোগাড় করতে কল্‌কাতায় যাবে, ঘরে আমরা আপাততঃ কিছুকাল থাকতে পাব। কিন্তু বাড়ির ওপাড়ার সবাই

বললে—পাগলটাকে আর বাড়ী রেখে দরকার নেই, ওকে জলেজঙ্গলে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আয়।

সত্যি কথা বলতে গেলে বাবার উপর আমাদের কারুর আর মমতা ছিল না। বাবার চেহারাও হয়ে উঠেছে অদ্ভুত। একমাথা লম্বা চুল জটা পাকিয়ে গিয়েছে—আগে আগে মা নাইয়ে দিতেন, আজকাল বাবা কিছুতেই নাইতে চান না, কাছে যেতে দেন না, কাপড় ছাড়েন না··· গায়ের গন্ধে ঘরে থাকা অসম্ভব! মা একদিনও রাত্রে ঘুমুতে পারেন না—বাবা কেবলই ফাইফরমাস করেন—জল দাও, পান দাও—আর কেবলই বলেন খিদে পেয়েছে। কখনও বলেন চা ক'রে দাও। না পেলেই তিনি আরও খেপে উঠেন—এক মা ছাড়া তখন আর কেউ সামলে রাখতে পারে না—আমরা তখন ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই, মা বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করে চুপ করিয়ে রাখেন, নয়ত জোর ক'রে বালিসে শুইয়ে দিয়ে বাতাস করেন, পা টিপে দেন—কিন্তু তাতে বাবা সাময়িক চুপ করে থাকেন বটে, ঘুমোন না। পাগল হয়ে পর্য্যন্ত বোধ হয় একদিনও বাবার ঘুম হয়নি। নিজেও ঘুমুবেন না, কাউকেও ঘুমুতে দেবেন না—সারারাত চীৎকার, বকুনি, ইংরিজি বক্তৃতা, গান— এই সব করবেন। সবাই বলে ঘুমুলে না-কি বাবার রোগ সেরে যেত।

শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মা মত দিয়েছিলেন, হয়ত বলেছিলেন—তোমরা যা ভাল বোঝ করো বাপু। মোটের ওপর একদিন স্কুলে দাদা এসে বললে—সকাল সকাল বাড়ি চল আজ জিতু—আজ বাবাকে আড়াগাঁয়ের জলার ধারে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে—তুই, আমি, নিতাই, সিধু আর মেজকাকা যাবে।

একটু পরে আমি ছুটী নিয়ে বেরুলাম। গিয়ে দেখি মা দালানে বসে কাঁদচেন, আমরা যাবার আগেই নিতাই এসে বাবাকে নিয়ে গিয়েছে। আমরা খানিক দূরে গিয়ে ওদের নাগাল পেলাম—পাড়ার চার-পাঁচ জন ছেলে সঙ্গে আছে, মধ্যিখানে বাবা। ওরা বাবার সঙ্গে

বাজে বকছে—শিকারের গল্প করচে, বাবাও খুব বকচেন। নিতাই, আমাকে বাবার সামনে যেতে বারণ করাতে আমি আর দাদা পেছনেই রইলাম। ওরা মাঠের রাস্তা ধরে অনেক দূর গেল, একটা বড় বাগান পার হ'ল, বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঘেমে আমরা সবাই নেয়ে উঠলাম। রোদ যখন পড়ে গিয়েছে তখন একটা বড় বিলের ধারে সবাই এসে পৌছলাম। নিতাই বললে—এইতো আড়াগাঁয়ের জলা—চল, বিলের ওপারে নিয়ে যাই—ওই হোগলা বনের মধ্যে ছেড়ে দিলে আর পথ খুঁজে পাবে না রাত্তিরে। আমরা কেউ ওপারে গেলুম না—গেল শুধু সিধু আর নিতাই। খানিকটা পরে ওরা ফিরে এসে বললে চল্ পালাই—তোর বাবাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়ে এসেছি—বসে বসে টানচে। চল্ ছুটে পালাই—

সবাই মিলে দৌড় দিলাম। দাদা তেমন ছুটতে পারে না, কেবলই পেছনে পড়তে লাগল। সন্ধ্যার ঘোরে জলা আর জঙ্গলের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া যায় না—এক প্রহর রাত হয়ে গেল বাড়ি পৌছুতে। কিন্তু তিন দিনের দিন বাবা আমার বাড়ি এসে হাজির। চেহারার দিকে আর তাকানো যায় না—কাদা মাখা ধুলো-মাখা অতি বিকট চেহারা। বেল না কি ভেঙ্গে খেয়েছেন—সারা মুখে, গালে বেলের আঠা ও শাঁস মাথানো। মা নাইয়ে ধুইয়ে ভাত খেতে দিলেন, বাবা খাওয়া দাওয়ার পর সেই যে বিছানা নিলেন, দু-দিন চার দিন ক'রে ক্রমে পনর দিন কেটে গেল, বাবা আর বিছানা থেকে উঠলেন না। লোকটা যে কেন বিছানা ছেড়ে ওঠে না—তার কি হয়েছে—একথা কেউ কোনো-দিন জিগ্যেসও করলে না। মা যেদিন যা জোটে খেতে দেন, মাঝে মাঝে নাইয়ে দেন—পাড়ার কোনো লোকে উঁকি মেরেও দেখে গেল না।

জ্যাঠামশাইরা হতাশ হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আর আমাদের সঙ্গে কথা কন না, তাঁদের ঘরে দোরে ওঠা আমাদের বন্ধ। আমরা কথা

বলি চুপি চুপি, চলি পা টিপে টিপে চোরের মত, বেড়াই [illegible] অপরাধীর মত—পাছে ওঁরা রাগ করেন, বিরক্ত হন, আবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে আসেন।

একদিন না খেয়ে স্কুলে পড়তে গিয়েছি—অন্য দিনের মত টিফিনের সময় সীতা খাবার জন্যে ডাকতে এল না। প্রায়ই আমি না খেয়ে স্কুলে আসতাম, কারণ অত সকালে মা রান্না করতে পারতেন না—রান্না শুধু করলেই হ'ল না, তার জোগাড় করাও তো চাই। মা কোথা থেকে কি জোগাড় করতেন, কি করে সংসার চালাতেন, তিনিই জানেন। আমি কখনও তা নিয়ে ভাবিনি। আমি ক্ষুধাতুর অবস্থায় বেলা একটা পর্য্যন্ত ক্লাসের কাজ ক'রে যেতাম আর ঘন ঘন পথের দিকে চাইতাম এবং রোজই একটার টিফিনের সময় সীতা এসে ডাক দিত—দাদা ভাত হয়েচে খাবে এস।

এ-দিন কিন্তু একটা বেজে গেল, তুটো বেজে গেলে, সীতা [illegible] না। ক্লাসের কাজে আমার আর মন নেই—আমি জানালা দিয়ে ঘন ঘন বাইরে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চি। আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল, বেলা আড়াইটা। এমন সময় কলুদের দোকানঘরের কাছে সীতাকে আসতে দেখতে পেলাম। আমার ভারি রাগ হ'ল, অভিমানও হ'ল। নিজেরা সব খেয়ে দেয়ে পেট ঠাণ্ডা ক'রে এখন আস্‌ছেন!

মাষ্টারের কাছে ছুটী নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। সীতার দিকে চেয়ে দূর থেকে বললাম—বেশ দেখ্‌চি—আমার বুঝি আর খিদে তেষ্টা পায় না? কটা বেজেছে জানিস্‌?

সীতা বললে—বাড়ি এস ছোড়দা, তোমার বই দপ্তর নিয়ে ছুটী ক'রে এস গে—

আমি বললাম—কেন রে?

সীতা বললে—এস না, ছুটির আর দেরি বা কত? তিনটে বেজেচে।

আমার মনে হ'ল একটা কি যেন হয়েচে। স্কুল থেকে বেরিয়ে একটু দূর এসেই সীতা বললে—বাবা মারা গিয়েচে ছোড়দা।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—সীতার মুখের দিকে চেয়ে সে যে মিথ্যে কথা বলচে এমন মনে হ'ল না। বললাম—কখন?

সীতা বললে—বেলা একটার সময়—

নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—নিয়ে গিয়েচে তো?

অর্থাৎ গিয়ে মৃতদেহ দেখতে না হয়। কিন্তু সীতা বললে—না, নিয়ে এখনও কেউ যায়নি। মা একা কি করবে?···জ্যাঠামশায় বাড়ি নেই—ছোটকাকা একবার এসে দেখে চলে গেলেন—আর আসেন নি। মেজকাকা পাড়ায় লোক ডাক্‌তে গেছেন।

বাড়িতে ঢুক্‌তেই মা বললেন—ঘরের মধ্যে আয়—মড়া ছুঁয়ে বসে থাক্‌তে হবে, বোস্ এখানে। কেউই কাঁদছে না। আমারও কান্না পেল না—বরং একটা ভয় এল—একা মড়ার কাছে কেমন ক'রে কতক্ষণ বসে থাক্‌ব না জানি!

অনেকক্ষণ পরে শুন্‌তে পেলুম আমাদের পাড়ার কেউ মৃতদেহ নিয়ে যেতে রাজী নয়, বাবা কি রোগে মারা গেছেন কেউ জানে না, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করানো হয়নি মৃত্যুর পূর্ব্বে—এ অবস্থায় কেউ সৎকার করতে রাজী নয়। প্রায়শ্চিত্ত এখন না করালে কেউ ও-মড়া ছোঁবে না।

প্রায়শ্চিত্ত করাতে পাঁচ-ছ টাকা নাকি খরচ! আমাদের হাতে অত তো নেই? মা বললেন। কে যেন বললে—তা এ অবস্থায় হাতে না থাক্‌লে লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে আন্‌তে হয়, কি আর করা?

দাদাকে মা ও-পাড়ার কার কাছে যেন পাঠালেন টাকার জন্যে। খানিকটা পরে ও-পাড়া থেকে জনকতক ষণ্ডামত লোক এল—শুন্‌লাম তারা গালাগালি দিতে দিতে বাড়িতে ঢুক্‌ছে—এমন ছোটলোকের

পাড়াও তো কখন দেখিনি? কোথায় পাবে এরা যে প্রাচিত্তির করাবে? প্রাচিত্তির না হ'লে মরা কি সারা দিন রাত ঘরেই পড়ে থাক্‌বে। যত ছোট লোক সব—কোনো ভয় নেই, দেখি মড়া বার হয় কি না।

আমি উত্তেজনার মাথায় মড়া ছুঁয়ে বসে থাকার কথা ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দোরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এদের মধ্যে আমি এক-জনকে কেবল চিনি—মাঠবাড়ির ফুটবল খেলার ময়দানে দেখেছিলাম।

ওরা নিজেরাই কোথা থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে এল—পাট নিয়ে এসে দড়ি পাকালে, তারপর বাবাকে বার ক'রে নিয়ে গেল—দাদা গেল সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে। একটু পরে সন্ধ্যা হ'ল! সেজ খুড়ীমা এসে বললেন—মুড়ি খাবি জিতু? আমি ও সীতা মুড়ি খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তিন বছর আগেকার কথা এ সব। তারপর থেকে এই বাড়িতেই আছি। জ্যাঠামশাইরা প্রথমে রাজী হননি, দাদা ষষ্ঠীতলায় বটগাছের নীচে মুদীখানার দোকান করেছিল—সামান্য পুঁজি, আড়াই সের চিনি, পাঁচ সের ডাল, পাঁচ সের আটা, পাঁচ পোয়া ঝাল-মশলা—এই নিয়ে দোকান কতদিন চলে? দাদা ছেলে মানুষ, তা ছাড়া ঘোরপেঁচ কিছু বোঝে না, এক দিক থেকে সব ধারে বিক্রী করেচে, যে ধারে নিয়েচে আর ফিরে দোকানের পথ মাড়ায় নি। দোকান উঠে যাওয়ার পরে দাদা চাকরির চেষ্টায় বেরুলো, সে তার ছোট মাথায় আমাদের সংসারের সমস্ত ভাবনা-ভার তুলে নিয়ে বাবার প্রতিনিধি রূপে আমাদের খাওয়া পরানোর দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমুতো না, সারা দিন চাকরি খুঁজে বেড়াত। নস্তির কারখানায় একটা সাত টাকা মাইনের চাক্‌রিও পেলে—কিন্তু

বেশী দিন রইল না, মাস দুই পরে তারা বল্লে—ব্যবসার অবস্থা খারাপ, এখন লোক দরকার নেই।

সুতরাং জ্যাঠামশায়দের সংসারে মাথা গুঁজে থাকা ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কি? নিতান্ত লোকে কি বলবে এই ভেবে এঁরা রাজী হয়েছেন। কিন্তু এখানে আমাদের খাপ খায় না—এখানে মাত্র যে শুধু এ বাড়িতে তা নয়, এ দেশটার সঙ্গেই খাপ খায় না। বাংলা দেশ আমাদের কারও ভাল লাগে না—আমার না, দাদার না, সীতার না, মায়েরও না। না দেশটা দেখতে ভাল, না এখানকার লোকেরা ভাল। আমাদের চোখে এ দেশ বড় নীচু, আঁটাসাটা, ছোট ব'লে মনে হয়—যে-দিকেই চাই চোখ বেধে যায়, হয় ঘরবাড়িতে, না হয় বাঁশবনে আমবনে। কোথাও উঁচুনীচু নেই একঘেয়ে সমতলভূমি, গাছপালারও বৈচিত্র্য নেই। আমাদের এ গাঁয়েই যত গাছপালা আছে, তার বেশীর ভাগ এক ধরণের ছোট ছোট গাছ, এরা নাম বলে আশশেওড়া, তাদের পাতায় এত ধূলো যে সবুজ রং দিনরাত চাপা পড়ে থাকে। এখানে সব যেন দীনহীন, সব যেন ছোট মাপকাঠির মাপে গড়া।

আমাদের দিক থেকে তো গেল এই ব্যাপার। ওঁদের দিক থেকে ওঁরা আমাদের পর ক'রে রেখেছেন এই তিন-চার বছর ধরেই। ওঁদের আপনার দলের লোক ব'লে ওঁরা আমাদের ভাবেন না। আমরা খিরিষ্টান, আচার জানিনে, হিঁদুয়ানী জানিনে—জংলী জানোয়ারের সামিল, গারো পাহাড়ী অসভ্য মানুষদের সামিল। পাহাড়ী জাতিদের সম্বন্ধে ওঁরা যে খুব বেশী জানেন, তা নয়—এবং জানেন না বলেই তাদের সম্বন্ধে ওঁদের ধারণা অদ্ভুত ও আজগুবী ধরণের।

এদেশে শীতকাল নেই—মাস দুই তিন একটু ঠাণ্ডা পড়ে। তা ছাড়া সারা বছর ধ'রে গরম লেগেই আছে—আর সে কি সাংঘাতিক গরম! সে গরমের ধারণা ছিল না কোন কালে আমাদের। রাতের

পর রাত ঘুম হয় না, দিনমানেও ঘামে বিছানা ভিজে যায় ব'লে ঘুম হয় না। গা জ্বলে, মাথার মধ্যে কেমন করে, রাত্রে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে এক এক দিন। তার ওপরে মশা। কি সুখেই লোকে এ-সব দেশে বাস করে!

৪

জ্যাঠামশাইদের বাড়ির শালগ্রামশিলার ওপর আমার ভক্তি ছিল না। ওঁদের জাঁকজমক ও পূজার সময়কার আড়ম্বরের ঘটা দেখে মন আরও বিরূপ হ'য়ে উঠ্‌ল। আগেই বলেছি আমার মনে হ'ত ওঁদের এই পূজা-অর্চ্চনার ঘটার মূলে রয়েছে বৈষয়িক উন্নতির জন্যে ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখান ও ভবিষ্যতে যাতে আরও টাকাকড়ি বাড়ে সে-উদ্দেশ্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানানো। তাঁকে প্রসন্ন রাখলেই এদের আয় বাড়বে, দেশের খাতির বাড়বে—আমার জ্যাঠাইমাকে সবাই বল্‌বে ভাল, সংসারের লক্ষ্মী, ভাগ্যবতী—তাঁর পয়েতে এ-সব হচ্ছে, সবাই খোশামোদ করবে, মন জুগিয়ে চল্‌বে। পাশাপাশি অম্‌নি আমার মায়ের ছবি মনে আসে। মা কোন্ গুণে জ্যাঠাইমার চেয়ে কম? মাকে চা-বাগানে দেখেছি কল্যাণী মূর্ত্তিতে—লোকজনকে খাওয়ানো-মাখানো, কুলীদের ছেলেমেয়েদের পুঁতির মালা কিনে দেওয়া, আদরযত্ন করা, আমাদের একটু অসুখে রাত জেগে বিছানায় বসে থাকা। কাছাকাছি কোন চা-বাগানের বাঙালীবাবু সোনাদায় নেমে যখন বাগানে যেত, আমাদের বাসায় না-খেয়ে যাবার উপায় ছিল না। আর সেই মা এখানে এদের সংসারে দাসী, পরণে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কাজ কর্‌তে পারলে সুখ্যাতি নেই, না পারলে বকুনি আছে, গালাগাল

আছে—সবাই হেনস্থা করে, কারও কাছে এতটুকু মান নেই, মাথা তুলে বেড়াবার মুখ নেই। কেন, ঠাকুরকে ঘুস্ দিতে পারেন না ব'লে? আমার মনে হ'ত জ্যাঠাইমাদের শালগ্রামশিলা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন, তিনি ষোড়শোপচারে পুজো পেয়ে জ্যাঠাইমাকে বড় ক'রে দিয়েছেন, অন্য সকলের ওপর জ্যাঠাইমা যে অত্যাচার অবিচার করছেন, তা চেয়েও দেখছেন না ঠাকুর।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর ঘরে আরতি সুরু হয়েছে; নরু, সীতা, সেজকাকার ছেলে পুলিন আর আমি দেখতে গেছি। পুরুতঠাকুর ওদের সবারই হাতে একটা ক'রে রূপোবাঁধানো চামর দিলে—আরতির সময় তারা চামর ঢুলুতে লাগল। আমার ও সীতার হাতে দিলে না। সীতা চাইতে গেল, তাও দিলে না। একটু পরে ধূপ ধুনোর ধোঁয়ায় ও সুগন্ধে দালান ভরে গিয়েছে, বুলু ও ফেণী কাঁসর বাজাচ্ছে, পুরুত-ঠাকুরের ছোট ভাই রাম ঘড়ি পিট্‌চে, পুরুতঠাকুর তন্ময় হ'য়ে পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বেলে আরতি কর্‌চে—আমি ও সীতা ছিটের দোলাই-মোড়া ঠাকুরের আসনের দিকে চেয়ে আছি—এমন সময় আমার মনে হ'ল এ-দালানে শুধু আমরা এই ক'জন উপস্থিত নেই, আরও অনেক লোক উপস্থিত আছে, তাদের দেখা যাচ্ছে না, তারা সবাই অদৃশ্য। আমার গা ঘুরতে লাগল, আর কানের পেছনে মাথার মধ্যে একটা জায়গায় যেন কতকগুলো পিঁপড়ে বাসা ভেঙে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। আমি জানি, এ আমার চেনা, জানা, বহুপরিচিত লক্ষণ, অদৃশ্য কিছু দেখবার আগেকার অবস্থা—চা-বাগানে এ-রকম কতবার হয়েছে। শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি হয়—সে ঠিক ব'লে বোঝানো যায় না, জ্বর আসবার আগে যেমন লোক বুঝতে পারে এইবার জ্বর আসবে, এও ঠিক তেমনি। আমি সীতাকে কি বল্‌তে গেলাম, পিছু হঠে গিয়ে দালানের থাম ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম, গা বমি-বমি ক'রে উঠলে লোকে

যেমন সে ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করে, আমিও সেই রকম স্বাভাবিক অবস্থায় থাক্‌বার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ধীরে ধীরে পূজার দালানের তিন ধারের দেওয়াল আমার সাম্‌নে থেকে অনেক দূরে···অনেক দূরে সরে যেতে লাগল···কাঁসর ঘড়ির আওয়াজ ক্ষীণ হ'য়ে এল···কতকগুলো বেগুনী ও রাঙা রঙের আলোর চাকা যেন একটা আর একটার পিছনে তাড়া করেছে·····সারি সারি বেগুনী ও রাঙা আলোর চাকার খুব লম্বা সারি আমার চোখের সামনে দিয়ে খেলে যাচ্ছে···তারপর আমার বাঁয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা বড় নদী, ওপারেও সুন্দর গাছপালা, নীল আকাশ··· এপারেও অনেক ঝোপ বন···কিন্তু যেন মনে হ'ল সব জিনিষটা আমি ঝাড় লণ্ঠনের তেকোণা কাচ দিয়ে দেখ্‌চি···নানা রঙের গাছপালা ও নদীর জলের ঢেউয়ের নানা রং···ওপারটায় লোকজনে ভরা, মেয়েও আছে, পুরুষও আছে···গাছপালার মধ্যে দিয়ে একটা মন্দিরের সরু চূড়ো ঠেলে আকাশে উঠেছে···আর ফুল যে কত রঙের আর কত চমৎকার তা মুখে বল্‌তে পারিনে, গাছের সারা গুঁড়ি ভ'রে যেন রঙীন ও উজ্জ্বল থোবা থোবা ফুল···হঠাৎ সেই নদীর এক পাশে জলের ওপর ভাসমান অবস্থায় জ্যাঠামশাইদের ঠাকুর-ঘরটা একটু একটু ফুটে উঠল, তার চারিদিকে নদী, কড়ি কাঠের কাছে কাছে সে নদীর ধারের ডাল তার থোকা থোকা ফুলসুদ্ধ হাওয়ায় দুল্‌চে···ওদের সেই দেশটা যেন আমাদের ঠাকুর-ঘরের চারি পাশ ঘিরে···মধ্যে, ওপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে আমার মন আনন্দে ভরে গেল···কান্না আসতে চাইল···কি জানি কোন্ ঠাকুরের ওপর ভক্তিতে···আমার ঘোর কাটল একটা চেঁচামেচির শব্দে। আমায় সবাই মিলে ঠেল্‌চে। সীতা আমার ডান হাত জোর ক'রে ধরে দাঁড়িয়ে আছে···পুরুতঠাকুর ও পুলিন রেগে আমায় কি বল্‌চে ···চেয়ে দেখি আমি ভোগের লুচির থালার অত্যন্ত কাছে পা দিয়ে

দাঁড়িয়ে আছি···আমার কোঁচা লুটুচ্ছে উঁচু ক'রে সাজানো ফুলকো লুচির রাশির ওপরে। তারপর যা ঘটল! পুরুতঠাকুর গালে চার পাঁচটা চড় কসিয়ে দিলেন···মেজকাকা এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বল্লেন। জ্যাঠাইমা এসে নরু-পুলিনদের ওপর আগুন হ'য়ে বল্তে লাগলেন সবাই জানে আমি পাগল, আমার মাথার রোগ আছে, আমায় তারা কেন ঠাকুরদালানে নিয়ে গিয়েছিল আরতির সময়।······

মেজকাকার মারের ভয়ে অন্ধকার রাত্রে জ্যাঠামশায়দের খিড়কী-পুকুরের মাদার-তলায় একা এসে দাঁড়ালাম। সীতা গোলমালে টের পায়নি আমি কোথায় গিয়েছি। আমার গা কাঁপছিল ভয়ে···এ আমার কি হ'ল? আমার এমন হয় কেন? এ কি খুব শক্ত ব্যারাম? ঠাকুরের ভোগ আমি ত ইচ্ছে ক'রে ছুঁইনি? তবে ওরা বুঝলে না কেন? এখন আমি কি করি?

আমি হিন্দু দেবদেবী জান্তাম না, সে-শিক্ষা আজন্ম আমাদের কেউ দেয়নি। কিন্তু মিশনরী মেমদের কাছে জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যা শিখে এসেছি, সেই শিক্ষা অনুসারে অন্ধকারে মাদারগাছের গুঁড়ির কাছে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে হাতজোড় ক'রে মনে মনে বল্লাম—হে প্রভু যিশু, হে সদাপ্রভু, তুমি জান আমি নির্দ্দোষ—আমি ইচ্ছে ক'রে করিনি কিছু, তুমি আমার এই রোগ সারিয়ে দাও, আমার যেন এ-রকম আর কখনও না হয়। তোমার জয় হোক, তোমার রাজত্ব আসুক, আমেন্।

•

সকালে স্নান ক'রে এসে দেখি সীতা আমাদের ঘরের বারান্দাতে এক কোণে খুঁটি হেলান দিয়ে বসে পড়ছে। আমি কাছে গিয়ে বললাম—দেখি কি পড়ছিস্ সীতা? সীতা এমন এক মনে বই পড়ছে যে বই

থেকে চোখ না তুলেই বললে—ও-পাড়ার বৌদিদির কাছ থেকে এনেছি—প্রফুল্লবালা—গোড়াটা একটু পড়ে ছাখো কেমন চমৎকার বই দাদা—

আমি বইখানা হাতে নিয়ে দেখলাম, নামটা 'প্রফুল্লবালা' বটে। আমি বই পড়তে ভালবাসিনে, বইখানা ওর হাতে ফেরৎ দিয়ে বললাম—তুই এত বাজে বইও পড়তে পারিস্!

সীতা বললে—বাজে বই নয় দাদা, প'ড়ে দেখো এখন। জমিদারের ছেলে সতীশের সঙ্গে এক গরিব ভট্টচায্যি বামুনের মেয়ে প্রফুল্লবালার দেখা হয়েছে। ওদের বোধ হয় বিয়ে হবে।

সীতা দেখতে ভাল বটে, কিন্তু যেমন সাধারণতঃ ভাইয়েরা বোনেদের চেয়ে দেখতে ভাল হয়, আমাদের বেলাতেও তাই হয়েছে। আমাদের মধ্যে দাদা সকলের চেয়ে সুন্দর—যেমন রং, তেমনই চোখমুখ, তেমনই চুল—তারপর সীতা, তারপর আমি। দাদা যে সুন্দর, এ-কথা শত্রুতেও স্বীকার করে—সে আগে থেকে ভাল চোখ, ভাল মুখ, ভাল রং দখল ক'রে বসেছে—আমার ও সীতার জন্যে বিশেষ কিছু রাখেনি। তা হলেও সীতা দেখতে ভাল। তা ছাড়া সীতা আবার সৌখীন—সর্ব্বদা ঘ'ষে মেজে, খোঁপাটি বেঁধে, টিপটি প'রে বেড়ান তার স্বভাব। কথা বলতে বলতে দশ বার খোঁপায় হাত দিয়ে দেখচে খোঁপা ঠিক আছে কি-না। এ নিয়ে এ-বাড়িতে তাকে কম কথা সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু সীতা বিশেষ কিছু গায়ে মাখে না, কারুর কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না—চিরকালের একগুঁয়ে স্বভাব তার।

আমার মনে মাঝে মাঝে কষ্ট হয়, আমাদের তো পয়সা নেই, সীতাকে তেমন ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারব না—এই সব পাড়াগাঁয়ে আমার জ্যাঠামশায়দের মত বাড়িতে, আমার জ্যাঠাইমার মত শাশুড়ীর হাতে পড়বে—কি দুর্দ্দশাইটা যে ওর হবে! ওর এত বই পড়ার ঝোঁক

যে, এ-পাড়ার ও-পাড়ার বৌঝিদের বাক্সে যত বই আছে চেয়ে-চিন্তে এনে এ-সংসারের কঠিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব পড়ে ফেলে দিয়েচে। জ্যাঠাইমা তো এমনিই বলেন, "ও-সব অলুক্ষুণে কাণ্ড বাপু—মেয়ে-মানুষের আবার অত বই পড়ার সখ, অত সাজগোজের ঘটা কেন? পড়বে তেমন শাশুড়ীর হাতে, ঝাঁটার আগায় বই পড়া ঘুচিয়ে দেবে তিন দিনে।"

সীতার বুদ্ধি খুব। 'শতগল্প' ব'লে একখানা বই ও কোথা থেকে এনেছিল, তাতে 'সোনামুখী ও ছাইমুখী' ব'লে একটা গল্প আছে, সৎমার সংসারে গুণবতী লক্ষ্মীমেয়ে সোনামুখী ঝাঁটা লাথি খেয়ে মানুষ হ'ত—তারপর কোন্ দেশের রাজকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হ'য়ে গেল ভগবানের দয়ায়—সীতা দেখি গল্পটার পাতা মুড়ে রেখেছে। ও-গল্পটার সঙ্গে ওর জীবনের মিল আছে, এই হয়ত ভেবেছ। কিন্তু সীতা একটি কথাও মুখ ফুটে বলে না কোন দিন। ভারি চাপা।

সীতা বই থেকে চোখ তুলে পথের দিকে চেয়ে বললে—ঐ হীরুঠাকুর আসচে দাদা আমি পালাই—

আমি বললাম—বোস, হীরুঠাকুর কিছু বল্‌বে না। ও ঠিক আজ এখানে খাবার কথা বল্‌বে দ্যাখ্।

হীরুঠাকুরকে এ-গাঁয়ে আসা পর্য্যন্ত দেখছি। রোগা কালো চেহারা, খোঁচা খোঁচা একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, পরণে থাকে আধময়লা থান, খালি পা, কাঁধে ময়লা চাদর, তার ওপরে একখানা ময়লা গামছা ফেলা। নিজের ঘরদোর নেই, লোকের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়ানো তার ব্যবসা। আমরা যখন এখানে নতুন এলাম, তখন কতদিন হীরুঠাকুর এসে আমাকে বলেছে, "তোমার মাকে বল খোকা, আমি এখানে আজ দুটো খাবো।" মাকে বলতেই তখুনি তিনি রাজী হতেন—মা চিরকাল এমন ছিলেন না, লোককে খাওয়াতে-মাখাতে চিরদিনই তিনি ভালবাসতেন।

আমার কথাই ঠিক হ'ল। হীরুঠাকুর এসে বললে—"শোন খোকা, তোমার মাকে বলো আমি এখানে আজ দুপুরে চাট্টি ভাত খাবো।" সীতা বই মুখে দিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হেসেই খুন। আমি বললাম, "হীরু-জ্যাঠা, আজকাল তো আমরা আলাদা খাইনে? জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে খাই বাবা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত। আপনি সেজকাকাকে বলুন গিয়ে। সেজকাকা কাঁটালতলায় নাপিতের কাছে দাড়ি কামাচ্ছেন।"

সেজকাকা লোক ভাল। হীরুঠাকুর আশ্বাস পেয়ে আমাদেরই ঘরের বারান্দায় বসল। সীতা উঠে একটা কম্বল পেতে দিলে। হীরুঠাকুর বললে, "তোমার দাদা কোথায়?" দাদার সঙ্গে ওর বড় ভাব। হীরুঠাকুরের গল্প দাদা শুনতে ভালবাসে, হীরুঠাকুরের কষ্ট দেখে দাদার দুঃখ খুব, হীরুঠাকুর না খেতে পেলে দাদা বাড়িতে থেকে চাল চুরি ক'রে দিয়ে আসে। এখানে যখন খেতে আসত তখুনি প্রথম দাদার সঙ্গে ওর আলাপ হয়, এই বারান্দায় বসেই। হীরুঠাকুরের কেউ নেই—একটা ছেলে ছিল, সে-নাকি আজ অনেকদিন নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে। হীরুঠাকুরের এখনও বিশ্বাস, ছেলে এক দিন ফিরে আসবেই এবং অনেক টাকাকড়ি আন্‌বে, তখন তার দুঃখ ঘুচবে। দাদা হীরুর ওই সব গল্প মন দিয়ে বসে বসে শোনে। অমন শ্রোতা এ-গাঁয়ে বোধ হয় হীরুঠাকুর আর কখনও পায়নি।

খেতে বসে হীরুঠাকুর এক মহা গোলমাল বাধিয়ে বস্‌ল। জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ে সরিকে ডেকে বললে, (হীরু কারুর নাম মনে রাখতে পারে না) "খুকী শোনো, বাড়ির মধ্যে জিগ্যেস্ কর তো ডালের বাটীতে তাঁরা কি কিছু মিশিয়ে দিয়েছেন? আমার গা যেন ঘুরচে।" সবাই জানে হীরুঠাকুরের মাথা খারাপ, সে ও রকম একবার আমাদের বাড়ী খেতে বসেও বলেছিল, কিন্তু বাড়িশুদ্ধ মেয়েরা বেজায় চট্‌ল এতে। চট্‌বারই কথা। জ্যাঠাইমা বললেন—"সেজঠাকুরপোর

খেয়ে-দেয়ে তো আর কাজ নেই, ও আপদ মাসের মধ্যে দশ দিন আসে এখানে খেতে। তার ওপর আবার বলে কি-না ডালে বিষ মাখিয়ে দিইচি আমরা। আ মরণ মড়ুইপোড়া বামুন, তোকে বিষ খাইয়ে মেরে কি তোর লাখো টাকার তালুক হাত করব? আজ থেকে বলে দাও সেজঠাকুরপো, এ-বাড়ির দোর বন্ধ হয়ে গেল, কোনো দিন সদরের চৌকাঠ মাড়ালে ঝাঁটা মেরে তাড়াবো।"

হীরু তখন খাওয়া শেষ করেছিল। জ্যাঠাইমার গালাগালি শুনে মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে উঠে গেল। দাদা এ-সময় বাড়ি ছিল না— আমাদের মুখে এরপর শুনে বললে—আহা, ও পাগল, ছেলের শোকে পাগল হয়েছে। ও কি বলে না-বলে তা কি ধরতে আছে? ছিঃ, খাবার সময় জ্যাঠাইমার গালমন্দ করা ভাল হয়নি। আহা!

সীতা বললে, "গালাগাল দেওয়া ভাল হয়নি কেন, খুব ভাল হয়েছে। খামোকা বলবে যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে? লোকে কি মনে করবে?"

দাদা আর কিছু বললে না, চুপ ক'রে রইল। সে কারুর সঙ্গে তর্ক করতে পারে না, সীতার সঙ্গে তো নয়ই। একবার কেবল আমায় জিগ্যেস করলে, "হীরুজ্যাঠা কোন্ দিকে গেল রে নিতু?" আমি বললাম আমি জানিনে।

এর মাস দুই তিন পরে," মাঘ মাসের শেষ, বিকেল বেলা। আমাদের ঘরের সামনে একটুখানি পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে স্কুলের অঙ্ক কষচি— এমন সময় দেখি হীরুঠাকুরকে সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে আসছে দাদা। হীরুঠাকুরের চেহারা শীর্ণ, মাথার চুল আরও উসকোখুসকো, মুখ প্যাণ্ডাস্—জ্বরে যেমনি কাঁপচে, তেমনি কাসচে। শুনলাম আজ

না-কি চার-পাঁচ দিন অসুখ অবস্থায় আমাদেরই পাড়ায় ভট্টাচার্যিদের পূজোর দালানে শুয়েছিল। অসুখে কাশ-থুথু ফেলে ঘর অপরিষ্কার করে দেখে তারা এই অবস্থায় বলেছে সেখানে জায়গা হবে না। হীরু-ঠাকুর চল্‌তে পারে না, যেমন দুর্ব্বল, তেমনি জ্বর আর সে কি ভয়ানক কাশি! কোথায় যায়, তাই দাদা তাকে নিয়ে এসেছে জ্যাঠামশায়দের বাড়ি। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। দাদার কি এতটুকু বুদ্ধি দেননি ভগবান! এটা কি নিজেদের বাড়ি যে এখানে যা খুশী করা চল্‌বে? কোন্ ভরসায় দাদা ওকে এখানে নিয়ে এল দ্যাখো তো?

যা ভয় করেছি, তাই হ'ল। হীরুকে অসুখ গায়ে হাত ধ'রে বাড়িতে এনেছে দাদা, এ কথা বিদ্যুদ্বেগে বাড়ীর মধ্যে প্রচার হ'য়ে যেতেই আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনেরা সব মজা দেখতে বাইরের উঠোনে ছুটে এল, সেজকাকা এসে বললেন—"না না—এখানে কে নিয়ে এল ওকে? এখানে জায়গা কোথায় যে রাখা হবে?" কিন্তু ততক্ষণ জ্যাঠামশায়দের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় হীরু শুয়ে ধুঁকছে, দাদা চণ্ডী-মণ্ডপের পুরোনো সপ্‌টা তাকে পেতে দিয়েছে। তখনি একটা ও-অবস্থার রোগীকে কোথায় বা সরানো যায়? বাধ্য হ'য়ে তখনকার মত জায়গা দিতেই হ'ল।

কিন্তু এর জন্যে কি অপমানটাই সহ্য করতে হ'ল দাদাকে। এই জন্যেই বল্‌চি দিনটা কখনো ভুলবো না। দাদাকে আমরা সবাই ভালবাসি, আমি সীতা দু-জনেই। আমরা জানি সে বোকা, তার বুদ্ধি নেই, সে এখনও আমাদের চেয়েও ছেলেমানুষ, সংসারের ভালমন্দ সে কিছু বোঝে না, তাকে বাঁচিয়ে আড়াল ক'রে বেড়িয়ে আমরা চলি। দাদাকে কেউ একটু বকলে আমরা সহ্য করতে পারিনে, আর সেই দাদাকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে সেজকাকা আথালিপাথালি চড়চাপড় মারলেন। বললেন, "বুড়ো ধাড়ী কোথাকার, ওই হাঁপকাশের

রুগী বাড়ি নিয়ে এলে তুমি কার হুকুমে? তোমার বাবার বাড়ি এটা? এতটুকু জ্ঞান হয়নি তোমার? সাহসও তো বলিহারি, জিগ্যেস্ না বাদ না কাউকে, একটা কঠিন রুগী বাড়ি নিয়ে এসে তুললে কোন্ সাহসে? নবাব হয়েছ না ধিঙ্গী হয়েছ? না তোমার চা-বাগান পেয়েছ?

এর চেয়ে বেশী কষ্ট হ'ল যখন জ্যাঠাইমা অনেক গালিগালাজের পর রোয়াকে দাঁড়িয়ে হুকুম জারি করলেন, "যাও, রুগী ছুঁয়ে ঘরে দোরে উঠতে পাবে না, পুকুর থেকে গায়ের ও-কোটসুদ্ধ ডুব দিয়ে এস গিয়ে।"

মাঘ মাসের শীতের সন্ধ্যা আর সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা পুকুরের জল—তার ওপর চা-বগোনের আমলের ওই ছেঁড়া গরম কোটটা ছাড়া দাদার গায়ে দেবার আর কিছু নেই, দাদা গায়ে দেবে কি নেয়ে উঠে? সীতা ছুটে গিয়ে শুকনো কাপড় নিয়ে এসে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। মাও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি ভালমানুষ, দাদাকে একটা কথাও বললেন না, কেবল ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে জল থেকে সে যখন উঠে এল, তখন নিজের হাতে গামছা দিয়ে তার মাথা মুছিয়ে দিলেন, সীতা শুক্‌নো কাপড় এগিয়ে দিলে, আমি গায়ের কোটটা খুলে পরতে দিলাম। রাত্রে মা সাবু ক'রে দিলেন আমাদের ঘরের উনুনে—দাদা গিয়ে হীরুঠাকুরকে খাইয়ে এল।

সকালবেলা সেজকাকা ও জ্যাঠামশাই দত্তদের কাঁটালবাগানের ধারে পোড়ো জমিতে বাড়ির কৃষাণকে দিয়ে খেজুরপাতার একটা কুঁড়ে বাঁধলেন এবং লোকজন ডাকিয়ে হীরুকে ধরাধরি ক'রে সেখানে নিয়ে গেলেন। দাদা চুপি চুপি একবাটি সাবু মা'র কাছ থেকে ক'রে নিয়ে দিয়ে এল। দিন দুই এই অবস্থায় কাটলো। মুখুজ্জে-বাড়ির বড়মেয়ে নলিনীদি রাত্রে একবাটি বার্লি দিয়ে আস্‌তো আর সকালবেলা যাবার সময় বাটিটা ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

একদিন রাতে দাদা বললে—"চল্ নিতু, আজ হীরুজ্যাঠার ওখানে রাতে থাক্‌বি ? রামগতি-কাকা দেখে বলেছে অবস্থা খারাপ। চল্ আগুন জ্বালাবো এখন, বড্ড শীত নইলে।"

রাত দশটার পর আমি ও দাদা দু-জনে গেলাম। আমরা যাওয়ার পর নলিনীদি সাবু নিয়ে এল। বললে, "কি রকম আছে যে হীরু-কাকা ?" তারপর সে চলে গেল। নারকোলের মালা দু-তিনটে শিয়রের কাছে পাতা, তাতে কাশথুথু ফেলেচে রুগী। আমার গা কেমন বমি-বমি করতে লাগল। আর কি কন্‌কনে ঠাণ্ডা! খেজুরের পাতার ঝাঁপে কি মাঘ মাসের শীত আটকায় ? দত্তদের কাঁটাল-বাগান থেকে শুক্‌নো কাঁটালপাতা নিয়ে এসে দাদা আগুন জ্বাল্‌লে। একটু পরে দু-জনই ঘুমিয়ে পড়লাম। কত রাত্রে জানি না, আমার মনে হ'ল হীরুজ্যাঠা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হীরুজ্যাঠা আর কাশচে না তার রোগ যেন সেরে গিয়েছে! আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, "নিতু, আমি বাঁশবেড়ে যাচ্ছি গঙ্গা নাইতে। আমায় বড় কষ্ট দিয়েছে হরিবল্লভ (আমার জ্যাঠামশাই), আমি বলে যাচ্ছি, নির্ব্বংশ হবে নির্ব্বংশ হবে। তোমরা বাড়ি গিয়ে শোওগে যাও।"

আমাঁর গা শিউরে উঠলো—এত স্পষ্ট কথাগুলো কানে গেল, এত স্পষ্ট হীরুজ্যাঠাকে দেখলাম যে বুঝে উঠতে পারলাম না প্রত্যক্ষ দেখছি, না স্বপ্ন দেখছি। ঘুম কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল, দাদা দেখি তখনও কুঁক্‌ড়ি হয়ে শীতে ঘুমুচ্ছে, কাঁটালপাতার আগুন নিবে জল হ'য়ে গিয়েছে, হীরুজ্যাঠাও ঘুমুচ্ছে মনে হ'ল। বাইরে দেখি ভোর হ'য়ে গিয়েছে!

দাদাকে উঠিয়ে নলিনীদিদির বাবা রামগতি মুখুজ্জেকে ডাকিয়ে আন্‌লাম। তিনি এসে দেখেই বললেন, "ও তো শেষ হ'য়ে গিয়েছে। কতক্ষণ হ'ল ? তোরা কি রাত্রে ছিলি না-কি এখানে ?"

হীরুঠাকুরের মৃত্যুতে চোখের জল এক দাদা ছাড়া বোধ হয় আর কেউ ফেলেনি।

অনেকদিন পরে শুনেছিলাম, হীরুঠাকুর পৈতৃক কি জমিজমা ও দুখানা আমকাঁটালের বাগান বন্ধক রেখে জ্যাঠামশায়ের কাছে কিছু টাকা ধার করে এবং শেষ পর্য্যন্ত হীরুঠাকুর সে টাকা শোধ না করার দরুণ জ্যাঠামশায় নালিশ ক'রে নীলামে সব বন্ধকী বিষয় নিজেই কিনে রাখেন। এর পর হীরুঠাকুর আপোষে কিছু টাকা দিয়ে সম্পত্তিটা ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল—জ্যাঠামশায় রাজী হননি। কেবল বলেছিলেন ব্রাহ্মণের ভিটে আমি চাইনে—ওটা তোমায় ফিরিয়ে দিলাম। হীরু তা নেয়নি, বলেছিল, সব যে-পথে গিয়েছে, ও ভিটেও সে পথে যাক্। এর কিছুকাল পরেই তার মাথা খারাপ হ'য়ে যায়।

বিষয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের দানধ্যান ধর্ম্মানুষ্ঠানও বেড়ে চলেছিল। প্রতি পূর্ণিমায় তাঁদের ঘরে সত্যনারায়ণের পূজা হয় যে তা নয় শুধু—একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিতেন বই কেন্‌বার জন্যে; শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে নৌকো আসে নানা জিনিষপত্রে বোঝাই হ'য়ে—বছরের ধান, জালাভরা কইমাছ, বাজরাভরা হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড় আরও অনেক জিনিষ। প্রতি বছরই সেই নৌকায় দুটি একটি হরিণ আসে। ধনধান্যপূর্ণ ডিঙা নিরাপদে দেশে পৌছেছে এবং তার জিনিষপত্র নির্ব্বিঘ্নে ভাঁড়ার-ঘরে উঠল এই আনন্দে তারা প্রতিবার শ্রাবণ মাসে পাঁঠা বলি দিয়ে মনসা-পূজো করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণ খাওয়াতেন। বৈশাখ মাসে গৃহদেবতা মদনমোহনের পূজোর পালা পড়ল ওঁদের। জ্যাঠামশায় গরদের জোড়

প'রে লোকজন ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে কাঁসরঘণ্টা, ঢাকঢোল বাজিয়ে ঠাকুর নিয়ে এলেন ও-পাড়ার জ্ঞাতিদের বাড়ি থেকে—জ্যাঠাইমা খুড়ীমারা বাড়ির দোরে দাঁড়িয়েছিলেন—প্রকাণ্ড পেতলের সিংহাসনে বসানো শালগ্রাম বয়ে আনছিলেন জ্যাঠামশায় নিজে—[illegible] বাড়ী ঢুকবার সময়ে জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে দিতে ঠাকুর অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেলেন। মেয়েরা শাঁখ বাজাতে লাগলেন, উলু দিলেন। আমি, সীতা ও দাদা আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে দেখছিলাম--অত্যন্ত কৌতূহল হলেও কাছে যেতে সাহস হ'ল না। মাকে মেমে পড়াত সে-কথা ওঁদের কানে যাওয়া থেকে মানুষের ধারা থেকে আমরা নেমে গিয়েছি ওদের চোখে—আমরা খৃষ্টান, আমরা নাস্তিক, পাহাড়ী জানোয়ার--ঠাকুরঘরে ঢুকবার যোগ্য নই। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন কত কি খাবার তৈরি হ'তে লাগল ঠাকুরের ভোগের জন্যে—ওঁরা পাড়ার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ ক'রে প্রায়ই খাওয়াতেন, রাত্রে শীতলের লুচি ও ফলমিষ্টান্ন পাড়ার ছেলে মেয়েদের ডেকে দিতে দেখেছি তবুও সীতার হাতে একখানা চন্দ্রপুলি ভেঙে আধখানিও কোন দিন দেননি।

জ্যাঠাইমা এ সংসারের কর্ত্রী, কারণ জ্যাঠামশাই রোজগার করেন বেশী। ফরসা মোটাসোটা, একগা গহনা, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—এই হলেন জ্যাঠাইমা। এ-বাড়ীতে নববধূরূপে তিনি আসবার পর থেকেই সংসারের অবস্থা ফিরে যায়, তার আগে এঁদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—তাই তিনি নিজেকে ভাবেন ভাগ্যবতী। এ-বাড়ীতে তাঁর উপর কথা বলবার ক্ষমতা নেই কারও। তাঁর বিনা হুকুমে কোন কাজ হয় না। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে এত আম বাড়িতে, বৌদের নিয়ে খাবার ক্ষমতা নেই, যখন বলবেন খাওগে, তখন খেতে পাবে। জ্যাঠামশায়ের বড় ও মেজ ছেলে, শীতলদা ও সলিলদার বিয়ে হয়েছে, যদিও তাদের বয়েস খুব বেশী নয় এবং তাদের বৌয়েদের বয়েস আরও কম—দুই ছেলের এই

দুই বৌ ও বাড়িতে গলগ্রহ হ'য়ে আছে এক ভাগ্নেবৌ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে, আর আমার মা আমাদের নিয়ে—এ ছাড়া ভুবনের মা আছে, কাকীমারা আছেন—এর মধ্যে এক ছোটকাকীমা বাদে আর সব জ্যাঠাইমার সেবাদাসী। ছোটকাকীমা বাদে এইজন্যে যে তিনি বড়মানুষের মেয়ে—তাঁর উপর জ্যাঠাইমার প্রভুত্ব বেশী খাটে না।

প্রতিদিন খাওয়ার সময় কি নির্লজ্জ কাণ্ডটাই হয়! রোজ রোজ দেখে স'য়ে গিয়েছে যদিও, তবুও এখনও চোখে কেমন ঠেকে। রান্নাঘরে একসঙ্গে ভাগ্নে, জামাই, ছেলেরা খেতে বসে। ছেলেদের পাতে, জামাইয়ের পাতে বড় বড় জামবাটিতে ঘন দুধ, ভাগ্নেদের পাতে হাতা ক'রে দুধ। মেয়েদের খাবার সময় সীতা, ভাগ্নেবৌ এরা সবাই কলায়ের ডাল মেখে ভাত খেয়ে উঠে গেল—নিজেদের দল, দুই বৌ, মেয়ে নলিনীদি, নিজের জন্যে বাটীতে বাটীতে দুধ আম বাতাসা। নলিনীদি আবার মধু দিয়ে আমদুধ খেতে ভালবাসে—মধুর অভাব নেই, জ্যাঠামশাই প্রতি বৎসর আবাদ থেকে ছোট জালার একজালা মধু নিয়ে আসেন—নলিনীদি দুধ দিয়ে ভাত মেখেই বলবে মা আমায় একটু মধু দিতে বলো না সতুর মাকে? কালেভদ্রে হয়ত জ্যাঠাইমার দয়া হ'ল—তিনি সীতার পাতে দুটো আম দিতে বললেন কি এক হাতা দুধ দিতে বললেন—নয়তো ওরা ওই কলায়ের ডাল মেখে খেলেই উঠে গেল। সীতা সে-রকম মেয়ে নয় যে মুখফুটে কোন দিন কিছু বলবে, কিন্তু সেও তো ছেলেমানুষ, তারও তো খাবার ইচ্ছে হয়? আমি এই কথা বলি, যদি খাবার জিনিষের বেলায় কাউকে দেবে, কাউকে বঞ্চিত করবে, তবে একসঙ্গে সকলকে খেতে না বসালেই তো সবচেয়ে ভাল?

একদিন কেবল সীতা বলেছিল আমার কাছে,—দাদা, জ্যাঠাইমারা কি রকম লোক বল দিকি? মা ভাল ভাল বাটনা বাটবে, বাসন মাজবে রাজ্যির বাসি কাপড় কাচবে, কিন্তু এত ডাবের ছড়াছড়ি এ-বাড়িতে,

গাছেরই তো ডাব, একাদশীর পরদিন মাকে কোনো দিন বলেও না যে একটা ডাব নিয়ে যাও।

আমি মুখে মুখে বানিয়ে কথা বলতে ভালবাসি। আপন মনে কখনও বাড়ির কর্ত্তার মত কথা বলি, কখনও চাকরের মত কথা বলি। সীতাকে কত শুনিয়েছি, একদিন মাকেও শুনিয়েছিলাম। এক দিন ও-পাড়ার মুখুজ্জে-বাড়িতে বীরুর মা, কাকীমা, দিদি এরা সব ধ'রে পড়ল আমাকে বানিয়ে বানিয়ে কিছু বল্‌তে হবে।

ওদের রান্না-বাড়ির উঠোনে, মেয়েরা সব রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা ভাবলাম কি বল্‌ব? সেখানে একটা বাঁশের ঘেরা পাচিলের গায়ে ঠেসান ছিল। সেইটের দিকে চেয়ে আমার মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। এই বাঁশের ঘেরাটা হবে যেন আমার স্ত্রী, আমি যেন চাকরী করে বাড়ি আসছি, হাতে অনেক জিনিষপত্র। ঘরে যেন সবে ঢুকেছি, এমন ভাব ক'রে বললাম—"ওগো কই, কোথায় গেলে, ফুলকপিগুলো নামিয়ে নাও না? ছেলেটার জ্বর আজ কেমন আছে?" মেয়েরা সব হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল।

আমার উৎসাহ গেল আরও বেড়ে। আমি বিরক্তির সুরে বললাম "আঃ, ঐ তো তোমার দোষ! কুইনিন্ দেওয়া আজ খুব উচিত ছিল। তোমার দোষেই ওর অসুখ যাচ্ছে না। খেতে দিয়েছ কি?"

আমার স্ত্রী অপ্রতিভ হ'য়ে খুব নরম সুরে কি একটা জবাব দিতেই রাগ পড়ে গেল আমার। বললাম—"ওই পুঁটুলিটা খোলো, তোমার একজোড়া কাপড় আছে আর একটা তরল আলতা—" মেয়েরা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। বীরুর ছোটবৌদিদি মুখে কাপড় গুঁজে

হাসতে লাগলো! আমি বললাম—"ইয়ে করো, আগে হাত-পা ধোয়ার জল দিয়ে একটু চায়ের জল চড়াও দিকি? সেই কখন ট্রেনে উঠেচি—ঝাঁকুনির চোটে আর এই দু-কোশ হেঁটে খিদে পেয়ে গিয়েছে—আর এই সঙ্গে একটু হালুয়া—কাগজের ঠোঙা খুলে দেখ কিসমিস এনেচি কিনে, বেশ ভাল কাবুলী—"

বীরুর কাকীমা তো ডাক ছেড়ে হেসে উঠলেন। বীরুর মা বললেন—"ছোঁড়া পাগল! কেমন সব বলচে দেখ, মাগো মা উঃ—আর হেসে পারিনে!

বীরুর ছোটবৌদিদির দম বন্ধ হ'য়ে যাবে বোধ হয় হাসতে হাসতে। বললে—"উঃ মা আমি যাব কোথায়! ওর মনে মনে ওই সব সখ আছে, ওর ইচ্ছে ওর বিয়ে হয়, বৌ নিয়ে অম্‌নি সংসার করে—উঃ মারে!"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। আমি রান্নাঘরে বসে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করচি। রান্না এখনও শেষ হয় নি। আমি বললাম—"চিংড়ি মাছটা কেমন দেখলে, খুব পচেনি তো? কালিয়াটায় ঝাল একটু বেশী ক'রে দিও।"

বীরুর কাকীমা বললেন, "হ্যাঁরে তুই কি কেবল খাওয়া দাওয়ার কথা বলবি বৌয়ের সঙ্গে?" কিন্তু আর কি ধরনের কথা বলব খুঁজে পাইনে। ভাবলাম খানিকক্ষণ, আর কি কথা বলা উচিত? আমি এই ধরনের কথাই সকলকে বলতে শুনেছি স্ত্রীর কাছে। ভেবে ভেবে বললাম, খুকীর জন্যে জামাটা আনবো, কাল ওর গায়ের মাপ দিও তো? আর জিগ্যেস ক'রো কি রং ওর পছন্দ—না, না—এখন আর ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞেস্ করবার দর্‌কার নেই, ছেলেমানুষ ঘুমুচ্ছে, থাক্। কাল সকালেই—খুব গম্ভীর মুখে এ-কথা বলতেই মেয়েরা আবার হেসে উঠল দেখে আমি ভারি খুশী হ'য়ে উঠলাম। আরও বাহাদুরী নেবার ইচ্ছায় উৎসাহের সুরে বললাম—"আমি নেপালী নাচ জানি—চা-বাগানে

থাকতে আমি দেখে দেখে শিখেছি।" মেয়েরা সবাই বলে উঠলো, "তাও জানিস নাকি? বারে! তা তো তুই বলিসনি কোনো দিন? দেখি—দেখি—"

"কিন্তু আর একজন লোক দরকার যে? আমার সঙ্গে আর কে আসবে? সীতা থাকলে ভাল হ'ত। সেও জানে। আপনাদের বীণা কোথায় গেল? সে হলেও হয়।"

এ-কথায় মেয়েরা কেন যে এত হেসে উঠল হঠাৎ, তা আমি বুঝতে পারলাম না। বীণা বীরুর মেজবোন, আমার চেয়ে কিছু ছোট, দেখতে বেশ ভাল। সে ওখানে ছিল না তখন—একা একা নেপালী নাচ হয় না বলে বেশী বাহাদুরীটা আমার আর নেওয়া হয়নি সে-দিন।

সীতার বই পড়ার ব্যাপার নিয়ে জ্যাঠাইমা সকল সময় সীতাকে মুখ নাড়া দেন। সীতা যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে ভালবাসে এটাও জ্যাঠাইমা বা কাকীমারা দেখতে পারেন না। সীতা চিরকাল ওই রকম থেকে এসেছে চা-বাগানে একটি মাত্র মেয়ে, মা তাকে সব সময় সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখতে ভালবাসতেন, কতকটা আবার গড়ে উঠেছিল মিস নর্টনের দরুন। মিস নর্টন মাকে পড়াতে এসে নিজের হাতে সীতার চুল আঁচড়ে দিত, চুলে লাল ফিতে বেঁধে দিত, হাত ও মুখ পরিষ্কার রাখতে শেখাত। এখানে এসে সীতার দুখানার বেশী তিন-খানা কাপড় জোটেনি কোন সময়—জামা তো নেই-ই। (জ্যাঠাইমা বলেন, মেয়েমানুষের আবার জামা গায়ে কিসের?) কিন্তু ওরই মধ্যে সীতা ফরসা কাপড় খানি প'রে থাকে, চুলটি টান টান করে বেঁধে পেছনে গোল খোঁপা বেঁধে বেড়ায়, কপালে টিপ প'রে—এ-গাঁয়ের এক পাল অসভ্য অপরিষ্কার-ছেলেমেয়ের মধ্যে ওকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের দেখায়, যে-কেউ দেখলেই বলতে পারে ও এ-গাঁয়ের নয়, এ অঞ্চলের না—ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

দুটো জিনিষ সীতা খুব ভালবাসে ছেলেবেলা থেকে—সাবান আর বই। আর এখানে এসে পর্য্যন্ত ঠিক ওই দুটো জিনিষই মেলে না—এ-বাড়িতে সাবান কেউ ব্যবহার করে না, কাকীমাদের বাক্সে সাবান হয়ত আছে, কিন্তু সে বাক্স-সাজানো হিসাবে আছে, যেমন তাঁদের বাক্সে কাঁচের পুতুল আছে, চীনেমাটির হরিণ, খোকা পুতুল, উট আছে—তেম্‌নি। তবুও সাবান বরং খুঁজলে মেলে বাড়িতে—কেউ ব্যবহার করুক আর নাই করুক—বই কিন্তু খুঁজলেও মেলে না—দুখানা বই ছাড়া—নতুন পাজি আর সত্যনারায়ণের পুঁথি। আমরা তো চা-বাগানে থাক্‌তাম, সে তো বাংলা দেশেই নয়—তবুও আমাদের বাক্সে অনেক বাংলা বই ছিল। নানা-রকমের ছবিওয়ালা বাংলা বই—যীশুর গল্প, পরিত্রাণের কথা, জবের গল্প, সুবর্ণবণিক পুত্রের কাহিনী—আরও কত কি। এর মধ্যে মিশনরী মেয়েরা অনেক দিয়েছিল, আবার বাবাও কল্‌কাতা থেকে ডাকে আনাতেন—সীতার জন্যে এনে দিয়েছিলেন কঙ্কাবতী, হাতেমতাই, হিতোপদেশের গল্প, আমার জন্যে একখানা 'ভুগোল-পরিচয়' ব'লে বই, আর একখানা 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। আমি গল্পের বই পড়তে তত ভালবাসিনে, দু-তিনটে গল্প পড়ে আমার বইখানা আমি সীতাকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার ভাল লাগে যিশুখৃষ্টের কথা পড়তে। পর্ব্বতে যিশুর উপদেশ, যিশুর পুনরুত্থান, অপব্যয়ী পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তন—এ-সব আমার বেশ লাগে। এখানে ও-সব বই পাওয়া যায় না ব'লে পড়িনে। যিশুর কথা এখানে কেউ বলেও না। একখানা খৃষ্টের রঙীন ছবি আমার কাছে আছে—মিস্ নর্টন দিয়েছিল—সেখানা আমার বড় প্রিয়। মাঝে মাঝে বার ক'রে দেখি।

হিন্দুদেবতার কোনো মূর্ত্তি আমি দেখিনি, জ্যাঠামশায়েরা বাড়িতে যা পুজো করেন, তা গোলমত পাথরের নুড়ি। এ-গ্রামে দুর্গাপূজা হয়

না, ছবিতে দুর্গামূর্ত্তি দেখেছি, ভাল বুঝতে পারিনে, কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েছে মধ্যে। চৌধুরীপাড়ার বড় পুকুর ধারের পাকুড়গাছের তলায় কালো পাথরের একটা দেবমূর্ত্তি গাছের গুঁড়িতে ঠেসানো আছে—আমি এক দিন দুপুরে একলা পাকুড়তলা দিয়ে যাচ্ছি, বাবা তখন বেঁচে আছেন কিন্তু তাঁর খুব অসুখ—ওই সময় মূর্ত্তিটা আমি প্রথম দেখি—জায়গাটা নির্জ্জন, পাকুড়গাছের ডালপালার পিছনে অনেকখানি নীল আকাশ, মেঘের একটা পাহাড় দেখাচ্ছে ঠিক যেন বরফে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা—একটা হাতভাঙ্গা যদিও কিন্তু কি সুন্দর যে মুখ মূর্ত্তিটার, কি অপূর্ব্ব গড়ন—আমার হঠাৎ মনে হ'ল ওই পাথরের মূর্ত্তির পবিত্র মুখের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ যিশুখৃষ্টের মুখের মিল আছে—কেউ ছিল না তাই দেখেনি—আমার চোখে জল এল, আমি একদৃষ্টিতে মূর্ত্তিটার মুখের দিকে চেয়েই আছি—ভাবলাম জ্যাঠামশায়রা পাথরের নুড়ি পূজো করে কেন, এমন সুন্দর মূর্ত্তির দেবতা কেন নিয়ে গিয়ে পূজো করে না? তার পরে শুনেছি ঐ দীঘি খুঁড়বার সময়ে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগে মূর্ত্তিটা হাত-ভাঙা অবস্থাতেই মাটির তলায় পাওয়া যায়—সীতাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলাম একবার—একবার সীতা জবা, আকন্দ, ঝুমকো ফুলের একছড়া মালা গেঁথে মূর্ত্তির গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। অমন সুন্দর দেবতাকে আজ পঁচিশ বছর অনাদরে গ্রামের বাইরের পুকুরপাড়ে অমন ক'রে কেন যে ফেলে রেখে দিয়েচে এরা!

একবার একখানা বই পড়লাম—বইখানার নাম চৈতন্যচরিতামৃত এক জায়গায় একটি কথা প'ড়ে আমার ভারি আনন্দ হ'ল। চৈতন্যদেব ছেলেবেলায় একবার আস্তাকুঁড়ে এঁটো হাঁড়িকুড়ি যেখানে ফেলে, সেখানে গিয়েছিলেন ব'লে তাঁর মা শচীদেবী খুব বকেন। চৈতন্যদেব বললেন—মা, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঈশ্বর আছেন, এই আস্তাকুঁড়েও আছেন। ঈশ্বর যেখানে আছেন, সে-জায়গা অপবিত্র হবে কি ক'রে?

ভাবলাম জ্যাঠাইমাদের বিরুদ্ধে চমৎকার যুক্তি পেয়েছি ওঁদের ধর্ম্মের বইয়ে, চৈতন্যদেব অবতার, তাঁরই মুখে। জ্যাঠাইমাকে একদিন বললাম কথাটা। বললাম—জ্যাঠাইমা, আপনি যে বাড়ির পিছনে বাঁশবনে গেলে কি শেওড়া গাছে কাপড় ঠেকলে হাত-পা না ধুয়ে, কাপড় না ছেড়ে ঘরে ঢুকতে দেন না, চৈতন্যচরিতামৃতে কি লিখেছে জানেন?

চৈতন্যদেবের সে-কথাটা বলবার সময়ে আনন্দে মন আমার ভ'রে উঠল—এমন নতুন কথা, এত সুন্দর কথা আমি কখনও শুনিনি। ভাবলাম জ্যাঠাইমা বই পড়েন না ব'লে এত সুন্দর কথা যে ওঁদের ধর্ম্মের বইয়ে আছে তা জানেন না—আমার মুখে শুনে জেনে নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝে খুব অপ্রতিভ হ'য়ে যাবেন।

জ্যাঠাইমা বললেন—তোমাকে আর আমায় শেখাতে হবে না। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, উনি এসেচেন আজ আমায় শাস্তর শেখাতে। হিঁদুর আচার-ব্যাভার তোরা জান্‌বি কোত্থেকে রে ডেঁপো ছোঁড়া। তুই তো তুই, তোর মা বড় জানে, তোর বাবা বড় জান্‌তো—

আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা এমন সুন্দর কথা শুনে চট্‌লেন কেন? তা ছাড়া আমি নিজে বানিয়ে কিছু বল্‌ছি কি?

আগ্রহের সুরে বললাম—আমার কথা নয় জ্যাঠাইমা, চৈতন্যদেব বলেছিলেন তাঁর মা শচীদেবীকে—চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে—দেখাবো বইখানা?

—খুব তক্কোবাজ হয়েচ, থাক্। আর বই দেখাতে হবে না। তোমার কাছে আমি গুরুমন্তর নিতে যাচ্ছিনে—এখন যাও আমার সামনে থেকে, আমার কাজ আছে—তোমার তক্কো শুন্‌বার সময় নেই।

বা রে, তর্কবাজির কি হ'ল এতে? মনে কষ্ট হ'ল আমার। সেই থেকে জ্যাঠাইমাকে আর কোন কথা বলিনি।

সীতা ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ক'রে বস্‌ল। জ্যাঠামশাইদের বাড়ীর পাশে যদু অধিকারীর বাড়ি। তারা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাদের বাড়িতে যদু অধিকারীর বড় মেয়েকে বিয়ের জন্য দেখতে এল চার-পাঁচ জন ভদ্রলোক কলকাতা থেকে। সীতা সে-সময় সেখানে উপস্থিত ছিল।

যদু অধিকারীর বাড়ির মেয়েরা তাকে নাকি জিগ্যেস করেছে—শোন্ সীতা, আচ্ছা উমার যদি বিয়ে না হয় ওখানে তোর বিয়ে দিয়ে যদি দি, তোর পছন্দ হয় কা'কে বলত?

সীতা বুঝতে পারেনি যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করচে—বলেচে না-কি চোখে চশমা কে একজন এসেছিল তাকে।

ওরা সে কথা নিয়ে হাসাহাসি করেচে। জ্যাঠাইমার কানেও গিয়েছে কথাটা। জ্যাঠাইমা ও সেজকাকীমা মিলে সীতাকে বেহায়া, বোকা বদ্‌মাইস্ জ্যাঠা মেয়ে, যা তা ব'লে গালাগালি আরম্ভ করলেন। আরও এমন কথা সব বললেন যা ওদের মুখ দিয়ে বেরুলো কি ক'রে আমি বুঝতে পারিনে। আমি সীতাকে বক্‌লাম, মাও বক্‌লেন—তুই যাস্ কেন যেখানে সেখানে, আর না বুঝে যা তা কথা বলিস্ই বা কেন? এ-সব জায়গার ধরন তুই কি বুঝিস্?

সীতার চোখ ছল্‌ছল্ ক'রে উঠ্‌ল। সে অতশত বোঝেনি, কে জানে ওরা আবার এখানে বলে দেবে! সে মনে যা এসেচে, মুখে সত্যি কথাই বলেচে। এ নিয়ে এত কথা উঠবে তা বুঝতেই পারেনি।

৫

পৌষ মাসের শেষে আমাদের বাড়ি সরগরম হয়ে উঠ্‌ল—শুন্‌লাম ওদের গুরুদেব আসবেন ব'লে চিঠি লিখেচেন।

এই গুরুদেবের কথা আমি এঁদের বাড়িতে এর আগে অনেক শুনেচি—জ্যাঠামশায়দের ঘরে তাঁর একটা বড় বাঁধানো ফটোগ্রাফ দেখেছিলাম—গুরুদেব চেয়ারে বসে আছেন, জ্যাঠামশায় ও জ্যাঠাইমা দু-জন দু-দিকে মাটিতে ব'সে তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্চেন। অনেক দিন থেকে ছবিখানা দেখে গুরুদেব সম্বন্ধে আমার মনে একটা কৌতূহল হয়েছিল—কি রকম লোক একবার দেখবার বড় ইচ্ছে হ'ত।

ষ্টেশনে তাঁকে আনতে লোক গিয়েছিল—একটু বেলা হ'লে দেখি দাদা এক ভারী মোট বয়ে আগে আগে আসচে—পেছনে ব্যাগ-হাতে জ্যাঠামশায়দের কৃষাণ নিমু গোয়ালা। গুরুদেব হেঁটে আসচেন, রং কালো, মাথার সাম্‌নের দিকে টাক—গায়ে চাদর, পায়ে চটি। আমার জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোনেরা দরজার কাছে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল—পায়ের ধূলো নেওয়ার জন্যে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমি এগিয়েও গেলাম না, পায়ের ধূলোও নিলাম না। জ্যাঠাইমা গুরুদেবের পা নিজের হাতে ধুইয়ে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন, খুড়ীমা'রা বাতাস করতে লাগলেন—ছেলে-মেয়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, তিনি সেজখুড়ীমাকে জিগ্যেস্ করলেন—বৌমা তোমার ছেলের তোতলামিটা সেরেচে? মেজখুড়ীমাকে বললেন—গোষ্ঠ (মেজ-কাকার নাম) আজকাল কি বাদার কাছারী থেকে গরমের সময় একদম আসে না?...কতদিন আগে এসেছিল বল্‌লে? বাড়ীর ছেলেমেয়েদের

একে ওকে, ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন—দু-একটা কথা জিগ্যেসও করলেন—কিন্তু দাদা যে অত বড় ভারী মোট বয়ে আন্‌লে ষ্টেশন থেকে সে-ও সেখানেই দাঁড়িয়ে—তাকে একটা মিষ্টি কথাও বললেন না। আমার রাগ হ'ল, তিনি কি ভেবেচেন দাদা বাড়ির চাকর? তাও ভাবা অসম্ভব এইজন্যে যে, ওখানে যতগুলো ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় ক'রে আছে, তাদের মধ্যে দাদার রূপ সকলের আগে চোখ্‌কে আকৃষ্ট করে—এ গাঁয়ে দাদার মত রূপবান বালক নেই, শুধু এ বাড়ি তো দূরের কথা। আশা করে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভাল কথাও তো বলতে হয় তার সঙ্গে?

গুরুদেবের জন্যে বিকেলে বাড়িতে কত কি খাবার তৈরি হ'ল—মেজখুড়ীমা, সতুরমা, জ্যাঠাইমা—সবাই মিলে ক্ষীরের, নারকোলের, ছানার কি সব গড়লেন। মাকে এ-সব কাজে ডাক পড়ে না, কিন্তু দেখে একটু অবাক হ'লাম সতুর মাকে ওঁরা এতে ডেকেচেন। মা আর সতুর মার ওপর যত উঞ্ছ কাজের ভার এ বাড়ির। সতুর মা'র অদৃষ্ট ভাল হয়েচে দেখচি।

গুরুদেব সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে বাইরে এলে তাঁকে যখন খাবার দেওয়া হ'ল তখন সেখানে বাড়ির ছেলেমেয়ে সবাই ছিল—আমরাও ছিলাম। কিন্তু হিরণ দিদি ও সেজকাকীমা সকলকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। গুরুদেব বললেন—কেন ওদের যেতে বলচ বৌমা, থাক্ না, ছেলেপিলেরা গোলমাল করেই থাকে—

গুরুদেব তিন-চার দিন রইলেন। তাঁর জন্যে সকালে বিকালে নিত্য-নতুন কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাই যে হ'ল! পিঠে, পায়েস, সন্দেশ, ছানার পায়েস, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, লুচি—তিনি তো অত খেতে পারতেন না—আমরা বাদে বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা তাঁর পাতের প্রসাদ খেত। তিনি জলখাবার খেয়ে উঠলে তাঁর রেকাবীতে বা

থালায় যা পড়ে থাকৃত, কাকীমারা ডেকে ছেলেমেয়েদের দিতেন—আমরা সে সময় সেখানে থাকতাম না—কারণ প্রথম দিকে ছেলেমেয়েরা সেখানে থাক্‌লে কাকীমা বকতেন—তারপর গুরুদেবের খাওয়া হ'য়ে গেলে যখন তাদের ডাক পড়ত, তখন বাড়ির ছেলেরা কাছে কাছেই থাক্‌তো ব'লে তারাই যেত—আমি কারুর পাতের জিনিষ খেতে পারিনে, এইজন্য আমি যেতাম না। ওঁরা ডেকেও কোনো খাবার জিনিষ আমাদের কোনো দিন দিলেন না—কিন্তু মনে মনে আমি হতাশ হলাম—আমি একেবারে যে আশা করিনি তা নয়, ভেবেছিলাম গুরুদেব এলে আমরা সবাই ভাল খাওয়ার ভাগ পাব কিছু কিছু।

সন্ধ্যাবেলা। বেশ শীত পড়েচে। গুরুদেব আমলকীতলায় কাঠের জলচৌকীতে কম্বল পেতে বসে আছেন। গায়ে সবুজ পাড় বসানো বালাপোষ—ছেলেমেয়েরা সবাই ঘিরে আছে, যেমন সর্ব্বদাই থাকে; একটু পরে জ্যাঠাইমা, মেজকাকীমা, সতুর মা, হিরণ দিদি এলেন।

গুরুদেবের খুব কাছে আমি কোনো দিন যাই নি—আমি গোয়াল-ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, ছেলেমেয়েরা গল্প শুনচে গুরুদেবের কাছে, আমার কিন্তু গল্পের দিকে মন নেই, আমার জানবার জন্যে ভয়ানক কৌতূহল যে গুরুদেব কি ধরণের লোক, তাঁকে অত খাতির, যত্ন, আদর এরা কেন করে, তাঁর পায়ে জ্যাঠাইমা ও জ্যাঠামশায় পুষ্পাঞ্জলি দেনই বা কেন, তাঁর ফটো বাঁধিয়েই বা ঘরে রাখা আছে কেন? এ সবের দরুণ গুরুদেব সম্বন্ধে আমার মনে এমন একটা অদ্ভুত আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মে গিয়েচে, যে, তিনি যেখানেই থাকুন, আমি কাছে কাছে আছি সর্ব্বদাই—অথচ খুব নিকটে যাইনে!

গুরুদেব মুখে মুখে ধর্ম্মের কথা বলতে লাগলেন। আমি আর একটু এগিয়ে গেলাম ভাল ক'রে শোনবার জন্যে। এ-সব কথা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।

একবার কি একটা যোগ উপস্থিত—গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য, সকল পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে, স্নান করলেই মুক্তি। পার্ব্বতী শিবকে বললেন—আচ্ছা প্রভু, আজ এই যে লক্ষ লক্ষ লোক কাশীতে স্নান করবে, সকলেই মুক্তি পাবে? শিব বললেন, তা নয় পার্ব্বতী। চলো তোমায় দেখাব।

দু-জনে কাশীতে এলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে। শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শব সেজে ঘাটের ধারে পড়ে রইলেন। পার্ব্বতী তাঁর স্ত্রী সেজে পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন। যারা এল, তাদের বললেন—আমার বৃদ্ধ স্বামী মারা গিয়েচেন, এঁর সৎকার করার ব্যবস্থা আপনারা করুন। কিন্তু একটা মুস্কিল আছে, শব যিনি স্পর্শ করবেন, তাঁর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া চাই, নইলে শব-স্পর্শেই মৃত্যু ঘটবে।

এ-কথা শুনে সাহস ক'রে কেউ এগোয় না। সবাই ভাবে পাপ তো কতই করেচি। প্রাণ দিতে যাবে কে? সারাদিন কাটলো। সন্ধ্যা নামে-নামে। একজন চণ্ডাল ঘাটের ধারে অশ্রুমুখী ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখে কি হয়েচে জিজ্ঞাসা করলে। পার্ব্বতী সকলকে যা ... এসেচেন, তাকেও তাই বললেন। চণ্ডাল শুনে ভেবে বললে—তার জন্যে ভাবনা কি মা? আজ গঙ্গাস্নান করলে তো নিষ্পাপ হবই এত বড় যোগ যখন, এজন্ম তো দূরের কথা শত জন্মের পাপ ক্ষয় হ'য়ে যাবে পাঁজিতে লিখেচে। তা দাঁড়ান, আমি ডুবটা দিয়ে আসি এবং একটু পরে ডুব দিয়ে উঠে এসে বললে—মা ধরুন ওদিক, আমি পায়ের দিকটা ধরচি—চলুন নিয়ে যাই।

শিব নিজমূর্ত্তি ধারণ ক'রে চণ্ডালকে বর দিলেন। পার্ব্বতীকে বললেন—পার্ব্বতী, দেখলে? এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এই লোকটি মাত্র আজকার যোগের ফল লাভ করবে। মুক্তি যদি কেউ পায় এই চণ্ডালই পাবে।

গল্পটা আমার ভারি ভাল লাগলো। সে-দিনকার ...

পড়া সেই কথাটা মনে পড়ল—জ্যাঠাইমাকে বলেছিলাম, জ্যাঠাইমা বিশ্বাস করেন নি। ওঁদের শাস্ত্রের কথাতেই ওঁর বিশ্বাস নেই। অথচ মুখে হিঁদুয়ানি তো খুব দেখান? আর আমাকে, মাকে, সীতাকে, দাদাকে বলেন খিরিষ্টান।

আজকার গুরুদেবের এই গল্পটা কি জ্যাঠাইমা কাকীমারা বুঝতে পারলেন? চণ্ডালের ওপর আমার ভক্তি হ'ল। আমি যেন মনে মনে কাশী চলে গিয়েছি, আমি যেন মণিকর্ণিকার ঘাটে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী শিব ও ক্রন্দনরতা পার্ব্বতীকে প্রত্যক্ষ করেছি।

ও-বছর বড়দিনের সময় মিশনরী মেমেরা আমাদের রঙীন কার্ড দিয়েছিল, ছোট একখানা ছবিওয়ালা বই দিয়েছিল। তা'তে একটি কথা সোনার জলে বড় বড় ক'রে লেখা আছে মনে পড়ল—তাহারা ধন্য যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কারণ তাহারা জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে।

তার পরদিন সন্ধ্যাবেলাতেও গুরুদেব আমলকীতলায় আসন পেতে বসে গল্প বলছিলেন ছেলেমেয়েদের। একবার উঠে আহ্নিক করতে গেলেন আবার এসে বসলেন। মেয়েরাও এলেন।

কথা বল্‌তে বল্‌তে গুরুদেব হঠাৎ আমার দিকে আঙুল দিয়ে বললেন—ও ছেলেটি কে? রোজ দেখি দাঁড়িয়ে থাকে। এস, এস বাবা, এদিকে এস।

প্রথমটা আমার বড় লজ্জা হ'ল কিন্তু কেমন একটা আনন্দও হ'ল; একটু এগিয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা বললে—ও আমার এক খুড়তুতো দেওরের ছেলে। ওরা এখানে থাকতো না, চা-বাগানে ওর বাবা কাজ করতো! এখানে এসে অসুখ হয়ে মারা গেল; আর ত কেউ নেই, ওরা এ বাড়িতেই থাকে।

গুরুদেব বললেন—এস দেখি বাবা, হাতখানা দেখি সরে এস।

তারপর জ্যাঠাইমাদের দিকে চেয়ে বললেন—খুব লক্ষণযুক্ত ছেলে। এর বয়স কত?

আমায় লক্ষণযুক্ত বলাতে—বিশেষতঃ অত ছেলের মাঝ থেকে—জ্যাঠাইমা কাকীমারা নিশ্চয়ই খুব খুসী হন নি। জ্যাঠাইমা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন আমার বয়েস নাকি পনের বছর—আমি ওঁর ছেলে হাবুর চেয়েও দেড় বছরের বড়। আসলে আমার বয়েস তেরো—জ্যাঠাইমার বড় ছেলে হাবুকে আমরা হাবুদা ব'লে ডাকি, সে আমাদের সবার চেয়ে দু-বছরের বড়। স্কুলে তার যা বয়েস লেখানো আছে, তাই ধরে বল্‌চি।

তারপর গুরুদেব আমায় জিজ্ঞোস্ করলেন—কি পড় বাবা?

আমি কোন্ ক্লাসে পড়ি বললাম।

ধাতুরূপ কতদূর পড়েচ? লুঙ, লিট বোঝো? এই শোনো একটি শ্লোক—

সোঽধ্যৈষ্ট বেদাংস্ত্রিদশা ন যষ্ট
পিতৃনতার্প্সীৎ সমমংস্ত বন্ধুন্
ব্যজৈষ্ট ষড়বর্গমরংস্ত নীতৌ
সমূলঘাতং ন্যবধীদরীংশ্চ।

হেসে বললেন—কত রকম ধাতুর ব্যবহার দেখেচ? এ হ'ল ভট্টিকাব্যের শ্লোক—

আমার বেশ ভাল লাগলো, গুরুদেবকেও এবং তাঁর শ্লোককেও। আমি এর আগে সংস্কৃত শ্লোক বেশী শুনিনি। চা-বাগানে কেউ বল্‌তো না। শ্লোকটা আমি মুখস্ত ক'রে নিলাম।

একদিন তিনি বাড়ির পাশের মাঠে শুকনো পাতা দিয়ে আগুন জ্বেলেচেন। আমায় দেখে বললেন—এসো জিতু—

আমি বললাম— কি করছেন আগুন জেলে?

—তামাক পোড়াবো—

আমি বললাম, আমি পুড়িয়ে দিচ্ছি।

গুরুদেব অনেক সংস্কৃত শ্লোক আমাকে শোনালেন। কুবেরের শাপে এক যক্ষ গৃহ থেকে বহুদূরে কোন পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হয়েছিল, বাড়ির জন্যে ভেবে ভেবে তার হাতের সোনার বালা ঢল হ'য়ে গিয়েছিল, তারপর আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে সেই পাহাড়ের মাথায় বর্ষার নতুন কাল মেঘ নাম্‌ল এই রকম একটা শ্লোকের মানে। আমি তো সংস্কৃত পড়ি মোটে ঋজুপাঠ, কিন্তু আমাকেই তিনি আগ্রহের সঙ্গে এম্‌নি ভাল ভাল অনেক শ্লোক শোনাতে লাগলেন—যেন আমি কত বুঝি!

এবার মনে হ'ল আমার নিজের কথা যা কাউকে কখনও বলিনি এ-পর্য্যন্ত—তাঁর কাছে খুলে বলি, আমার মনের সন্দেহ, আমার ঐ সব অদ্ভুত জিনিষ-দেখার ব্যাপার, জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার নিয়ে আমার মত না মেলা,—সকলের ওপর ঠাকুরদেবতা সম্বন্ধে আমার অবিশ্বাস—এসব খুলে ব'লে তিনি কি বলেন শুনি। তাঁর ওপর এমন একটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হ'য়ে গেল আমার! যেন মনে হ'ল এঁর কাছে বললে ইনি সব বুঝিয়ে দিতে পারবেন আমাকে। এত বড় লোক ইনি, এত পণ্ডিত, কত কথা জানেন!

কিন্তু সুবিধে হ'ল না। বলি-বলি করেও বল্‌তে আমার কেমন লজ্জা হ'ল। তিন দিন এম্‌নি কেটে গেল, তারপর তিনি চ'লে গেলেন।

আমার কিন্তু বল্‌তে পারলেই ভাল হ'ত। একজন ভাল লোককে আমার সব কথা বলা দরকার। অথচ এখানে তেমন কোন লোককে আমি বিশ্বাস করিনে—কারও ওপর আমার ভক্তি হয় না।

আমি আজকাল নির্জ্জনে বসলেই অদ্ভুত জিনিষ সব দেখি। যখন তখন, তার সময় নেই, অসময় নেই, রাত নেই, দিন নেই। এই তো সেদিন বসে আছি জ্যাঠাইমাদের পুকুরধারের বাগানে একলাটি —

দেখি পুকুর-পাড়ের আমগাছগুলোর ওপরকার নীল আকাশে একটা মন্দিরের চুড়ো—প্রকাণ্ড মন্দির, রোদ লেগে ঝক্‌মক্ করচে—সোনা না, কি দিয়ে বাঁধানো যেন। মন্দিরের চারিপাশে বাগান, চমৎকার গাছপালা, ফুল ফুটে আছে, অপূর্ব্ব দেখতে—ঠিক যে আমাদের সোনাদা চা-বাগানের ধারে বনের গাছের ডালে ডালে ফোটা নীল আর্কিডের ফুল! আর একদিন দেখেছিলাম ঠিক ওই জায়গায় বসেই আকাশ বেয়ে সন্ধ্যার সময় তিনটী সুন্দরী মেয়ে, পরনে যেন শ্বেতচমরীর লোমে বোনা সাদা চক্‌চকে লুটিয়ে-পড়া কাপড়—তারা উড়ে যাচ্চে এক সারিতে, বোধ হয় পুরো পাঁচ মিনিট ধরে তাদের দেখেচি। তারপর রোদ চক্‌চক্ করতে লাগল, আর তাদের স্পষ্ট দেখা গেল না—ওপরের দিকে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল। এরকম নতুন নয়, কতবার দেখেচি, প্রায়ই দেখি, দু-পাঁচদিন অন্তর দেখি, দেখে দেখে আমার সয়ে গিয়েচে, আগের মত ভয় হয় না। কিন্তু এক-একবার ভাবি, এ আমার এক রকম রোগ—না, চোখ খারাপ হ'য়ে গিয়েচে, নাকি?

আমার কারু সঙ্গে মিশতে সাহস হয় না এই জন্যে যে, হয়ত কোন্ সময় আবার অন্য ভাব এসে যাবে, আর যে সঙ্গে থাকবে সে আমায় ভাববে পাগল। হয়ত হাসবে, হয়ত লোককে ব'লে দেবে। এমনিও এ-বাড়ীতে জ্যাঠাইমা, কাকীমা, কাকা, এঁরা আমায় পাগলই ভাবেন। কি করবো। আমি যা দেখি, ওঁরা তা দেখতে পান না, এই আমার অপরাধ। একটা উদাহরণ দি।

ফাল্গুন মাসে ছোটকাকার মেয়ে পানি অসুখে পড়ল। একদিন দু'দিন গেল, অসুখ আর সারে না। জ্বর লেগেই আছে। সাতদিন কেটে গেল—জ্বর একই ভাব। দশ দিনের দিন অসুখ এমনি বাড়ল, নৈহাটী থেকে বড় ডাক্তার আনবার কথা হ'ল।

পানীকে আমার এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাল লাগে! তার বয়স বছর সাত আট, ঝাঁক্ড়া ঝাঁক্ড়া চুল মাথায়, চোখ কটা, সাহেবদের ছেলেমেয়েদের মত। এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মুখে যেমন খারাপ কথা আর গালাগালি লেগেই আছে—পানীর কিন্তু তা নয়। তার একটা কারণ, সে এতদিন মামার বাড়ীতে তার দিদিমার কাছে ছিল, গঙ্গার ওপারে ভদ্রেশ্বর। সে বেশ মেয়ে, বেশ গান করতে পারে, প্রাণে তার দয়ামায়া আছে। পানীর অসুখ হ'য়ে পর্য্যন্ত আমার মন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল—আমার ইচ্ছা হয়েছিল ওর কাছে গিয়ে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে দি—কিন্তু কাকীমা তো আমায় বিছানা ছুঁতে দেবে না, সেই ভয়ে পারতাম না।

পানীর তখন সতেরো দিন জ্বর চলচে—বুড়ো গোবিন্দ ডাক্তার ঘোড়ার গাড়ী ক'রে ষ্টেশন থেকে এল—দালানে বসে মসলার কৌটো বার ক'রে মসলা খেলে, ভাজা মসলার গন্ধে দালান ভুরভুর করতে লাগল—চা ক'রে দেওয়া হ'ল, চা খেলে, তারপর ওষুধ লিখে দিয়ে ভিজিটের টাকা মেজকাকার হাত থেকে নিয়ে না-দেখেই পকেটে পুর্লে—তারপর রোগীকে বার-বার গরম জল খাওয়ানোর কথা ব'লে গাড়ী ক'রে চলে গেল!

একটু একটু অন্ধকার হয়েচে কিন্তু এখনও বাড়িতে সন্ধ্যার শাঁক বাজে নি, কি আলো জ্বালা হয় নি—হয়ত ডাক্তার আসবার জন্যে সকলে ব্যস্ত ছিল বলেই। আমি রোগীর ঘরে দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু পানীর বিছানায়—পানীর শিয়রে যে বসে আছে তাকে চিনতে পারলাম না। লালপাড় শাড়ী পরনে, আধঘোমটা দেওয়া কে একজন, জ্যাঠাইমার মত দেখতে বটে কিন্তু জ্যাঠাইমা তো নয়! ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই—এই মাত্র কাকীমা বাইরে গেছেন ডাক্তারে কি ব'লে গেল তাই জান্তে ছোটকাকার কাছে। আমি ভাবচি লোকটা কে,

এমন সময় তিনি মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন—জিতু, নির্ম্মলাকে বোলো পানীকে আমি নিয়ে যাব, আমি ওকে ফেলে থাকতে পারবো না—ও আমার কাছে ভাল থাকবে, নির্ম্মলা যেন দুঃখ না করে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—কে নির্ম্মলা আমি চিনি নে, যিনি বলচেন তিনিই বা কে, কোথা থেকে এসেচেন, কই এ বাড়িতে তো কোনোদিন দেখিনি তাঁকে, পানীকে তিনি এই অসুস্থ শরীরে কোথায় নিয়ে যাবেন, এসব কথা ভাববার আগেই ছোটকাকীমা ঘরে ঢুকলেন—কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিছানার পাশে যিনি বসে আছেন, ছোটকাকীমা যে তাঁকে দেখতে পাচ্চেন, এমন কোনো ভাব দেখলুম না।

বিছানায় যিনি বসে ছিলেন তিনি আমায় বললেন—জিতু, নির্ম্মলাকে বল এইবার—আমি চলে যাচ্ছি। আমি কিছু না ভেবে কলের পুতুলের মত চেয়ে বললাম—নির্ম্মলা কে?

ছোটকাকীমা আমার দিকে কটমট ক'রে চেয়ে বললেন,—কেন, সে খোঁজে কি দরকার? তিনি ভাবলেন আমি বুঝি তাঁকেই জিজ্ঞেস্ করচি। অন্ত মহিলাটি বিছানা থেকে নেমে ওদিকের দরজা দিয়ে বার হয়ে চ'লে গেলেন, যাবার সময় আমাকে বললেন—এই তো নির্ম্মলা ঘরে এসেচে।

আমি বললাম—আপনি কেন বলুন না নিজে?···

ততক্ষণ তিনি বার হয়ে চলে গিয়েছেন।

ছোটকাকীমা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন! বললেন—কি বকচিস পাগলের মত? ওদিকে চেয়ে কার সঙ্গে কথা বলচি? নির্ম্মলা কে সে খোঁজে তোমার কি দরকার শুনি?

জ্যাঠাইমা ঘরে ঢুকলেন সেই সময়ই। তিনি বললেন—কি হয়েচে, কি বলচে ও?

ছোট কাকীমা বললেন—আপন মনে কি বকচে ছাখো না দিদি—ও

এ ঘর থেকে চলে যাক। আমার ভয় করে, ও ছেলের মাথার ঠিক নেই—আমার নাম ক'রে কি বল্‌চে।

জ্যাঠাইমা বললেন—কি বলছিলি কাকীমার নাম ক'রে?

আমার বিস্ময় তখনো কাটেনি—আমি তখন কেমন হয়ে গিয়েচি। ছোটকাকীমার নাম যে নির্ম্মলা আমি তা কখনও শুনিনি—ঐ মেয়েটী যে চলে গেল, আমার সঙ্গে কথা বলে গেল—ছোটকাকীমা তাঁকে দেখতে পেলেন না, তাঁর কথাও শুন্‌তে পেলেন না এই বা কেমন! জ্যাঠাইমার কথার কোনো জবাব আমার মুখ দিয়ে বেরুলো না, আমার মাথা ঘুরে উঠল! তারপর কি যে ঘটল আমি তা জানি না।

জ্ঞান হ'লে দেখি মা আমার মাথা কোলে নিয়ে বসে কাঁদচেন। আমি দালানেই শুয়ে আছি। চারি পাশে বাড়ির অনেক মেয়ে জড় হয়েচে, সবাই বললে আমার মৃগীরোগ আছে। ভাবলাম হয়ত হবে, একেই বোধ হয় মৃগীরোগ বলে। আমার বড় ভয় হ'ল, বাবা মারা গিয়েচেন পাগল হয়ে, এ-বাড়ীর অনেকের মুখে শুনেছি আমারাও পাগল হ'তে পারি। তার মধ্যে আমার নাকি পাগলের লক্ষণ আছে অনেক।

সে-সন্ধ্যার কথা কখনও ভুলব না। জীবনে এত ভয় আমার কোনদিন হয় নি—এই ভেবে ভয় হল যে আমার সত্যিই কোনো কঠিন রোগ হয়েচে। কিন্তু কাউকে বল্‌বার উপায় নেই রোগটা কি। মৃগীরোগই হয়ত হয়েচে, নয় তো বাবার মত পাগলই হয়ে যাব হয়ত—না, কি হবে!

যে রাত্রে বাবা পাগল হয়ে গিয়ে বালিশের তুলো ছিঁড়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিলেন, কেরোসিনের টেমির মিটমিটে অস্পষ্ট আলোয় রাত-দুপুরে তাঁর সেই অদ্ভুত সারা গায়ে, মুখে, মাথায় তুলোমাখা মূর্ত্তি বারবার মনে আসতে লাগল—আমার মনে সে-রাত্রি, সে-মূর্ত্তি, চিরদিনের জন্য আঁকা হয়ে আছে। ঐ রকম কি আমারও হবে!

মাকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলাম সারারাত। মনে মনে কতবার আকুল আগ্রহে প্রার্থনা করলাম—প্রভু যীশু, তুমি দেবতা, তুমি আমার এ রোগ সরিয়ে দাও, আমায় পাগল হ'তে দিও না। আমায় বাঁচাও।

সকালে একটু বেলা উঠলে পানী মারা গেল।

জ্যাঠাইমা সকালে উঠে বৌদের কুটনো কুটবার উপদেশ দেবেন, কি কি রান্না হবে তা ঠিক ক'রে দেবেন—এ-বাড়ীতে ভাগ্নে-বৌ ছাড়া কেউ গাই দুইতে পারে না—এদিকের কাজ সেরে জ্যাঠাইমা তাকে সঙ্গে নিয়ে গোয়ালে নিজের চোখের সামনে দুধ দোয়াবেন—সীতা বলে, পাছে ভাগ্নে-বৌ নিজের ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু সরিয়ে রাখে বোধ হয় এই ভয়ে। তারপর তিনি স্নান ক'রে গরদের কাপড় প'রে ঠাকুরঘরে ঢুকবেন—সেখানে আহ্নিক চলবে বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত, সে-সময়ে ঠাকুরঘরের দোরে কারুর গিয়ে উঁকি দেবার পর্য্যন্ত হুকুম নেই। সবাই বলে জ্যাঠাইমা বড় পুণ্যবতী। পুণ্যবতীই তো! একদিন যে-ছবি দেখেছিলাম, ভুলিনি কোনোদিন। জ্যাঠাইমা ঠাকুরঘর থেকে বার হয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েচেন, পরনে গরদের শাড়ী, কপালে সি... চন্দনের টিপ, টকটকে চেহারা—এমন সময় আমার মা এক রাশ... কাপড় নিয়ে গোবরছড়ার বাল্‌তি হাতে পুকুরের ঘাটে যাচ্চেন, পরনের ময়লা কাপড়ের জায়গায় জায়গায় কাদা গোবরের ছাপ, রুক্ষ চুল; বেলা বারোটার কম নয়; সকাল থেকে মার মুখে এক ফোঁটা জল পড়ে নি—

জ্যাঠাইমা ডেকে বললেন—বৌ, রান্নাঘরের ছোট জালার জল কি কাল তুমি তুলেছিলে? আমি না কতবার তোমায় বারণ করেচি ছোট

জালায় তুমি জল ঢালবে না? বড় জালায় বেশী না পার তো তিন কলসী ক'রে ঢেলেও তো বেগার শোধ দিলে পার?

ছোট জালার জল জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা বা কাকারা খান। জ্যাঠাইমার এ-কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, মা গুরুমন্ত্র নেন্ নি, মায়ের হাতে জল অতএব শুদ্ধ নয়, সে জল ওঁরা খাবেন কি ক'রে?

সত্যিই তো জ্যাঠাইমা পূণ্যবতী। নইলে তিনি ঠাকুরঘরে পবিত্র দেহে পবিত্র মনে এতক্ষণ জপ আহ্নিক করছিলেন, আর মা মরছিলেন বেলা বারোটা পর্য্যন্ত গোয়াল-আস্তাকুঁড় ঘেঁটে—মা নাস্তিক মাতাল কেরাণীর স্ত্রী, তার ওপর আবার মেমের কাছে লেখাপড়া শিখে জাত খুইয়েচেন, কেন ওঁরা জল খেতে যাবেন মার হাতের?

আমার মনে হ'ল ঠাকুরও শুধু বড় মানুষের, পুণ্যিও বড় মানুষের জন্যে—নইলে মায়ের, ভাগ্নেবৌয়ের, ভুবনের মায়ের সময় কোথায় তারা নিশ্চিন্ত মনে, শুচি হয়ে, গরদ প'রে তাঁর পায়ে ফুলতুলসী দেবে?

বোধ হয় এই সব নানা কারণে জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গৃহদেবতার প্রতি আমি অনেকটা চেষ্টা করেও কোনো ভক্তি আনতে পারলাম না। এক-একবার ভেবেচি হয়ত সেটা আমারই দোষ, আমার শিক্ষা হয়েচে অন্যভাবে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে, তাদের কাছে যে দয়া মমতা পেয়েচি, আর কোথাও তা পাই নি বলেই। ছেলেবেলা থেকে যীশুখৃষ্টের কথা পড়ে আসচি, তাঁর করুণার কথা শুনেচি, তাঁর কত ছবি দেখেচি। আমার কাছে একখানা ছবি আছে খৃষ্টের, মেমেরা বড়দিনের সময় আমায় দিয়েছিল—বকের পালকের মত ধপধপে সাদা দীর্ঘ ঢিলে আলখেল্লা-পরা যীশু হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে—চারি ধারে তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করেচে, একটি ক্ষুদ্র শিশু তাঁর পা ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করচে, আর তিনি তাকে ধরে তুলতে যাচ্চেন নীচু হয়ে—

মুখে কি অপূর্ব্ব জ্যোতি, কি সুন্দর চাউনি—আমি এ ছবিখানা বইয়ের ভেতর রেখে দি, রোজ একবার দেখি—এত ভাল লাগে!

কিন্তু যীশুখৃষ্টের সম্বন্ধে কোনো ভাল বই পাইনে—আমার আরও জান্‌বার ইচ্ছে হয় তাঁর কথা—মাকে যে মেমেরা পড়াত চা-বাগানে, তারা একখানা মথি-লিখিত সুসমাচার ও খানকতক ছাপানো কাগজ বিলি করেছিল, সেইগুলো কতবার পড়া হয়ে গিয়েচে, তা ছাড়া আর কোনো বই নেই। এখানে এসে পর্য্যন্ত আর কোনো নতুন বই আমার চোখে পড়ে নি।

আমাদের স্কুলে একটা ছেলে নতুন এসে ভর্ত্তি হয়েচে আমাদেরই ক্লাসে। তার নাম বনমালী, জাতে সদ্‌গোপ, রং খুব কালো, কিন্তু মুখের চেহারা বেশ, বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়। সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, এখানে একটা ঘর ভাড়া করে থাকে, বামুনে রাঁধে। অনেক দূরের পাড়াগাঁয়ে তার বাড়ি, সেখানে লেখাপড়া শেখার কোনো সুবিধে নেই, তাই ওকে ওর বাপ-মা এই গাঁয়ে পাঠিয়েচে। কিন্তু লেখাপড়ার দিকে বনমালীর মন নেই, সে বাসার উঠোনে এক তুলসীচারা পুঁতে বাঁধিয়েচে, দিনরাত জপ করে, একবেলা খায়, মাছমাংস ছোঁয়না শ্রীকৃষ্ণ-নাম তার সাম্‌নে উচ্চারণ করবার যো নেই, তা হ'লেই তার চোখ দিয়ে জল পড়বে। রাত্রে জপের ব্যাঘাত হয় ব'লে বিকেলবেলা স্কুল থেকে গিয়ে খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বামুন-ঠাকুরকে ছুটি দেয়—তার পর ব'সে ব'সে অনেক রাত পর্য্যন্ত জপ করে, হরিনাম করে। সে সময় কেউ কাছে গেলে সে ভারি চটে। অদ্ভুত ধরণের ছেলে ব'লে তাকে সবাই ভারি খেপায়—স্কুলের ছেলেরা তার সাম্‌নে 'কিষ্ট' 'কিষ্ট' ব'লে চেঁচায় তার চোখে জল বেরোয় কি না দেখবার জন্যে, ওই নিয়ে মাষ্টারেরা পর্য্যন্ত খিঁচুনি দিতে বাকী রাখে না। সেদিন তো এ্যাল্‌-জেব্রার আঁক না পারার দরুণ আমাদের সাম্‌নে সেকেণ্ড মাষ্টার ওকে

বললে—তুমি তো শুনিচি কেষ্ট নাম শুনলে কেঁদে ফেল—তা যাও, পয়সা আছে বাপের, মঠ বানাও, মচ্ছব দেও, লেখাপড়া করবার সখ কেন? এ-সব তোমার হবে না বাপু।

আমি একদিন বনমালীর কাছে সন্ধ্যার সময় গিয়েছি। ও তখন একটা টুলের ওপর ব'সে এক মনে দেওয়ালের দিকে চেয়ে বোধ হয় জপ করচে—আমায় দেখে উঠে দোর খুলে দিলে, হেসে বসতে বললে। ওকে অদ্ভুত মনে হয়, সেজন্যেই দেখা করতে গিয়েছিলাম যে তা নয়—আমার মনে হয়েছিল ও যে-রকম ছেলে, ও বোধ হয় আমার নিজের ব্যাপারগুলোর একটা মীমাংসা ক'রে দিতে পারবে। তা ছাড়া ওকে আমার ভাল লাগে খুব, ওকে ভাল মানুষ পেয়ে সবাই খেপায়, অথচ ও প্রতিবাদ করে না, অনেক সময় বোঝে না যে তারা খেপাচ্চে, এতে আমার বড় মায়া হয় ওর ওপরে।

বনমালীকে জিগ্যেস্ করলাম সে কিছু দেখে কি না। সে আমার কথা বুঝতে পারলে না, বললে—কি দেখবো? তাকে বুঝিয়ে বললাম। না,—সে কিছু দেখে না।

তারপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ঘরে একখানা ছবি ছিল, আমি সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—ও-খানা কি তোমার ঠাকুরের ছবি?

বনমালীর গলার সুর বদ্‌লে গেল, চোখের চাউনি অন্য রকম হয়ে গেল। সে বল্‌লে—ঠিক বলেচ ভাই, আমার ঠাকুরের ছবি, চমৎকার কথা বলেচ ভাই—ওই তো আমার সব, আমার ঠাকুর শুধু কেন, তোমার ঠাকুর, সবারই ঠাকুর—

বল্‌তে বল্‌তে দর দর করে তার চোখে জল পড়তে লাগল।

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। কিন্তু একটু পরে বনমালীর কান্নার বেগ থাম্‌লে গর্ব্বের সুরে বললাম—খুব গোপনীয় কথা বললাম ওকে—কারও কাছে এ-পর্য্যন্ত মুখ ফুটে কথাটা বলিনি—বললাম—আমার

ঠাকুর অন্য কেউ নয়, আমার ঠাকুর যীশুখৃষ্ট—আমার কাছেও ছবি আছে—

বনমালী হাঁ ক'রে আমার দিকে চেয়ে রইল—তারপর অপ্রতিভ-ভাবে বললে—ও, তোমরা খৃষ্টান?

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

বনমালী ভেবে বললে—তাঁর কাছে সব সমান—

আমি বললাম—কার কাছে?

—শ্রীহরির কাছে ভাই, আবার কার কাছে? তাঁর কাছে কি আর হিন্দু, মোছলমান, খৃষ্টান আছে? তিনি যে পতিতপাবন—অধমের ঠাকুর—

আমার মনে ব্যথা লাগল এই ভেবে, বনমালী আমাকে অধম মনে করচে। যীশুখৃষ্টকে ও ছোট করতে চায়। আমি বললাম—যীশুর কাছে ও সব সমান। পাপীদের জন্যে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন—জান? মথি-লিখিত সুসমাচারে লিখেচে, যে তাহাতে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন—

মথি-লিখিত সুসমাচারের বাহিরে আমার আর কিছু জানা নেই। বনমালী কিন্তু সংস্কৃতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান আবৃত্তি ক'রে আমায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ বুঝিয়ে দিলে—আরও অনেক কথা বললে। আমি দু-তিন দিন তার কাছে গেলাম, তার ঠাকুর সম্বন্ধে শুনবার জন্যে। জ্যাঠাইমাদের বাড়ির সকলের চেয়ে ও বেশী জানে ওদের ধর্ম্মসম্বন্ধে—এ আমার মনে হ'ল। কিন্তু বনমালী আমার খৃষ্টভক্তি ভাল চোখে দেখলে না, বললে—হিন্দু হয়ে ভাই এ তোমার ভারি অদ্ভুত কাণ্ড যে তুমি অপরের দেবতাকে ভক্তি করো। গীতায় বলেচে, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ—অর্থাৎ নিজের ধর্ম্মে—

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম হিন্দু আমি কখনই না। আমরা যেখানে যে-অবস্থায় মানুষ হয়েচি সেখানে হিন্দু ধর্ম্মের কথা কিছু শুনিনি

কোনো দিন; কেউ বলত না। যা বলত, তাই শুনেচি, তাই বিশ্বাস করেচি—তা মনে লেগেচে। এতে আমার কি কোনো দোষ হয়েচে ভাই?

সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের দালানে আমি ব'সে পড়চি, এমন সময় কার পায়ের শব্দ শুনে চেয়ে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম—ছোটকাকীমা দাঁড়িয়ে! ছোটকাকীমা বড় মানুষের মেয়ে, তিনি তো কস্মিন্‌কালে আমাদের ভাঙা দালানে পা দেন্ নি—বিশেষ ক'রে আমাদের দু চোখে তিনি দেখতে পারেন না কোন কালে—বরং মেজকাকীমা সময়ে অসময়ে নরম হন, কিন্তু ছোটকাকীমার মুখে মিষ্টি কথা কোন দিন শুনিও নি।

আমাদের ঘরে আর কেউ নেই—দাদা এখনও ফেরেনি—সীতা ও মা জ্যাঠাইমাদের অন্দরে। আমি দাঁড়িয়ে উঠে থতমত খেয়ে বললাম—কি কাকীমা?

ছোটকাকীমা এদিক-ওদিক চেয়ে নীচু সুরে বল্‌লেন—তোর সঙ্গে কথা আছে জিতু।

আমি বললাম—কি বলুন?

কাকীমা বললেন—পানী যে রাতে মারা যায়, সেদিন তুই আমায় কি বল্‌ছিলি মনে আছে?

আমার ভয় হ'ল,—বললাম—না, কাকীমা।

ছোটকাকীমা হঠাৎ আমার হাত দুটো তাঁর দু'হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—বল্ বাবা জিতু, সেদিন তোর কথা সবাই উড়িয়ে দিয়েছিল, আমি কিন্তু তারপর সব বুঝেছিলাম, কাউকে বলি নি। পানী ছেড়ে গিয়ে আমায় পাগল ক'রে রেখে গিয়েচে—তুই বল্ জিতু। আমার

মাকে তুই দেখেছিলি সে রাত্রে, তিনি পানীকে ভালবাসতেন, তাই নিতে এসেছিলেন—মরে গিয়েও তাঁর পানীর কথা—

আমি জান্‌তাম না যে পানীর দিদিমা মারা গিয়েচেন। আমি বিস্ময়ের সুরে জিগ্যেস্ করলাম—আপনার মা বেঁচে নেই ?

—না, পানী তাঁর কাছ থেকে ফাল্গুন মাসে এল, তিনি আষাঢ় মাসে তো মারা গেলেন। তুই পানীকে দেখতে পাস্ জিতু ? তোকে সেদিন সবাই পাগল বললে, কিন্তু আমি তারপর ভেবে দেখলাম তোর কথার একটুও পাগলামি নয়—সব সত্যি। তুই আমার মাকে দেখতে পেয়েছিলি—সত্যি বল্ না জিতু বাবা, পানীকে দেখিস্ ?

আমার চোখেও জল এল। ছোটকাকীমাকে এত কাতর দেখিনি কখনও—তা ছাড়া পানীকে আমিও বড় ভালবাসতাম এ বাড়ির ছেলে-মেয়েদের মধ্যে। বললাম—না কাকীমা, পানীকে আমি কোনো দিন দেখিনি—আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি—

ছোটকাকীমা আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন, মেজকাকার গলার স্বর শুনে তিনি পালিয়ে গেলেন। ছোটকাকীমার কথা শুনে আমি কিন্তু আকাশ-পাতাল ভাবতে বস্‌লাম। আমি সেদিন সত্যি সত্যি কাউকে দেখেছিলাম তবে ? সে যেই হোক্, পানীর দিদিমাই হোক্, ম[illegible] হোক্ বা জীবন্তই হোক্। তা হ'লে আমার রোগ নয় ? আর কে[illegible] তবে দেখে না কেন ?

কিংবা হয়ত ছোটকাকীমা মেয়ের শোকে বুদ্ধি হারিয়েছেন, কি বল্‌চেন না-বল্‌চেন, উনিই জানেন না। ওঁর কথার ওপর বিশ্বাস কি ?

৬

জ্যাঠামশায়দের বাড়ি আরও বছর দুই কেটে গেল এই ভাবেই। যত বছর কেটে যায়, এদের এখানে থাকা আমার পক্ষে বেশী কঠিন হয়ে পড়তে লাগল। আমার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জিনিষ আমি বুঝতে পারি আজকাল, আগে আগে অত বুঝতাম না। এ-বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল এইজন্যে যে, আমি চেষ্টা করেও জ্যাঠাইমাদের ধর্ম্ম ও আচারের সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পেরে উঠলাম না।

এঁরা খুব ঘটা ক'রে যেটা ধর্ম্ম ব'লে আচরণ করেন, আমার মনের সঙ্গে সেটা ত আদৌ মেলে না—আমি মনে যা বলি, বাইরে তাই করি—কিন্তু ওঁরা তাতে চটেন। ওঁদের ধর্ম্মের যেটা আমার ভাল লাগে—সেটাকে ওঁরা ধর্ম্ম বলেন না।

কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েচে এই, আগে ভাবতাম শুধু জ্যাঠাইমাদের বাড়িতেই বুঝি এই রকম, এখন বয়স বাড়বার সঙ্গে বুঝতে পেরেচি—এ গ্রামের অধিকাংশই এই রকম—জ্যাঠাইমায়েরা একটু বেশী মাত্র।

এতেই আমার সন্দেহ হ'ল বোধহয় আমার মধ্যেই কোন দোষ আছে, যার ফলে আমি এঁদের শিক্ষা নিতে পারচি নে। ভাবলাম আমার যে ভাল লাগে না, সে বোধ হয় আমি বুঝতে পারি না বলেই—হয়ত চা-বাগানে থাকার দরুণ ওঁদের ধর্ম্ম আমরা শেখবার সুযোগ পাই নি, যে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েচি, সেটাই এখন ভাল লাগে।

ম্যাট্রিক পাস ক'রে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্ত্তি হলাম। জ্যাঠামশায়দের গ্রাম আটঘরার নবীন চৌধুরী—যার বড় ছেলে ননী ভাল ফুটবল খেলত

এবং যে প্রায়শ্চিত্তের বাধাবিঘ্ন না মেনে বাবার সৎকারের সময়ে দলবল জুটিয়ে এনেছিল—তারই ভগ্নীপতির বাড়ি অর্থাৎ নবীন চৌধুরীর বড় মেয়ে শৈলবালার শ্বশুরবাড়ী শ্রীরামপুরে। ননীর যোগাড়যন্ত্রে তাদের শ্বশুরবাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হ'ল।

এসে দেখি এদেরও বেশ বড় সংসার, অনেক লোক। শৈলদিদির স্বামীরা ছ'ভাই, তার মধ্যে চার ভাইয়ের বিয়ে হয়েচে, আর একটি আমার বয়েসী, ফার্ষ্ট ইয়ারেই ভর্ত্তি হ'ল আমার সঙ্গে। সকলের ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। শৈলদি বাড়ির বড়বৌ, আমি তাঁর দেশের লোক, সবাই আমাকে খুব আদর যত্ন করলে। এখানে কিছুদিন থাকবার পরে বুঝলাম যে, সংসারে সবাই জ্যাঠামশায়দের বাড়ির ছাঁচে গড়া নয়। চা-বাগান থেকে এসে বাংলা দেশ সম্বন্ধে যে একটা হীন ধা[illegible] আমার হয়েছিল, সেটা এখানে দু-চার মাস থাকতে থাকতে চলে গেল। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম যে এ-বাড়ির মেয়েরা কেউ কারও বড় একটা অধীন নয়। কোন এক জনকে সকলের ভয় ক'রে চলতে হয় না বা কোন এক জনের কথায় সকলকে উঠতে বসতে হয় না।

আমি থাকি বাইরের একটা ঘরে, কিন্তু অল্পদিনেই আমি বাড়ির ছেলে হয়ে পড়লাম। শৈলদিদি খুব ভাল, আমাকে ভাইয়ের মত দেখে। কিন্তু এতবড় সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়ে সে বড় ব্যস্ত থাকে—সব সময় দেখাশুনো করতে পারে না। শৈলদিদির বয়স আমার মেজকাকীমার চেয়ে কিছু ছোট হবে—তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মা! আটঘরায় থাকতে খুব বেশী আলাপ ছিল না, দু-একবার জ্যাঠামশায়দের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে আলাপ করে এসেছিল, তারপর ননী কথাটা পাড়তেই তখুনি রাজী হয়ে যায় আমায় এখানে রাখবার সম্বন্ধে। শৈলদিদির স্বামী তার কোন কথা ফেলতে পারে না।

[illegible] সকলের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে

সর্ব্বত্র যাই—জ্যাঠামশায়দের বাড়ির মত এটা ছুঁয়ো না, ওটা ছুঁয়ো না কেউ করে না। সব ঘরে যাই, সব বিছানাতেই বসি—সবাই আদরযত্ন করে, পছন্দ করে। এখন বয়স হয়েচে বুঝতে পেরেচি, আটঘরায় যতটা বাঁধাবাধি, এসব শহর-বাজারে অত নেই এদের। কষ্ট হয় মার জন্যে, সীতার জন্যে—তারা এখনও জ্যাঠাইমার কঠিন শাসনের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে ক্রীতদাসীর মত উদয়াস্ত খাটচে। দাদার জন্যেও কষ্ট হয়। সে লেখাপড়া শিখলে না—চাকুরী করবে সংসারের দুঃখ ঘুচোবে বলে—কিন্তু চাকুরী পায় না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আজ বারো টাকা মাইনের চাকুরী করে, কাল জবাব হয়ে যায়, আবার আর এক জায়গায় ষোল টাকা মাইনের চাকুরি জোটায়। এত সামান্য মাইনেতে বিদেশে খেতে পড়ে কোন মাসে পাঁচ টাকা, কোন মাসে তিন টাকার বেশী মাকে পাঠাইতে পারে না, তাতে কি দুঃখ ঘুচবে? অথচ না শিখলে লেখাপড়া, না করতে পারলে কিছু।

কলেজের ছুটির পরে গঙ্গার ধারে একখানা বেঞ্চির ওপর বসে এইসব কথাই ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে ভয়ানক ইচ্ছে হয় আবার একবার চা বাগানের দিকে যাই, আর একবার হিমালয় দেখি। কতকাল রডোড্রেণ্ডন্ ফুল দেখি নি, পাইন-বন দেখি নি, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখি নি—সে রকম শীত আর পাই নি কোনদিন,—এদের সবাইকে দেখাতে ইচ্ছে হয় সে দেশ। স্কুলে যখন প্রবন্ধ লিখতে দিত, আমি হিমালয় নিয়ে লিখতাম—আমার লেখা সকলের চেয়ে ভাল হ'ত—কারণ বাল্যের স্বপ্ন-মাখানো সে ওক পাইনের বন, ঝর্ণা, তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা, কুয়াসা, মেঘ আমার কাছে পুরনো হবে না কোন দিন, তাদের কথা লিখতে গেলে নতুনতর ভাব ও ভাষা কোথা থেকে এসে জোটে, মনে হয় আরও লিখি, এখনও সব বলা হয় নি। লেখা অপরে ভাল বললেও আমার মন তৃপ্ত হ'ত না, মনে হ'ত, যা দেখেচি তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও

আঁকতে পারলাম না—অপরে ভাল বল্‌লে কি হবে, তারা ত আর দেখেনি ?

ওপারে বারাকপুরের সাদা বাড়িগুলো যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে আছে। ঠিক যেন চা-ঝোপের আড়ালে ম্যানেজার সাহেবের কুঠী—লাল টালির ছাদ থাকলেই একেবারে চা-বাগান। ওই দিকে চেয়েই ত রোজ বিকেলে আমার মনে হয় বাল্যের চা-বাগানের সেই দিনগুলো।

বাড়ি ফিরে গেলাম সন্ধ্যার পরে। চাকরকে ডেকে বললাম, লুলু আলো দিয়ে যা। এমন সময়ে ভবেশ এল। ভবেশ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, খুব বুদ্ধিমান ছেলে, স্কলারসিপ্ নিয়ে পাস করেচে—প্রথম দিনেই কলেজে এর সঙ্গে আলাপ হয়।

ভবেশের দৈনন্দিন কাজ—রোজ এসে আমার কাছে খৃষ্টান ধর্ম্মের নিন্দা করা। আমাকে ও খৃষ্টান ধর্ম্মের কবল থেকে উদ্ধার ক'রে নাকি হিন্দু করবেই। আজও সে আরম্ভ করলে, বাইবেলটা নিতান্ত বাজে, আজগুবি গল্প। খৃষ্টান ইউরোপ এই সেদিনও রক্তে সারা দুনিয়া ভাসিয়ে দিলে গ্রেট ওয়ারে। কিসে তুমি ভুলেচ ? রোজ যা[illegible]কারিং সাহেবের কাছে ধর্ম্মের উপদেশ নিতে। ওরা ত তোমাকে [illegible]ষ্টান করতে পারলে বাঁচে। তা ছাড়া আজ হিন্দুদের বলবৃদ্ধি করা আম[illegible]দের সবারই কর্ত্তব্য—এটা কি তোমার মনে হয় না ?

আমি বললাম—তুমি ভুল বুঝেচ ভবেশ, তোমাকে এক[illegible]ও বোঝাতে পারলাম না যে আমি খৃষ্টান নই ; খৃষ্টান ধর্ম্ম কি জিনি[illegible]মি জানি নে—জানবার কৌতূহল হয় তাই পিকারিং সাহেবের কাছে জানতে যাই। আমি যীশুখৃষ্টের ভক্ত, তাঁকে আমি মহাপুরুষ বলে মনে করি। তাঁর কথা আমার শুন্‌তে ভাল লাগে। তাঁর জীবন আমাকে মুগ্ধ করে। এতে দোষ কিসের আমি ত বুঝি নে।

ও বটে ! বুদ্ধ, চৈতন্য, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ এঁরা সব ভেসে গেলেন—

যীশুখৃষ্ট হ'ল তোমার দেবতা! এঁরা কিসে ছোট তোমার যীশুর কাছে জিগ্যেস্ করি?

—কে বলেচে তাঁরা ছোট? ছোট কি বড় সে কথা ত উঠচে না এখানে? আমি তাঁদের কথা বেশী জানি নে। যতটুকু জানি তাতে তাঁদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এও ত হয় কেউ একজনকে বেশী ভালবাসে আর একজনকে কম ভালবাসে?

—তুমি যতই বোঝাও জিতেন, আমার ও ভাল লাগে না। দেশের মাটির সঙ্গে যোগ নেই ওর। তোমার মত চমৎকার ছেলে যে কেন বিপথে পা দিলে, ভেবে ঠিক করতে পারি নে। তোমার লজ্জা করে না একথা বলতে যে, তুমি রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের কথা কিছু জান না, তাঁদের কথা জানতে আগ্রহও দেখাও না, অথচ রোজ যাও যীশুখৃষ্টের বিষয় শুনতে? একশো বার বলবো তুমি বিপথে পা দিয়ে দাঁড়িয়েচ। কই, একদিন গীতা পড়েচ? অথচ গস্‌পেল পড়তে যাও পিকারিঙের কাছে—তোমাকে বন্ধু বলি তাই কষ্ট হয়, নইলে তুমি উচ্ছন্ন যাও না, আমি বলতে যাব কেন?

ভবেশ চলে গেলে অনেক রাত পর্য্যন্ত কথাটা ভাবলাম। খৃষ্টকে আমি ভক্তি করি, খৃষ্টের কথা বলতে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে। এতে দোষ আছে কিছু? মহাপুরুষের কি দেশ-বিদেশ আছে?

রাত্রে বাড়ির মধ্যে খেতে গিয়ে দেখি আর সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েচে···ছোটবউ অর্থাৎ শৈলদিদির ছোট-জায়ের রান্নার পালা ছিল এবেলা—তিনি হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে বসে আছেন। আমি খেতে বসলাম কিন্তু কেমন অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল—শৈলদিদির এই ছোট-জাকে আমি কি জানি কেন পছন্দ করিনে। মেজবউ, সেজবউকে যেমন মেজদি, সেজদি ব'লে ডাকি—ছোটবউকে আমি এ পর্য্যন্ত কোন কিছু ব'লে ডাকিনি। অথচ তিনি আমার সাম্‌নে বেরোন বা আমার সঙ্গে

কথা বলেন। ছোটবৌয়ের বয়স আমার সমান হবে, এই সতেরো আঠারো—আমি যদিও 'আপনি' ব'লে কথা বলি। বাড়ীর মেয়েরা ও বৌয়েরা জানে যে ছোটবৌয়ের সঙ্গে আমার তেমন সদ্ভাব নেই। কেন আমি তাঁকে ছোটদিদি ব'লে ডাকি নে, শৈলদি আমায় এ নিয়ে কতবার বলেচে। কিন্তু আমার যা ভাল লাগে না, তা আমি কখনও করিনে।

সেদিন এক ব্যাপার হয়েচে। খেয়ে উঠে অভ্যাস মত পান চেয়েচি—কাউকে বিশেষ ক'রে সম্বোধন ক'রে নয়, যেন দেওয়ালকে বলচি এই ভাবে। ছোটবউ আধ-ঘোমটা দিয়ে এসে পান আমার হাতে দিতে গেলেন—আমার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হ'ল, কেন জানিনে, অন্য কারুর বেলা আমার ত এমনি অস্বস্তি বোধ হয় না? পান দেবার সময় তাঁর আঙ্গুলটা আমার হাতে সামান্য ঠেকে গেল—আমি তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলাম। আমার সারা গা কেমন শিউরে উঠল, লজ্জা ও অস্বস্তিতে মনে হ'ল, পান আর কখনও এমনভাবে চাইব না। মেজদি কি শৈলদির কাছে গিয়ে চেয়ে নেবো।

সেই দিন থেকে ছোটবউকে আমি এড়িয়ে চলি।

মাস-কয়েক কেটে গেল। শীত পড়ে গিয়েচে।

আমি দোতলার ছাদে একটা নিরিবিলি জায়গায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে জ্যামিতির আঁক কব্‌চি।

সেজদি হাসতে হাসতে ছাদে এসে বললেন—জিতু এস তোমায় ওরা ডাকচে।

আমি বললুম—কে ডাকচে সেজদি?

সেজদির মুখ দেখে মনে হ'ল একটা কি মজা আছে। উৎসাহ ও কৌতূহলের সঙ্গে পেছনে পেছনে গেলাম। দোতলার ওদিকের বারান্দাতে সব মেয়েরা জড়ো হ'য়ে হাসাহাসি করচে। আমায় সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল, বললে—এস ঘরের মধ্যে।

তাদের পেছনে ঘরে ঢুক্‌তেই সেজদি বিছানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই লেপটা তোল ত দেখি কেমন বাহাদুরি?

বিছানাটার উপর আগাগোড়া লেপ-ঢাকা কে এক জন শুয়ে আছে লেপ মুড়ি দিয়ে। সবাই বল্‌লে—তোল ত লেপটা!

আমিও হাসিমুখে বল্‌লাম—কি বলুন না সেজদি, কি হয়েচে কি?

ভাবলুম বোধ হয় শৈলদির ছোট দেওর অজয়কে এরা একটা কিছু সাজিয়েচে বা ঐ রকম কিছু। তাড়াতাড়ি লেপটা টেনে নিয়েই চমকে উঠলাম। লেপের তলায় ছোটবৌঠাক্‌রুণ মুখে হাসি টিপে চোখ বুঁজে শুয়ে!

সবাই খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল। আমি লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বার হয়ে গেলাম। বা রে, এ কি কাণ্ড ওদের? কেম আমায় নিয়ে এ রকম করা? তা ছাড়া—ছিঃ—না ওকি কাণ্ড? ছোট-বৌঠাক্‌রুণ স্বেচ্ছায় এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন নিশ্চয়। আমার রাগ হ'ল তাঁর ওপরে।

এর দিন দুই পরে আমি আমার নিজের ঘরে একা বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ ছোটবৌঠাক্‌রুণকে দোরের কাছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম—তিনি আমার ঘরে কখনও আসেন নি এ-পর্য্যন্ত। কিন্তু তিনি যেমনি এলেন, তেমনি চলে গেলেন, একটু দাঁড়ালেন না, যাবার আগে ঘরের মধ্যে কি একটা ফেলে দিয়ে গেলেন।

আমি বিস্মিত হয়ে তুলে দেখলাম একখানা ভাঁজ করা ছোট কাগজ—একখানা চিঠি! ছোট্ট চিঠি, দু-কথায়—

"সেদিন যা ক'রে ফেলেচি, সেজন্য আপনার কাছে মাপ চাই। আমি নিজের ইচ্ছেতে কিছু করিনি! দলে পড়ে করেচি। ক'দিন ধ'রে ভাবচি আপনার কাছে মাপ চাইব—কিন্তু লজ্জায় পারি নি। আমি জানি আপনার মন অনেক বড়, আপনি ক্ষমা করবেন।"

পত্রে কোনো নাম নেই। আমি সেখানা বারবার পড়লাম। তারপর টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেললাম—কিন্তু টুক্‌রো গুলো ফেলে দিতে গিয়ে কি ভেবে আমার একটা ছোট মণিব্যাগ ছিল, তার মধ্যে রেখে দিলাম।

সেদিন থেকে আমার কি হ'ল, আমি একা থাকলেই ছোট বৌঠাক্‌রুণের কথা ভাবি! কিছুতেই মন থেকে আমি তার চিন্তা তাড়াতে পারি নে। দু-পাঁচ দিন ক'রে হপ্তাখানেক কেটে গেল। আমি বাড়ির মধ্যে তেমন আর যাইনে—অত্যন্ত ভয়, পাছে একা আছি এমন অবস্থায় ছোটবৌঠাক্‌রুণের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে। ছোটবৌয়ের রান্নার পালার দিন আমি সকাল সকাল খেয়ে নি, যখন অনেক লোক রান্নাঘরে থাকে। যা যখন দরকার হয়, শৈলদি কি সেজদির কাছে চাই—ওদের গলা না শুনতে পেলে বাড়ির মধ্যে যেতে সাহস হয় না।

সেজদি একদিন বল্লেন—জিতু, তুমি কলেজ থেকে এসে খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি? বিকেলে ত বাড়ির মধ্যে থাকই না, আসই না। কোথা থেকে খেয়ে আস বুঝি?

আমি জানি বিকেলের চা খাবার প্রায়ই ছোটবৌ তৈরী করেন—আর সে সময় বড়-একটা কেউ সেখানে থাকে না। যে যার কাজে চলে যায়। ইচ্ছা ক'রেই বিকেলে চা খেতে যাই নে। পয়সা যেদিন থাকে, ষ্টেশনের দোকান থেকে খেয়ে আসি।

শীত কেটে গেল, বসন্ত যায়-যায়। আমার ঘরে জানালার ধারে বসে পড়ছি, হঠাৎ জানালার পাশের দরজা দিয়ে ছোটবৌঠাকরুণ কোথা

থেকে বেড়িয়ে এসে বাড়ি ঢুকচেন, সঙ্গে শৈলদির ছেলে কালো। তিনি আমায় দেখতে পাননি। আমি অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তাঁকে যেন নতুন রূপে দেখলাম—আরও কতবার দেখেছি, কিন্তু আজ দেখে মনে হ'ল এ-চোখে আর কখনও দেখিনি তাঁকে। তাঁর কপালের অমন সুন্দর গড়ন, পাশের দিক থেকে তাঁর মুখ যে সুশ্রী দেখায়, ভুরুর ও চোখের অমন ভঙ্গি—এ সব আগে ত লক্ষ্য করি নি? যখন কেউ দেখে না, তখন তাঁর মুখের কি অদ্ভুত ধরণের ভাব হয়! তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতেই আমার চমক ভাঙলো। বই খুলে রেখে দিলাম—পড়ায় আর মন বসল না, সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। কি একটা কষ্ট হ'তে লাগল বুকের মধ্যে—যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসচে। মনে হ'ল চুপ ক'রে বসে থাকতে পারব না, এক্ষুনি ছুটে মুক্ত বাতাসে বেরুতে হবে।

সেই রাত্রে আমি তাকে চিঠি লিখতে বসলাম—চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেল্‌লাম, আবার লিখে আবার ছিঁড়লাম। সেইদিন থেকে তাঁকে উদ্দেশ ক'রে চিঠি লেখা যেন আমার কলেজের টাস্কের সামিল হয়ে দাঁড়ালো—কিন্তু লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি।

দিনপনের পরে ঠিক করলাম, আজ চিঠি দেবই। সেদিন বেলা দেড়টার মধ্যে কলেজ থেকে ফিরে এলাম—গ্রীষ্মের দুপুর, সবাই ঘুমুচ্চে। আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম, সিঁড়ির পাশে দোতালায় তাঁর ঘর, তিনি ঘরে বসে সেলাই করছিলেন—আমি সাহস ক'রে ঘরে ঢুকে চিঠি দিতে পারলাম না, চলে আসছিলাম, এমন সময় তিনি মুখ তুলেই আমায় দেখতে পেলেন, আমি লজ্জায় ও ভয়ে অভিভূত হয়ে সেখান থেকে সরে গেলাম, ছুটে নীচে চলে এলাম—পত্র দেওয়া হ'ল না, সাহসই হ'ল না। বাড়ী থেকে বেরিয়ে পথে পথে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালাম লক্ষ্যহীন ভাবে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি

যখন ফিরি, রাত তখন বারোটা। বাড়িতে আবার কোন লক্ষ্মীপূজা ছিল। খেতে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় আমার খাবার ঢাকা আছে, শৈলদি ঢুলচেন রান্নাঘরের চৌকাঠে ব'সে। মনে মনে অনুতাপ হ'ল, সারা বিকেল খাটুনির পরে শৈলদি বেচারা কোথায় একটু ঘুমুবে, আর আমি কি-না এ-ভাবে বসিয়ে রেখেচি!

আমাকে দেখে শৈলদি বললে—বেশ, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কথার উত্তর দিতে গেলে মুস্কিল, চুপচাপ খেতে বসলাম। শৈলদি বল্‌লে—না খেয়ে টন্‌ টন্‌ করে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গিয়েচে। চা খেতেও আসিস্‌ নে বাড়ির মধ্যে, কালোকে দিয়ে বাইরের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিলেও পাওয়া যায় না···থাকিস্‌ কোথায়?

খানিকক্ষণ পরে পাতের দিকে চেয়ে বল্‌লে—ও কি, ভাল ক'রে ভাত মাখ। ঐ ক'টি খেয়ে মানুষ বাঁচে ত? তোরা এখন ছেলেমানুষ, খাবার বয়স। লুচি আছে ভোগের, দোবো? পায়েস তুই ভালবাসিস্‌, এক বাটি পায়েস আলাদা করা আছে। কই মাছের মুড়ো ফেল্‌লি কেন, চুষে চুষে খা। আহা, কি ছিরি হচ্চে চেহারার!

পরদিন কিসের ছুটি। আমি দোতলার ছাদে কালোকে ডাকতে গিয়েচি তার প্রাইভেট টিউটর নীচে পড়াতে এসেচে ব'লে। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়েছে। ও-ঘরে উঠেই আমি একেবারে ছোটবৌঠাকরুণের সামনে পড়ে গেলাম। তার কোলে মেজদির দেড় বছরের খুকী মিণ্টু—সে খুব ফুটফুটে ফর্সা ব'লে বাড়ীর সকলের প্রিয়, সবাই তাকে কোলে পাবার জন্যে ব্যগ্র। ছোটবৌঠাকরুণ হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন খুকীকে কোলে ক'রে। আমি বিস্মিত হ'লাম, কপালে ঘাম দেখা দিল। খুকী আমায় চেনে, সে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে আসতে চায়। ছোটবৌঠাকরুণ আমার আরও কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন—খুকীকে আমার কোলে দিলেন। তাঁর পায়ের আঙুল

আমার পায়ের আঙ্গুলে ঠেক্‌ল। আমি তখন লাল হয়ে উঠেচি, শরীর যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করচে। কেউ কোন দিকে নেই।

ছোটবৌঠাকরুণ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বর নীচু ক'রে বললেন—আপনি আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন আজকাল? আমার ওপর রাগ এখনও যায়নি?

আমি অতি কষ্টে বললাম—রাগ করব কেন?

—তবে সেদিন ও-ঘরে এলেন, আমার সঙ্গে কথা বললেন না ত? চলে গেলেন কেন?

মরীয়া হয়ে বললাম—আপনাকে সেদিন চিঠি দোবো ব'লে এসেছিলাম, কিন্তু পাছে কিছু মনে করেন, সেজন্যে দেওয়া হয় নি। পাছে কিছু মনে করেন ভেবেই বাড়ির মধ্যে আসি নি।

তিনি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে লেখাপড়া করুন। কেন ও-রকম করেন? আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন? ওতে আমার মনে ভারি কষ্ট হয়। যেমন আসতেন, তেমনি আসবেন বলুন? আমায় ভাবনার মধ্যে ফেল্‌বেন না ওরকম।

আমার শরীরে যেন নতুন ধরনের অনুভূতির বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেখানে আর দাঁড়াতে পারলাম না—মুখে যা এল, একটা জবাব দিয়ে নীচে নেমে এলাম। সারারাত ঘুমুতে আর পারিনে! আমার জন্যে একজন ভাবে—এ চিন্তার বাস্তবতা আমার জীবনে একেবারে নতুন! নতুন! নতুন! নেশার মত এ অনুভূতি আমার সারা দেহ মন অভিভূত ক'রে তুল্‌লে।

কি অপূর্ব্ব ধরণের আনন্দ-বেদনায় মাখানো দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস! দিনরাতে সব সময়ই আমার ওই এক চিন্তা। নির্জ্জনে কাটাই, কিছু ভাল লাগে না, অথচ যাঁর চিন্তা শয়নেস্বপনে সর্ব্বদাই করি, তাঁর সাম্‌নে পাছে পড়ি এই ভয়ে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করি। লেখাপড়া, খাওয়া, ঘুম সব গেল।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি ছোট বৌঠাকুরুণের হ'ল অসুখ। অসুখ ক্রমে বাড়াবাড়ি ধরনের হ'ল। চাতরা থেকে যদু ডাক্তার দেখতে এল। তাঁর বাপের বাড়ি থেকে লোকজন এসে পড়ল—বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। আমি ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, এসব করি বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে, কিন্তু একদিনও রোগীর ঘরে যেতে পারলাম না—কিছুতেই না। একদিন ঘরের দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—কিন্তু চৌকাঠের ওপারে যাই নি।

ক্রমে তিনি সেরে উঠলেন। একদিন আমার 'চয়নিকা'-খানা তিনি চেয়ে পাঠালেন—দিন দুই পরে কালো বই ফিরিয়ে দিয়ে গেল। চার-পাঁচ দিন পরে 'চয়নিকা'-খানা কি জন্যে খুলতে গিয়েচি, তার মধ্যে একখানা চিঠি, ছোটবৌঠাকুরুণের হাতে লেখা।

নাম নেই কারুর। লেখা আছে···

"আমার অসুখের সময় সবাই এল, আপনি এলেন না কেন? আমি কত আশা করেছিলাম যে আপনি দেখতে আসবেন, জানেন তা? আমার মরে যাওয়াই ভাল। কেন যে আবার সেরে উঠলাম। অসুখ থেকে উঠে মন ও শরীর ভেঙে গেছে। কালোর মুখে শুনেচি, আপনি ঘরে টাঙিয়ে রেখেচেন, যীশুখৃষ্টের ছবি, তিনি হিন্দুর দেবতা নন্—কিন্তু আপনি যাঁকে ভক্তি করেন—আমি তাঁকে অবহেলা করতে পারি নে। আমার জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন! আর একটা কথা—একটিবার দেখতে কি আসবেন না?"

যীশুখৃষ্টের ছবির দিকে চাইলাম। সম্প্রতি একখানা বুদ্ধের ছবি, আর একখানা চৈতন্যের ছবিও এনে টাঙিয়ে ছিলাম। রোগশীর্ণা পত্রলেখিকার করুণ আকুতি ওঁদের চরণে পৌঁছে দেবার ভার আমার ওপর পড়েচে। কিন্তু আমি কি পারব? অনুকম্পায় মমতায় আমার

... প্রার্থনা ওঁদের কাছে জানালাম, তা

ভাষাহীন, বাক্যহীন। আমি এ-ছাড়া আর কিছু করতে পারি নে। সামনে হঠাৎ যেতে পারব না তাঁর। এ-বাড়িতেও আর বেশীদিন থাকা হবে না আমার। চলে যাব এখান থেকে।

টেষ্ট পরীক্ষা দিয়েই আটঘরায় পালাবো, ঠিক করলাম। সেখানে যাইনি অনেক দিন। মা চিঠি লিখেছেন, দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েচেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে হয় না শুধু জ্যাঠাইমাদের ব্যবহারের জন্যে। গেলেই মায়ের দুঃখ দেখতে হবে। দাদা এক বাতাসার কারখানায় চাকরি পেয়েচে, মাসে কিছু টাকা অতিকষ্টে পাঠায়। সীতা বড় হয়ে উঠল—তারই বা কি করা যায়?······দাদা একাই বা কি করবে!

পিকারিং সাহেব আমার হাতে গীতা দেখে একদিন বললে—তুমি এ-সব পড় নাকি? বাইবেল কি তোমার সকল আধ্যাত্মিক অভাব পূর্ণ করে না?

আমি বললাম—পড়ে দেখতে দোষ আছে সাহেব? তা ছাড়া আমি ত খৃষ্টান নই, আমি এখনও হিন্দু।

—দু-নৌকোতে পা দেওয়া যায় না, মাই বয়। তুমি খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হও—নয়তো তুমি বাইবেল পড় কেন?

—সাহেব,যদি বলি ইংরিজী ভাষা ভাল ক'রে শেখবার জন্যে?

পিকারিং সাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠল। বললে—তোমার আত্মার পরিত্রাণ তার চেয়েও বেশী দরকারী। যীশুতে বিশ্বাস না করলে আত্মার ত্রাণ নেই। তিনি আমাদের সকলের পাপের ভার নিজে নিয়ে ক্রুশের নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যীশুর ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, তোমার পাপ তাঁর রক্তে ধুয়ে যাবে। এস, আমার সঙ্গে গান কর।

তারপর সাহেব নিজেই গান ধরিল—

Nothing but the Blood of Jesus
Oh, precious is the flow.
That can make me white as snow,
No other fount I know,
Nothing but the Blood of Jesus.

পিকারিং সাহেবকে আমার খুব ভাল লাগে। খুব সরল, ধর্ম্মপ্রাণ লোক। স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ দশ-বারো বছর, আর বিয়ে করেনি,—টেবিলের ওপর নিকেলের ফ্রেমে বাঁধানো স্ত্রীর ফটো সর্ব্বদা থাকে। মাঝে মাঝে আমায় জিগ্যেস্ করে—আমার স্ত্রী দেখতে কেমন ছিল, ভাল না? ফটো দেখে মিসেস্ পিকারিঙকে সুন্দরী মনে হয়নি আমার, তবুও বলি খুব চমৎকার।

পিকারিং সাহেবের ধর্ম্মমত আমার কাছে কিন্তু অনুদার ঠেকে—কিছুদিন এদের সঙ্গে থেকে আমার মনে হয়েচে জ্যাঠাইমারা যেমন গোঁড়া হিন্দু—খৃষ্টানদের মধ্যেও তেমনি গোঁড়া খৃষ্টান আছে। এরা নিজের ধর্ম্মটি ছাড়া আর কারুর ধর্ম্ম ভাল দেখে না। এদের সমাজে সংকীর্ণতা আছে—এদেরও আচার আছে—বিশেষতঃ একটি নির্দ্দিষ্ট ধরনে ঈশ্বরের উপাসনা না করলে উপাসনা ব্যর্থ হ'ল এদের মতে। একখানা কি বইয়ে একবার অনন্ত নরকের গল্প পড়লাম। শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত পাপীরা সেই অনন্ত নরকের অনন্ত আগুনের মধ্যে জ্বলবে পুড়বে, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হবার আগেই যদি কোন শিশু মারা যায়—তাদের আত্মাও যাবে অনন্ত নরকে। এসব কথা প্রথমে যেদিন শুনে-ছিলাম, আমাকে ভয়ানক ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর মনে হ'ল কেন যীশু কি এতই নিষ্ঠুর? তিনি পরিত্রাণের দেবতা, তিনি সকল পাপীকেই কেন পরিত্রাণ করবেন না? যে তাঁকে জানে, যে তাঁকে না-জানে—সবাইকে সমান চোখে তিনি কেন না দেখবেন? তাঁর কাছে খৃষ্টান ও

অখৃষ্টানে প্রভেদ থাকবে কেন? বরং যে অজ্ঞানান্ধ তাঁর প্রতি তাঁর অনুকম্পা বেশী হবে—আমার মনের সঙ্গে এই খৃষ্টের ছবি থাপ খায়। তিনি প্রেমময় মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁর কাছেও ধর্ম্মের দলাদলি থাকে কখন? যে দেশের, যে ধর্ম্মের, যে জাতির হোক, তিনি সবারই—যে তাঁকে জানে, তিনি তার, যে না-জানে, তিনি তারও।

একদিন গঙ্গার ধারে বেঞ্চির ওপর বসে জনকতক লোক গল্প করচে শুনলাম বরানগরে কুঠিঘাটের কাছে একটা বাগান-বাড়িতে একজন বড় সাধু এসেচেন, সবাই দেখতে যাচ্চে। দু-এক দিনের মধ্যে একটা ছুটি পড়ল, বেলুড়ে নেমে গঙ্গা পার হয়ে কুঠিঘাটের বাগান-বাড়ীতে খোঁজ ক'রে বার করলাম। বাগান-বাড়িতে লোকে লোকারণ্য, সকলেই সাধুজীর শিষ্য, মেয়েরাও আছে। ফটকের কাছে একজন দাড়িওয়ালা লোক দাঁড়িয়েছিল, আমি ফটকের কাছে গিয়ে আমার আসার উদ্দেশ্য বলতেই লোকটা দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে—ভাই, এস এস, তোমাকে নেওয়ার জন্মই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি!

আমি পছন্দ করিনে যে কেউ আমার গলা জড়িয়ে ধরে—আমি ভদ্রভাবে গলা ছাড়িয়ে নিলাম। লোকটা আমায় বাগানের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। বাঁ-দিকের রোয়াকে একদল মেয়ে ব'সে একরাশ তরকারী কুটছে—একটা বড় গামলায় প্রায় দশ সের ময়দা মাথা হচ্চে,— যেদিকে চাই, খাওয়ার আয়োজন।

—সাধুর দেখা পাবো এখন?

—তিনি এখন ধ্যান করচেন। তাঁর প্রধান শিষ্য জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী ও-ঘরে আছেন, চল ভাই তোমায় নিয়ে যাই।

কথা বলচি এমন সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গে একটি মহিলা—

ফটকের কাছে তাঁরা মোটর থেকে নামলেন। একজন বালক-শিষ্যকে ভদ্রলোকটি কি জিগ্যেস্ করলেন—সে তাঁদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল আমার সঙ্গের দাড়িওয়ালা লোকটির কাছে। ভদ্রলোকটি তাকে বললেন—স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেচি, তিনি কোথায় ?

কোথা থেকে আসচেন আপনারা ?

—ভবানীপুর, এল্‌গিন রোড থেকে। আমার নাম বিনয়ভূষণ মল্লিক—

দাড়িওয়ালা লোকটির শরীরের ইস্ক্রুপ কব্জা যেন সব ঢিলে হয়ে গেল হঠাৎ—সে তিন ভাগে ভেঙে হাত কচলে বললে—আজ্ঞে আসুন, আসুন বুঝতে পেরেচি, আসুন। এই সিঁড়ি দিয়ে আসুন—আসুন মা-লক্ষ্মী—

আমি বিস্মিত হ'লাম। এই যে বললে সাধুজী ধ্যানে বসেচেন—তবে ওঁরা গেলেন যে! লোকটি ওঁদের ওপরে দিয়ে আবার নেমে এল। আমায় একটা হলঘরে নিয়ে গেল। সেখানে জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে। জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর পরনে গেরুয়া আলখেল্লা, রং ফর্সা—আমার সঙ্গে বেশ ব্যবহার করলেন। তিনি আপিসের কাজে দেড়শো টাকা মাইনে পেতেন—ছেড়ে স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেচেন। স্বামিজী বলেচেন তিনি তিনটে মহাদেশ উদ্ধার করবেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেই বেরিয়ে পড়বেন সে উদ্দেশ্যে। স্বামিজীর দেওয়া মন্ত্র জপ ক'রে তিনি অদ্ভুত ফল পেয়েচেন নিজে—এই সব গল্প সমবেত দর্শকদের কাছে করছিলেন। আমি কৌতূহলের সঙ্গে জিগ্যেস্ করলাম—কি ফল পেয়েচেন মন্ত্রের ? তিনি বললেন—মন্ত্র জপ করতে করতে মনে হয় যেন কোথায় পাহাড়ের উপরে বসে আছি। স্বামিজী বলেন—এ-একটা উচ্চ অবস্থা। আমি আরও আগ্রহের সুরে বললাম—আর কিছু দেখেন ? তিনি বললেন জ্যোতি-দর্শন হয় মাঝে মাঝে।

—সে কি রকম ?

দুই ভুরুর মাঝখানে একটা আগুনের শিখার মত দীপ্তি দেখতে পাই।

আমি হতাশ হ'লাম। আমি নিজে ত কত কি দেখি! এরা ত সে-সব কিছু দেখে ব'লে মনে হয় না! এরা আর কতটুকু দেখেচে তা হ'লে? পাহাড়ের ওপর বসে আছি এই দেখলেই বা কি হ'ল? ভুরুর মধ্যে আগুনের শিখা দেখলেই বা কি?

শুনলাম বেলা ছ'টার পরে স্বামিজীর দেখা পাওয়া যাবে। পাশের একটা ঘরে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। আরও এক জন বৃদ্ধ সেখানে ছিলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন—দেখ ত বাবা—এই তোমরাও ত ছেলে। আর আমার হতচ্ছাড়া ছেলেটা পালিয়ে এসে বাড়ি থেকে এই সন্নিসির দলে যোগ দিয়েচে। এখানে ত এই খাওয়া, এই থাকা। যাত্রার দলের মত এক ঘরে একশো লোক শোয়। ছেলেটা হাঁড়ির হাল হয়েচে—আগে একবার ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম—তা যায় নি। এবার আমি আসচি শুনে কোথায় পালিয়েচে হতভাগা। আহা, কোথায় খাচ্চে, কি হচ্চে—ওদিকে বাড়িতে ওর মা অন্নজল ছেড়েছে। ওই সন্নিসির দলই তাকে সরিয়ে রেখেচে কোথায়। আজ তিন দিন এখানে বসে আছি—তা ছোঁড়া এল না। এরা তলায় তলায় তাকে খবর দিচ্চে। আবার আমার ওপর এদের রাগ কি? বলচে—ছেলে তোমার মুক্তির পথে গিয়েচে, বিষয়ের কীট হয়ে আছ তুমি, আবার ছেলেটাকে কেন তার মধ্যে ঢোকাবে? শোন কথা। ওদের এখানে বিনি পয়সায় চাকর হাতছাড়া হয়ে যায় তা হ'লে যে! আমায় এই মারে ত এই মারে। দু'বেলা অপমান করছে।

—কোথা থেকে আপনার ছেলে এদের দলে এল?

—এই সন্নিসির দল গেছল আমাদের মাদারিপুরে। খুব কীর্ত্তন

ক'রে, ভিক্ষে ক'রে, শিষ্য-সেবক তৈরি ক'রে বেড়ালে ক'দিন! সেখান থেকে ছেলেটাকে ফুস্‌লে নিয়ে এসেচে। পয়সা হাতে থাকত আমার, ত ব্যাটারা খাতির করত। এখানে খেতে দেয় না; ওই বাজারের হোটেল থেকে খেয়ে আসি। একটু এই দালানটাতে রাত্রে শুয়ে থাকি, তাও দু-বেলা বলচে—বেরো এখান থেকে। ছোঁড়াটা ফিরে আসবে, সেই আশায় আছি।

স্বামিজীর সঙ্গে দেখা হ'ল না। দেখার ইচ্ছেও আর ছিল না।

সন্ধ্যার পরে ষ্টীমারে পার হয়ে বেলুড়ে এলাম; মনে কত আশা নিয়ে গিয়েছিলাম ওবেলা। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার যেখানে ভাল নয়, সেই জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গোপীনাথ জিউএর পূজোর সময় যা দেখেচি, হীরু ঠাকুরের প্রতি তাদের ব্যবহার যা দেখেচি—সেই সব একই যেন।

দিন দুই পরে ছোটবউঠাকৃরুণের বাপের বাড়ি থেকে বড় ভাই তাঁকে নিতে এল। আমার সঙ্গে দশ-পনের দিন দেখা হয়নি, ভাবলুম যাবার সময় একবার দেখা করবই। দুপুরের পরে ঘোড়ার গাড়ীতে জিনিষপত্র ওঠানো হচ্চে, আমি নিজের ঘরে জানালা দিয়ে দেখচি আর ভাবচি ওঠবার সময় গাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়াব, না ওপরে গিয়ে দেখা ক'রে আসব?

পায়ের শব্দে পেছনে চেয়ে দেখি ছোটবৌঠাকৃরুণ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে, রোগশীর্ণ মুখ, হাতায় লাল পাড় বসানো ব্লাউজ গায়ে, পরণে লালপাড় শাড়ী। আমি থতমত খেয়ে বললাম—আপনি! আসুন, এই টুলটাতে—

তিনি মৃদু, সহজ সুরে বললেন—খুব ত এলেন দেখা করতে।

—আমি এখুনি যাচ্ছিলাম, আপনি এলেন, তাই নইলে—

ছোটবৌঠাকরুণ ম্লান হেসে বললেন—না, নিজেই এলাম। আর আপনার সঙ্গে কি দেখা হবে? আপনি ত পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবেন। বি-এ পড়বেন না?

আমি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললাম—ঠিক নেই, এখানে হয়ত আর আস্‌ব না।

তিনি বললেন—কেন আর এখানে আসবেন না?

আমি কোন কথা বললাম না। দু-জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন—আপনার মত ছেলে যদি কখনও দেখেচি! আগে যদি জানতাম তবে সেবার আপনাকে নিয়ে যে ওরা ঠাট্টা করেছিল, আমি তার মধ্যে যাই? এখন সে-কথা মনে হ'লে লজ্জায় ইচ্ছে হয় গলায় বঁটি দিয়ে মরি।

তারপর গভীর স্নেহের সুরে বলিলেন—না, ওসব পাগলামি করে না, আসবেন এখানে, কেন আসবেন না, ছিঃ—

দরজার কাছে গিয়ে বললেন—না এলে বুঝবো আমায় খুব ঘেন্না করেন, তাই এলেন না।

৭

দাদা কালীগঞ্জে একটা বাতাসার কারখানায় কাজ করে। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি, কিছু টাকার দরকারও ছিল, কারণ কলেজের কিছু বাকী মাইনে ও পরীক্ষার ফি-এর টাকার অভাব হওয়াতে শৈলদি লুকিয়ে ষোলটা টাকা দিয়েছিল। যাবার আগে সে-টাকাটা তাকে দিয়ে যাওয়া দরকার, যদিও সে চায় নি। বাঁশবেড়ের

ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে যাব, খেয়ার নৌকা আস্‌তে দেরি হচ্ছে, আমি প্রকাণ্ড একটা পুরোনো বাঁধাঘাটের সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করচি। ঘাটের ওপরে একটা জীর্ণ প্রাচীন শিবমন্দির, তার ফাটলে ফাটলে বট অশ্বত্থের গাছ, মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলটা পশ্চিমে হেলে-পড়া সন্ধ্যার সূর্য্যের আলোয় মনে হচ্ছে যেন সোনার। ভারি ভাল লাগছিল মন্দিরটা, আর এই জনবিরল বাঁধাঘাট। ওই মন্দিরে যদি আরতি হ'ত এই সন্ধ্যায় বন্দনারত নরনারীর দল ওই ভাঙা চাতালে দাঁড়িয়ে রইত—তবে আমার আরও ভাল লাগ্‌ত। কথাটা ভাব্‌চি, এমন সময়ে আমার শরীরটা যেন কেমন ক'রে উঠ্‌ল, কানের পাশটা শির্‌শির্ করতে লাগলো। হঠাৎ আমার মনে হ'ল এই ঘাটের এই মন্দিরে খুব বড় একজন সাধুপুরুষ আছেন, তাঁর দীর্ঘ চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, প্রসন্ন হাসিমাখানো মুখ। আমি তাঁকে দেখ্‌তে পেলাম না। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি অনুভব করলাম। তিনি এখানে অনেক দিন আছেন, ভাঙা ঘাটের রানায় ব'সে ওপারের উদিতমান পূর্ণচন্দ্রের দিকে চেয়ে এই সন্ধ্যায় তিনি উপাসনা করেন—এবং তিনি কারও ওপর রাগেন না। কত লোক না-বুঝে ঘাটের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে, তিনি সদাই প্রসন্ন, সকলের ওপরে সদাই স্নেহশীল।

এ-রকম যখন হয়, তখন আমার শরীর যেন আমার নিজের থাকে না—নয়ত আমার সাধারণ অবস্থা থাক্‌লে জিগ্যেস্ করতুম অনেক কথাই তাঁকে। একটু পরে খেয়া নৌকা এল—অনিচ্ছার সঙ্গে ঘাট ছেড়ে নৌকোতে উঠলাম। জায়গাটা পবিত্র প্রভাবে ভরা—এমন একটা প্রভাব, যা সে-দিন বরানগরের বাগান-বাড়ির সেই সাধুর কাছে গিয়ে অনুভব করি নি।

দাদা আমায় দেখে খুব খুশী হ'ল। ওর চেহারা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে, ছেলেবেলাকার দুধে-আল্‌তা রঙের সেই সুশ্রী বালককে দাদার

মধ্যে আর চিনে নেওয়া যায়না। একে লেখাপড়া শিখ্‌লে না, তার ওপরে এই সব পাড়াগাঁয়ে, চাকুরি ক'রে বেড়াস—চেহারায়, বেশভূষায়, কথাবার্ত্তায়, দাদা হয়ে গিয়েচে যেন কেমন। তেম্‌নি ধরণের লোকের সমাজে সর্ব্বদা চলে ফেরে।

রাত তখন প্রায় ন'টা, দাদা ফিরে এসে রান্না চড়ালে। কি বিশ্রী জায়গাতেই থাকে। বাতাসার কারখানাটা একটা প্রকাণ্ড লম্বা চালাঘর—ছ-সাতটা বড় বড় উনুনে দিনরাত গন্‌গনে আগুন—বড় বড় কড়ায় গুড়ের রস আর চিনির রস তৈরি হচ্ছে। এই কারখানায় অত আগুনের তাতে থাকা কি দাদার অভ্যেস আছে কোনকালে!

দাদা নিজেই রান্না চড়ালে। আমায় বললে—খিচুড়ী খা'বি জিতু? বেশ ভাল মুগের ডাল আছে—ভাঁড়ে দেখি ঘি আছে বোধ হয় একটু—

দাদার বাসা ছোট একখানা চালাঘর। মেঝের ওপর শোয়, বিছানা পাতাই থাকে, কোনকালে তোলা হয় না, তবে খুব ময়লা নয়—আমরা ক' ভাইবোন্ ময়লা জিনিষপত্র মোটেই ব্যবহার করতে পারিনে, ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেস্। বিছানার ওপরকার কুলুঙ্গিতে পুরোনো খবরের কাগজ পাতা, একখানা ভাঙা পারা-বার-হওয়া আর্সি, আর একখানা শিঙের চিরুণী।

দাদা ছিল আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ছেলেমানুষ, সব চেয়ে আনাড়ি, তাকে এখন নিজে রান্না ক'রে খেতে হচ্চে! অথচ কি-ই বা জানে ও সংসারের, কি কাজই বা পারে?

রান্না চড়িয়ে দাদা বললে—ভাল কথা, দাঁড়া জিতু, তোর জন্যে একখানা ইংরিজি বই রেখে দিইচি—বের করে দি—

টিনের ছোট তোরঙ্গ খুলে একখানা মোটা ইংরিজি বই আমার হাতে দিয়ে বললে—এখানে সাতু বাবু কণ্ট্রাক্টর আসে বাতাসা নিতে,

সে ফেলে গিয়েছিল আর ফিরে আসে নি। আমি তুলে রেখে দিইচি, ভাব্‌লাম জিতু পড়বে—

পাতা উল্টে দেখি একটা বিলিতি ষ্টীল কোম্পা... মূল্যতালিকা—খুব চমৎকার পাতা, চমৎকার ছাপা, বাড়িঘর, ... পুল, কড়ি-বরগার ছবিতে ভর্ত্তি। দাদার ওপরে দুঃখ হ'ল, বেচারি ... পড়তে পারে না, বুঝতেও পারে না—ভেবেচে কি অপূর্ব্ব বই-ই না জানি।

আমি কিছু না ব'লে বইখানা আমার পুঁটুলিতে বেঁধে নিলাম। দাদা ততক্ষণে তোরঙ্গ হাতড়ে আর একখানা ছোট ছেলেদের গল্পের বই বার ক'রে বললে—আর এই স্যাথ্‌ একখানা বই, ভারি মজার মজার গল্প—আমি খেয়ে দেয়ে রোজ একটুখানি করে পড়ি—'খোঁড়া শিকারী'র গল্পটা পড়ছিলাম, পড় দেখি শুনি?

এ-সব গল্প ইংরিজিতে কতবার পড়েচি, আমার কাছে এর নতুনত্ব নেই কোথাও। তবুও দাদাকে পড়ে পড়ে শোনাতে লাগলাম, দাদা মাঝে মাঝে খিচুড়ীতে কাটি দিয়ে দেখে, আর হাঁটু-দুটো দু-হাতে জড়িয়ে একটুখানি পেছনে হেলান দিয়ে ব'সে আমার মুখের দিকে আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে শোনে। আমার এমন কষ্ট হ'ল! এ-সব গল্প যে ইংরাজি স্কুলের নীচের ক্লাসের ছেলেরাও জানে! আহা, দাদা বড় অভাগা, অল্প বয়সে সংসারের চাপ ঘাড়ে পড়ে সারাজীবনটা ওর নষ্ট হয়ে গেল।

টাকার কথাটা দাদাকে বলতে মন চাইল না। ওর কত কষ্টে রোজগার করা পয়সা; একটা-আধটা নয়, ষোলটা টাকা—এগারো টাকা মাসে মাইনে পায়—ওর দেড় মাসের রোজগার কোথা থেকে দেবে? শৈলদির টাকা আমি এর পরে যে ক'রে হয় শোধ দেবো।

দাদা নিজেই বল্‌লে—বাড়ি যাবি তো জিতু, গোটাদশেক টাকা নিয়ে যা। আমার বড্ড ইচ্ছে, সীতাকে একছড়া হার গড়িয়ে দি—কিন্তু টাকাই জমে না হাতে। তোর টাকার যদি দরকার থাকে, তবে

আলাদা-করা হারের জন্যে কুড়িটা টাকা তোলা আছে—তাই থেকে নিয়ে যা, দেবো এখন। হার এর পরে দেখব—সাতপাঁচ ভেবে টাকা নেওয়াই ঠিক করলাম। শৈলদির ওপর বড় জুলুম করা হয়, নইলে শৈলদিকে মনে হয় না যে সে পর। এত আপনার মত ক'জন আপনার লোকই বা দেখে? মায়ের পরেই শৈলদিকে ভক্তি করি। সে লুকিয়ে টাকা দিয়েচে—তাকে আর বিপন্ন ক'রবো না।

যে দাদা সকাল আটটার কমে বিছানা থেকে উঠত না, তাকে ভোর পাঁচটার সময় উঠে কারখানায় গিয়ে কাজে লাগতে হয়। আমিও দাদার সঙ্গে গেলাম। কারখানার মালিকের নাম মতিলাল দাস, বয়েস পঞ্চাশের ওপর, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী আছে সংসারে, আর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে-মেয়ে। দাদা মতিলালের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে মাসীমা ব'লে ডাকে। মতিলাল আমায় দেখে বল্‌লে—তুমি নিতাই ঠাকুরের ভাই? বেশ, বেশ। আজকাল কি বই পড়ায় তোমাদের?

তার প্রশ্ন শুনে আমার হাসি পেল। আমি জবাব দেবার আগেই মতিলাল বল্‌লে—আমাদের সময়ে যে-সব বই পড়ানো হ'ত, আজকাল কি আর সে-সব বই আছে? এই ধর পদ্যপাঠ, তৃতীয় ভাগ, যদুবাবুর। আহা!

কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ উষ্ট্র সারি সারি
কি আশ্চর্য্য শোভাময় যাই বলিহারি

কি সব শব্দ লাগিয়েচে দেখেচ একবার? ভাষার জ্ঞান হ'ত কত পড়লে? বলো দিকি, ন্যুব্জদেহ মানে কি? আমাদের হরিশ পণ্ডিত পড়াত কান্‌লার স্কুলে, আমি তখন ছাত্রবৃত্তি পড়ি। তখন ছাত্রবৃত্তি পড়লে মোক্তার হ'ত, দারোগা হ'ত। এখন হয়েচে তো সব ছেলেখেলা।

আমি এসেচি শুনে মতিলালের স্ত্রী দুপুরে খেতে বল্‌লে। আমায়

দেখে বল্‌লে—এস বাবা, তুমি নিতাইয়ের ভাই ? তুমিও মাসীমা ব'লে ডেকো। কাছে দাঁড়িয়ে থেকে মাসীমা দাদাকে রান্না দেখিয়ে দিতে লাগ্‌ল, কারণ আমরা খেতে চাইলেও ওরা রেঁধে আমাদের খেতে দেবে কেন ?

মাসীমা সংসারে নিতান্ত একা। মতিলালের ও-পক্ষের ছেলেমেয়েরা বাপের তৃতীয় পক্ষের পরিবারকে দু-চোখ পেড়ে দেখ্‌তে পারে না, বা এখানে থাকেও না কেউ। অথচ মাসীমার ইচ্ছে তাদের নিয়ে মিলে-মিশে সংসার করা। আমরা খেতে বস্‌লে কত দুঃখ করতে লাগ্‌ল।

—এই গ্যাখো বাবা, কেষ্টকে বলি' বৌমাকে নিয়ে এখানে এস, এসে দিব্যি থাক। বৌমাটি বড় চমৎকার হয়েচে। তা যদি আসে! সেই নিয়ে রেখেচে শ্বশুরবাড়ি, কাল্‌নার কাছে দাঁইহাট—সেখানেই থাকে। আমার নিজের পেটে ত হ'ল না কিছু, ওরাই আমার সব—তা এ মুখো হয় না কেউ। বড় মেয়ে দুটি শ্বশুরবাড়ি আছে, আন্‌তে পাঠালে বলে, সৎমায়ের আর অত আত্যিস্থ্যে দেখাতে হবে না। শোন কথা। আমায় মা ব'লে কেউ ডাকেও না। ডাক্‌লে তাঁদের মান যাবে।

মাসীমাকে খুশী করবার জন্যে আমি কারণে-অকারণে খুব 'মাসীমা' 'মাসীমা' ব'লে ডাক্‌তে লাগলাম। আমাদের পাতে আবার মাসীমা খেতে বস্‌লেন, বল্‌লেন—ব্রাহ্মণের পেরসাদ পাবো, ওতে কি আর ছোট বড় আছে বাবা ?

আমার মনে অস্বস্তি হ'ল ; আমি ত এঁদের এসব মানি নে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন করি নে, সে কথা ত ইনি জানেন না। অথচ খুলে বললে মাসীমার মনে কষ্ট দেওয়া হবে হয়ত।

দাদার কাছ থেকে আটঘরায় এলাম। আস্‌বার সময় সীতার জন্যে ভাল সাবান কিনে নিয়ে এলাম, বই পড়তে ভালবাসে ব'লে

দু-তিনখানা বাংলা বইও আন্‌লাম। সীতা বড় হয়ে উঠেচে—মাথায় খুব লম্বা হয়েচে, দেখতে সুন্দর হয়েচে আরও।

আমার হাত থেকে সাবান নিয়ে হেসে বললে—দেখি দাদা কেমন সাবান···আমার একখানাও আস্ত সাবান ছিল না। একখানা সান্‌লাইট সাবান আনিয়েছিলুম বাজার থেকে—সে আধখানা হয়ে গিয়েচে।

সীতার সে পুরোনো অভ্যাস এখনও আছে, কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ খোঁপায় হাত দিয়ে দেখে ঠিক আছে কি-না। লম্বা ঢেঙা, চওড়া নক্সা-পাড় কাপড় পরনে, খোঁপার ধরনও আজকাল শহরে দেখে এসেচি ও-রকম খোঁপা উঠে গিয়েচে। ও-ধরনের কাপড় পড়লে সেখানে লোকে হাসবে, বেচারী সীতা! লেখাপড়া শিখবার, বই পড়বার ওর কত আগ্রহ! অথচ এই পাড়াগাঁয়ে পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি ক'রেই ওর জীবন কাটল। না হ'ল লেখাপড়া শেখা, না মিটল কোন সাধ। অথচ ওর বুদ্ধি ছিল এত চমৎকার, মিশনরী মেমেরা কত প্রশংসা করত, ওকে কি ভালই বাস্‌ত মিস্ নর্টন। কিন্তু কি হ'ল ওর? এখনও সেই কত কাল আগেকার পুরোনো বইগুলোই পড়চে, কিছুই শেখেনি, কিছুই দেখেনি।

সীতা বল্‌লে—দাদা পাস করেচ?

—পাসের খবর এখনও বেরোয় নি। পাস করবো ঠিকই।

—পাস হ'লে আমায় জানিও দাদা। আমি তোমাকে একটা জিনিষ প্রাইজ দেবো!

—কি জিনিষ রে?

—একটা মনিব্যাগ বুনচি লাল উলের। তোমার জন্যে একটা, বড়দার জন্যে একটা। তোমাদের নাম লিখে দেবো। মিস্ নর্টন আমাদের দিত কত কি প্রাইজ—না?

—মিস্ নর্টনকে তোর মনে আছে সীতা? তুই তো তখন খুব ছোট।

—খুব মনে আছে, তার দেওয়া জিনিষ আমার বাক্সে এখনও রয়েচে। দেখলেই তাদের কথা মনে পড়ে।

জ্যাঠামশায় আমায় ডেকে বল্‌লেন—জিতু শোনো। এখন তুমি বড় হয়েচ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করাই ভাল। সীতার বিয়ে না দিলে নয়। ওর পনের-ষোল বছর হ'ল, আর রাখা যায় না। কিন্তু এদিকে টাকাকড়ি খরচ করবে কে? হাজার টাকার কমে আজকাল ভদ্রলোকের ঘরের বিয়ের কথাই তোলা যায় না। দেখে এসেচ ত শহর-বাজারে? তা আমি এক জায়গায় ঠিক করেচি; পাত্রটির বাপ আমার এখানে এসেছিল। জমিজমা আছে, চাষী গেরস্ত, খেতে-পরতে কষ্ট পাবে না। আখের চাষই আছে অমন বিশ-বাইশ বিঘে। পাত্রটি চাষবাস দেখে, রং একটু কালো—তা হোক, পুরুষ মানুষের রঙে কি আসে যায়, তবে বংশ ভাল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, সবে তিন পুরুষে ভঙ্গ, আমাদেরই স্বঘর।

আমি বল্‌লাম—লেখাপড়া কতদূর করেচে?

—লেখাপড়া কি আর এম-এ, বি-এ পাস করেচে? তবে বাংলা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়েচে; দিব্যি হাতের লেখা। হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে যাচ্চি,—অল্পদিন হ'ল পাত্রটির প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গিয়েচে—তবে সে কিছু নয়, বয়েস কমই। একটি বুঝি ছেলে আছে ও-পক্ষের।

ছাত্রবৃত্তির কথায় আমার মতিলালের উটের কবিতাটি মনে পড়ল। আমি বললাম—আচ্ছা আমি ভেবে বলব জ্যাঠামশাই। লেখাপড়া জানে না আর তাতে দোজবরে, এতে বিয়ে দেওয়া আমার মন সরে না। সীতার মত মেয়ে, আপনিই বলুন না জ্যাঠামশাই?

জ্যাঠামশায় নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না—তিনি

এ-অঞ্চলের মানী ব্যক্তি, আগের চেয়ে বিষয়-আশয় টাকাকড়ি এখন তাঁর আরও বেশী, এদিকের সব লোক তাঁকে খাতির করে চলে, কেন্ বা তিনি প্রতিবাদ সহ্য করবেন? সে জানি এ গাঁয়ের রাম বাঁড়ুয্যের ব্যাপারে। রাম বাঁড়ুয্যে কি জন্যে রাত্রে আফিম খেয়ে শুয়েছিল— সকালে উঠে খবর পেয়ে জ্যাঠামশায় গেলেন। রাম বাঁড়ুয্যে ছিল জ্যাঠামশাইয়ের খাতক। জ্যাঠামশায় গিয়ে কড়া সুরে বললেন—কি হয়েচে রাম? রাম বাঁড়ুয্যে তখন কথা বলতে পারচে না— জ্যাঠামশায়ের কথার উত্তর সে দিতে পারলে না। জ্যাঠামশায় ভাবলেন, রাম বাঁড়ুয্যে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখিয়ে ইচ্ছে করেই কথার উত্তর দিচ্চে না। বললেন—ভাল ক'রে কথার উত্তর দাও—কার সামনে কথা বল্‌চ জান না? সঙ্গের সব লোক বললে—হ্যাঁ, কর্ত্তা যা বলেচেন, জবাব দাও ওঁর কথার। কিন্তু রাম বাঁড়ুয্যে জ্যাঠামশায়ের চোখরাঙা-নির চৌহদ্দি পার হয়ে চলে গেল ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যেই—কি জন্যে সে আফিম খেয়েছিল কেউ জানে না—তার মৃত্যুর পরে জ্যাঠামশায় তার ভিটেমাটি বিক্রী ক'রে নিয়ে নিলেন—তার বিধবা স্ত্রী নাবালক একটি মাত্র মেয়ের হাত ধরে ভাইদের দোরে গিয়ে পড়লো। আমি যেবার ম্যাট্রিক দিই, সে বছরের কথা।

আমার কথার উত্তরে জ্যাঠামশায় আমায় অনেকগুলো কথা শুনিয়ে দিলেন। আমাদের এদিক নেই, ওদিক আছে। রাজামহারাজাদের ঘরে বোনের বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলেই ত হয় না, পয়সা চাই। পনের-ষোল বছরের মেয়ে গ্রামে সমাজের মধ্যে বাস করতে গেলে আর ঘরে রাখা চলে না। তা ছাড়া তিনি কথা দিয়ে ফেলেচেন—তাঁর কথার মূল্য আছে ইত্যাদি।

জ্যাঠামশায়দের বাড়ির জীবনযাত্রার ধারা সেই পুরোনো দিনের মতই চলেচে। এখানে এলেই বুঝি এদের মন নানাদিক থেকে কতভাবে

শৃঙ্খলিত। বাড়িতে এতটা জমি রয়েচে, ঠাকুরপূজার উপযোগী ছোট্ট একখানা গাঁদা ও করবী ফুলের বাগান ছাড়া আর কোথাও একটা ফুলের গাছ নেই। উঠোনের কোন জায়গায় এরা কোথাও একটু সবুজ ঘাস রাখবে না—মেজকাকার কাজ হচ্চে একটুকু কোথাও ঘাস গজালে তখনি নিজের হাতে নিড়েন ধরে উঠিয়ে ফেলা—প্রকাণ্ড উঠোন চাঁচাছোলা, সাদা মাটি বার করা, সবুজের লেশ নেই। ব'লে দেখেচি এরা তা বোঝেই না। সাম্‌নের উঠোনটা লাউ-মাচা, পুঁই-মাচায় ভরা —প্রত্যেক জায়গাটুকুতে তরকারী লাগিয়েচে, নয়ত মান-কচুর ঝাড়।

একদিন জ্যাঠামশায়ের ছেলে হারুদাকে বল্‌লাম—আমি শ্রীরামপুর থেকে ভাল মরসুমী ফুলের বীজ এনে দেবো আর এক রকম লতা আছে আমাদের কলেজে, চমৎকার নীল ফুল ফোটে। বাড়ির সাম্‌নেটা বাগান করো আর চণ্ডীমণ্ডপের চালে সেই লতা উঠিয়ে দাও—

হারুদা বল্‌লে—তোমার যেমন বুদ্ধি, ফুলগাছে কি দুধ দেবে শুনি? মিছিমিছি জায়গা জোড়া—চণ্ডীমণ্ডপের চালে ফি-বছর ত্রিশ চল্লিশখানা চালকুমড়া হয় জানিস্ তা?

অর্থাৎ আহারের আয়োজন হ'লেই হ'ল, আর কিছু দরকার নেই এদের।

মেজকাকার ঘরে একদিন শুয়েছিলাম, কাকীমা এখানে নেই—মেজকাকার আবার একলা শুতে ভয় করে, তাই আমাকে শুতে বলেছিলেন। সারাদিন গরমে পরে অনেক রাত্রে এক পসলা বৃষ্টি হ'ল—কি সুন্দর ভিজেমাটির গন্ধ আসতে লাগল—মেজকাকা দেখি উঠে তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করচেন। আমি বল্‌লাম—বন্ধ করচেন কেন মেজকাকা, বেশ ভিজে হাওয়া আস্‌চে—

মেজকাকা বল্‌লে—উহুঁ, উহুঁ—ঠাণ্ডা লাগবে—শেষরাতের বিষ্টির হাওয়া বড় খারাপ, কাল সর্দ্দি ধরবে—আমার ধাতই একে সর্দ্দির।

দুপুরে সীতার সম্বন্ধে মাকে বললাম। মায়ের ইচ্ছে নয় ওখানে সীতার বিয়ে দেওয়া, তবে মা নিরুপায়, এ বাড়িতে তাঁর কোন কথা খাটে না। আমি বললাম—আমি কোথাও চাকরী খুঁজে নি মা। সীতার বিয়ে নিজে থেকে দেব।

মা বললেন—শোন কথা ছেলের। তুই লেখা-পড়া ছেড়ে এখন করবি কি ? তোদের মুখের দিকে চেয়ে এখানে কষ্ট করেও পড়ে থাকি। নিতুর ত কিছু হ'ল না, তুই বি-এ টা পাস কর্। সীতার কপালে যা থাকে হবে। তুই এখন চাকরিতে কত টাকা পাবি যে সীতার বিয়ে দিবি নিজে ? মাঝে পড়ে তোর পড়াটা হবে না। আর শোন্, এ নিয়ে কোন কথা যেন বলিস্ নে কারুর সঙ্গে। তোর জ্যাঠাইমা শুন্‌তে পেলে রক্ষে রাখবেনা।

মা এত ভয় করেও চলেন ওদের! প্রথম জীবনে কোন কষ্ট পান নি, তারপর চা-বাগান থেকে এসে দুঃখের মধ্যে পড়ে গিয়ে এমন ভীতু হয়ে উঠেচেন! সদাই ওঁর ভয় থাকে জ্যাঠাইমা ওঁদের দু-জনকে এ বাড়িতে জায়গা দিতে না চাইলে আমার লেখা-পড়া না হয়। সীতার বিয়ে নিয়ে দাদা জড়িয়ে পড়ে—এই সব।

সীতাকে জলে ফেলে দিতে পারব না, মা যাই বলুন।

জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে বেশীক্ষণ থাক্‌লে আমার হাঁপ লাগে। গাঁয়ের বাইরে নির্জ্জন মাঠে গিয়ে বসে ভাবি সীতার সম্বন্ধে কি করা যায়। কিন্তু হঠাৎ কেমন ক'রে অন্য চিন্তা এসে পড়ে। এই রৌদ্রালোকিত দুপুরে একা বস্‌লেই তাঁর কথা আমার মনে পড়ে। মন থেকে দূর করতে পারি নে। প্যালেষ্টাইনের উষর, পর্ব্বতময় মরুদেশের রৌদ্র—সারা গায়ে ঘাম ঝরচে তাঁর, রোদে মুখ রাঙা, নিজের ভারী ক্রুশটা নিজেই বয়ে চলেছেন বধ্যভূমিতে। পিছনের অন্ধজনতা জানে না যে ঝড়ে গ্যালিলির সমুদ্রের নোনা জলে দুকূল ছাপিয়ে মাঝে মাঝে

যে তরঙ্গ ওঠায়, তাও তুচ্ছ হয়ে যাবে সে বৃহত্তর তুফানের কাছে, আজকার দিনটি জগতে যে তুফান তুল্‌বে। তারা জানে যে মানুষের মনে ব্যথা না দেওয়ার চেয়ে বড় আচার নেই, প্রেমের চেয়ে বড় ধর্ম্ম নেই। তাঁর আবির্ভাব কে ব্যর্থ করবে? ঐ বজ্র-বিদ্যুতের মত শক্তিমান্ তাঁর বাণী। বিষ্ণুর সুদর্শন যে শক্তির প্রতীক্। নিত্যকালের দেবতা তাঁরা, দেশের অতীত, কালের অতীত, সকল দেশের, সকল অবতারের স্বগোত্র।

তারপর আমি যেন কোথায় চলে গিয়েচি। সেখানে নদী, মাঠ, বন সবই আছে, কিন্তু সবই যেন ঝাড়-লণ্ঠনের কাঁচের পরকলার মধ্যে দিয়ে দেখচি। রাত কি দিন বুঝতে পারলাম না, মাথার ওপরকার আকাশে তারা নেই। অথচ সূর্য্যও দেখলাম না আকাশে। আমি যেন সেখানে বেশ সহজ অবস্থাতেই আছি। একটু পরেই মনে হ'ল সে জায়গাটাতে আমি অনেক বার গিয়েচি, নতুন নয়, ছেলেবেলা থেকে কতবার গিয়েচি। একটা বাড়ি আছে সেখানে, বাড়িতে যারা আছে তারা আমার সঙ্গে গল্প করে, কত কথা বলে—স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন মনে হয় তারা আমার খুব পরিচিত। কত বার তাদের দেখেচি। সেখানে গেলেই আমার মনে পড়ে যায় সেখানকার পথ-ঘাট, ওইখানে মাঠের মধ্যে একটা পুরোনো বাড়ি আছে ওর ওপাশে সেই বনটা। সেখানে যেমনি যাই, মজা এই যে অম্‌নি মনে হয় এ তো নতুন নয়, সেই যে একবার ছেলেবেলার চা-বাগানে থাকতে এসেছিলাম! কিন্তু সে দেশটা যেন অন্য রকম, যখন সেখানে থাকি তখন স্বাভাবিক মনে হ'লেও, পরে মনে হয় সেটা ওই পৃথিবীর মত নয়।

সেখানে আমি কতক্ষণ ছিলাম জানি না—উঠে দেখি গাছ ঠেস্ দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু এত ঘুম ঘুমিয়েচি—উঠে চোখ মুছে চারিদিকে চেয়ে দেখি প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেচে। কেবল এইটুকু

আমার মনে ছিল স্বপ্নের দেশে কাকে যেন জিগ্যেস্ করেছিলুম—বটগাছের একটা সুন্দর ঠাকুর আছেন, শুনেচি বিষ্ণুমূর্ত্তি, আমার বড় ভাল লাগে—জ্যাঠাইমারা পূজো করেন না কেন? ঘুম কি সত্যি, কিছুই বুঝ্‌তে পারলুম না। মনের সে আনন্দটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ছিল।

জ্যাঠামশাইরা কি-একটা মোকদ্দমার সাক্ষীসাবুদ দু-তিন দিন ধরে চণ্ডীমণ্ডপে তালিম দিয়ে শেখালেন। যে কেউ শুন্‌লে বুঝতে পারতো যে এরা সে-সব জায়গায় যায়নি, কস্মিনকালেও—সে-সব ঘটনা দেখেও নি—এঁদের খামার-সংক্রান্ত কি-একটা দখলের মামলা।

একদিন শুনলাম মামলায় এঁরা জিতেচেন—আবার সেই ব্যাপার দেখলুম বাড়িতে। গৃহদেবতার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠলেন সবাই—মহাসমারোহে পূজা হ'ল, সপক্ষের যারা সাক্ষী ছিল, তাদের পরম যত্নে তোয়াজ ক'রে খাওয়ালেন। খাওয়ান তাতে ক্ষতি নেই—কিন্তু দেবতাকে এর মধ্যে জড়ান কেন?

এঁরা ভাবেন কি যে দেবতা তাঁদেরই বাঁধা, হাতধরা—ওঁদের মিথ্যাকে অবিচারকেও সমর্থন করবেন তিনি ভোগ নৈবিদ্যের লোভে?

জ্যাঠাইমা যখন ব্যস্ত হ'য়ে গরদের শাড়ি প'রে পূজার আয়োজনে ছুটোছুটি করছিলেন, তখন আমার ভারি রাগ হ'ল—আজকাল এসব মূঢ়তা আমার আদৌ সহ্য হয় না, ছেলেবেলার মত ভয়ও করিনা আর জ্যাঠাইমাকে—ভাবলুম এ নিয়ে খুব তর্ক করি, দু-কথা শুনিয়ে দেবো, তাতে ওঁদের উপকারই হবে—দেবতাকে নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ হবে—কিন্তু সীতা ও মায়ের কথা ভেবে চুপ ক'রে রইলুম।

মাস দুই হ'ল চাকুরি পেয়েছি কল্‌কাতায়। এ চাকুরি পাওয়ার জন্যেও, আমি শৈলদির কাছে কৃতজ্ঞ। শৈলদির স্বামীর এক বন্ধুর যোগাযোগে এটা ঘটেচে। যাদের বাড়ি চাকরি করি, এরা বেশ বড় লোক।

বাড়ির কর্ত্তা নীলাম্বর রায় হাওড়া জেলার কি একটা গ্রামের জমিদার এবং সেখানকার তাঁদেরই পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত এক মঠের বর্ত্তমান মালিক—এঁদের মঠের অধীনে একটা ধর্ম্মসম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেচে গত ষাট-সত্তর বছরে এবং এঁরাই সেই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এই তিন জেলাতে এই সম্প্রদায়ের লোক যত বেশী, অন্য জেলাতে তত নয়। ওঁদের কাগজপত্র ও দেশের নায়েবের সঙ্গে ওঁদের যে চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েচে—তা থেকেই আমি এ-সব সংবাদ জান্‌তে পারলাম অল্পদিনের মধ্যেই। এঁদের প্রধান আয় বৈশাখ মাসে মঠবাড়ির মহোৎসব থেকে—নানা অঞ্চল থেকে শিষ্যসেবকের দল জড় হয়ে সেই সময় বার্ষিক প্রণামী, পূজা, মানত শোধ দেয়—তা ছাড়া বিবাহ ও অন্ন-প্রাশনের সময়ও মঠের গদিতে প্রত্যেক শিষ্যের কিছু প্রণামি পাঠিয়ে দেওয়া নিয়ম।

নীলাম্বর বাবুর তিন ছেলেই ঘোর সৌখীন ও উগ্র ধরনের শৌখীন বাবু। বড় ছেলে অজয়বাবু এঞ্জিনিয়ারীং পড়েছিলেন কিন্তু পাস করেন নি—মেজছেলে নবীনবাবু এম, এ পাস, ছোটছেলে অমরনাথ এখনও ছাত্র—প্রেসিডেন্সি কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ে। অজয়বাবুর বয়স পঞ্চাসের কম নয়, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে কুড়ি বছরের ছোক্‌রাও হার

মানে তাঁর সৌখীনতার কাছে—নবীনবাবুর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, লম্বা, ফর্সা, সুপুরুষ—পেছনের ঘাড় একদম ক্ষুর দিয়ে সাদা-বার-করা, চোখে চশমা—প্রায়ই পরনে সাহেবী পোষাক থাকে। বাঙালী পোষাক পরলে পরনে হাত ঢিলে-করা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী ও কোঁচানো কাঁচি ধুতি, পায়ে কালো এ্যাল্‌বার্ট জুতো।

কর্ত্তা নীলাম্বর রায়কে আমি বেশী দেখিনি। তিনি তাঁর তাকিয়া বালিশ, গড়গড়া, পিকদানী নিয়ে দোতালাতে থাকেন। কালেভদ্রে তাঁর কাছে আমার যাওয়ার দরকার হয়। বড়ছেলে অজয়বাবুই কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করেন—তাঁর সঙ্গেই আমার পরিচয় বেশী। অজয়বাবু লোক মন্দ নয়—কিন্তু নবীনবাবু ও অমরনাথের মুখে আমি প্রথম দিনেই একটা উগ্র দাম্ভিকতার ছাপ লক্ষ্য করলুম। আমি এ-ধরনের লোকের সংস্পর্শে জীবনে এ-পর্য্যন্ত আসি নি—কি জানি আমার কোন্ ব্যবহারে এরা কি দোষ ধ'রে ফেলে—সেই চিন্তা আমায় সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত ক'রে তুল্‌লে।

ওদের বাড়ি হরি ঘোষের ষ্ট্রীটে; বাড়িটার পূব দিকে একটা ছোট গলি—কিন্তু সেই দিকেই বাড়ির সদর। হরি ঘোষের ষ্ট্রীটের দিকটা রেলিং-বসানো লম্বা বারান্দা—বারান্দায় উঠবার সিঁড়ি নেই সেদিকে। রাস্তার ওপরের ছোট ঘরটাতেই আমার থাকবার জায়গা নির্দ্দিষ্ট হ'ল। এই ঘরে আমি যে একলা থাকি তা নয়, পাশাপাশি নীচু চার-পাঁচটা তক্তোপোষের ওপর ঢালা ফরাস পাতা, তার ওপর রাত্রে যে কত লোক শোয়; তার হিসেব রাখা শক্ত। এদের দেশের কাছারীর নায়েব কুঞ্জ বসু প্রায়ই আসে কলকাতায়, সে আমার পাশেই বিছানা পাতে, তার সঙ্গে একজন মুহুরি আসে, সে নায়েবের পাশে শোয়। বাড়ির দু-জন চাকর শোয় ওদিকটাতে। ওস্তাদজী ব'লে একজন গানের মাষ্টার বাড়ির ছেলেমেয়েদের গান ও হারমোনিয়ম বাজাতে শেখায়—সে আর তার একজন ভাইপো শোয় চাকরদের ও আমাদের মধ্যে। এতগুলো

অপরিচিত লোকের সঙ্গে একসঙ্গে শোয়া কখনো অভ্যেস নেই—প্রথম দিনেই এদের গল্পগুজব, হাসি-কাসি, তামাকের ধোঁয়া আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললে। সীতার মুখ মনে ক'রে সব অসুবিধাকে সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত হই।

একদিন আমি সেরেস্তা-ঘরে বসে কাজ করচি—হঠাৎ দেখি মেজবাবু ঘরে ঢুকেচেন। আমি মেজবাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। মেজবাবু চারিদিকের দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে চেয়ে বল্লেন—এ ঘরের এই ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্চে, তুমি নজর রাখ না?

মেজবাবুর সাম্‌নাসাম্‌নি হওয়া এই আমার প্রথম। আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে আমি মনে আঘাত পেলাম এবং আমার ভয়ও হ'ল। তা ছাড়া ছবি নষ্ট হওয়ার কৈফিয়ত আমি কি দেবো বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে আছি, এমন সময় মেজবাবু বাজখাঁই আওয়াজে ডাক্‌লেন—দৈতারি—

দৈতারী সেরেস্তার কালির বোতল গুণে গুণে আলমারীতে তুল্‌ছিল পাশের ঘরে, সে ঘরের পাশে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—হুজুর—

—এই উল্লুক, তুমি দেখতে পাও না ঘরের ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্চে?

দৈতারী ঘরের দেয়ালের দিকে বিপন্ন মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেজবাবু হঠাৎ আমার ডেস্ক থেকে রুলটা তুলে নিয়ে তাকে হাতে পিঠে ঘা-কতক বসিয়ে দিয়ে বল্লেন—ষ্টুপিড পাজি, বসে বসে শুধু মাইনে খাবে? এক ডজন চাকর বাড়িতে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েচে শুধু ফাঁকি দেবার জন্যে? পাড়ো ছবিগুলো এক-একখানা ক'রে—পাড়ো আমার সাম্‌নে—

দৈতারির সে রুলের ঘা যেন আমার পিঠেই পড়্‌ল। আমি ভয়ে ভয়ে দৈতারিকে ছবি পাড়তে সাহায্য করতে লাগলুম—আমি সামান্য মাইনের চাকুরি করি। মেজবাবাবু আমাকেও যেন ঠেস্ দিয়ে কথাটা

বললেন। তারপর আধঘণ্টা তিনি ঘরে দাঁড়িয়ে রইলেন—আমি ও দৈতারি তাঁর সামনে সমস্ত ছবিগুলো একে একে পেড়ে পরিষ্কার করলাম। সাহস ক'রে যেন মাথা তুলে চাইতে পারলাম না, যেন আমি নিজেই ছবির তদারক না ক'রে প্রকাণ্ড অপরাধ ক'রে ফেলেচি!

সেইদিন প্রথম বুঝলাম আমার মত সামান্য মাইনের লোকের কি খাতির—আর কি মান এদের কাছে। সীতার বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করতে পারি তবে আবার পড়বো। ছোঠবৌঠাকরুণের কথা এই সময় মনে হ'লো—শৈলদির কথাও মনে পড়ল। কত ধরনের মানুষই আছে সংসারে। অমরনাথ বাবুর বৈঠকখানা আমাদের ঘরের সাম্‌নে। খুব সৌখীন জিনিষপত্র সাজানো এবং প্রত্যেক দিনই কোন-না-কোন সৌখীন জিনিষ কেনা লেগেই আছে। সে-ঘরে রোজ সন্ধ্যার পরে বন্ধুবান্ধবেরা এসে গানের আড্ডা বসায়—কেউ ডুগি-তবলা, কেউ হার্মোনিয়াম বাজায়—গান-বাজনায় অমরনাথ বাবুর খুব ঝোঁক। সে-দিন আড়াইশো টাকার একটা গানের যন্ত্র রাখবার কাঁচের আলমারি কেনা হ'ল। তিনি কলেজের ছাত্র বটে, কিন্তু আমি পড়াশুনা করতে একদিনও দেখিনি তাঁকে। একদিন বেলা দশটার সময় অমরনাথবাবু ঘরে ঢুকে বললেন—ওহে, পাঁচটা টাকা দাও তো, আছে তোমার কাছে?

আমি প্রথমটা অবাক্ হয়ে গেলাম। আমার কাছে টাকা চাইতে এসেচেন ছোটবাবু! ব্যস্তভাবে আমার বাক্সটা খুলে টাকা বার ক'রে সসম্ভ্রমে তাঁর হাতে দিলাম। দিনকতক কেটে গেল, আর একদিন তিনটে টাকা চাইলেন। মাইনের টাকা সব এখনও পাইনি—দশটা টাকা মোটে পেয়েছিলাম—তা থেকে দিয়ে দিলুম আট টাকা। দু-তিন মাসে ছোটবাবু আমার কাছে পঁচিশটা টাকা নিলেন—বাড়ির ও আমার হাত খরচ বাদে যা-কিছু বাড়তি ছিল, সবই তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

একদিন দাদা চিঠি লিখলে—তার বিশেষ দরকার পনেরটা টাকা যেন আমি পাঠিয়ে দিই। আমার হাতে তখন মোটেই টাকা নেই। ভাবলুম, ছোটবাবুর টাকাটা দেওয়ার তো কথা এতদিনে—দিচ্চেন না কেন? বড়মানুষের ছেলে, সামান্য টাকা খুচরো কিছু-কিছু ক'রে নেওয়া, সে ওঁর মনেই নেই বোধ হয়। লজ্জায় চাইতেও পারলাম না। অগত্যা বারোটা টাকা আগাম পাওয়ার জন্যে একটা দরখাস্ত করলুম। সে-দিন আপিসে আবার বসেচেন মেজবাবু। দরখাস্ত পড়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি হবে তোমার আগাম টাকা?

মেজবাবুকে আমার বড় ভয় হয়। বল্লুম—দাদা চেয়ে পাঠিয়েচেন, হাতে আমার কিছু নেই তাই।

মেজবাবু বল্লেন—তুমি কতদিন সেরেস্তায় কাজ করচ? চার মাস মোটে? না এত কম দিনের লোককে এ্যাডভান্স দেওয়া ষ্টেটের নিয়ম নেই—তা ছাড়া তুমি তো এখনও পাকা বহাল হওনি—এখনও প্রোবেশনে আছ।

কই, চাকুরিতে ঢোক্‌বার সময় সে-কথা তো কেউ বলেনি যে আমি প্রোবেশনে বাহাল হচ্চি বা কিছু। যাই হোক্ দরখাস্ত ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। দাদাকে টাকা পাঠানো হ'লই না, এদিকে ছোটবাবুও টাকা দিলেন না, ভুলেই গিয়েচেন দেখ্‌চি সে-কথা। প্রথমে এখানে আস্‌বার সময় ভেবেছিলাম এঁরা কোন দেবস্থানের সেবায়েত, সাধু-মোহান্ত মানুষ হবেন—ধর্ম্মের একটা দিক এঁদের কাছে জানা যাবে—কিন্তু এঁরা ঘোর বিলাসী ও বিষয়ী, এখন তা বুঝচি। মেজবাবু এই চার মাসের মধ্যে এটর্ণির বাড়ি পাঠিয়েচেন আমায় যে কতদিন, কোথায় জমি নিয়ে ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সঙ্গে প্রকাণ্ড মোকদ্দমা চল্‌চে—এ বাদে কুঞ্জ নায়েব তো প্রায়ই দেশ থেকে আপীলের কেস্ আন্‌চেই। মেজবাবু মাম্‌লা-মোকদ্দমা নাকি খুব ভাল বোঝেন, কুঞ্জ নায়েব সেদিন বল্‌ছিল।

অপরে কি ক'রে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তারা কি মানে, কি বিশ্বাস করে, এ-সব দেখে বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে।

একদিন হাওড়া পুলের ওপারে হেঁটে অনেক দূর বেড়াতে গেলুম। একজায়গায় একটা ছোট মন্দির, জায়গাটা পাড়াগাঁ মত, অনেক মেয়েরা জড় হয়েচে, কি পূজো হচ্চে। আমি মন্দির দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম—দেবতার স্থান পূজা-অর্চ্চনা হ'তে দেখলে আমার বড় কৌতূহল হয় দেখবার ও জানবার জন্যে। একটা বড় বটগাছের তলায় ছোট্ট মন্দিরটা বটের ঝুরি ও শেকড়ের দৃঢ়বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—মন্দিরের মধ্যে সিঁদুর-মাখানো গোল গোল পাথর, ছোট একটা পেতলের মূর্ত্তিও আছে। শুনলাম ষষ্ঠীদেবীর মূর্ত্তি। বাড়ি থেকে মেয়েরা নৈবিদ্যি সাজিয়ে এনেচে, পুরুত ঠাকুর পূজো ক'রে সকলকে ফুলবেলপাতা নির্ম্মাল্য দিলেন—ছেলেমেয়েদের মাথায় শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন। সবাই সাধ্যানুসারে কিছু কিছু দক্ষিণা দিলে পুরুত ঠাকুরকে, তারপর নিজের নিজের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে, নৈবিদ্যির খালি থালা হাতে সবাই বাড়ি চলে গেল। কাছেই একটা পুকুর, পুরুত-ঠাকুর আমার হাতেও দুখানা বাতাসা ও ফুলবেলপাতা দিয়েছিলেন—বাতাসা দুখানা খেয়ে পুকুরে জল খেলাম—ফুলবেলপাতা পকেটে রেখে দিলাম। ছোট্ট গ্রামখানা—দূরে রেলের লাইন, ভাঙা পুকুরের ঘাটটা নির্জ্জন, চারিধারেই বড় বড় গাছে ঘেরা—শান্ত, স্তব্ধ অপরাহ্ণ—অনেক দিন পরে এই পূজোর ব্যাপারটা, বিশেষ ক'রে মেয়েদের মুখে একটা ভক্তির ভাব, পূজোর মধ্যে একটা অনাড়ম্বর সারল্য আমার ভাল লাগল।

হাওড়া-পুল পার হয়েচি, এক জায়গায় এক জন ভিখারিণী

আধ-অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে কার সঙ্গে ঝগড়া করচে আর কাঁদচে। কাছে গিয়ে দেখলাম ভিখারিণী অন্ধ, বেশ ফর্সা রং হিন্দুস্থানী—বৃদ্ধা না হ'লেও প্রৌঢ়া বটে। তার সামনে একখানা ময়লা ন্যাকড়া পাতা—সেটাতে একটা পয়সাও নেই—গোটাদুই টিনের কাল তোবড়া মগ, একটা ময়লা পুঁটুলি, একটা ভাঁড়—এই নিয়ে তার কারবার। সে একটা সাত-আট বছরের মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করচে—হিন্দীতে বল্‌চে—তুই অমন ক'রে মারলি কেন? তোকে আমি ভিক্ষে ক'রে খাইয়ে এত বড়টা করলাম আর তুই আমাকেই মার দিতে সুরু করলি—আমার কপাল পোড়া, নইলে নিজের পেটের সন্তান এমন বদ হবে কেন? দ্যাখ দিকি কি দিয়ে মারলি, কপালটা কেটে গেছে—মেয়েটা হি-হি ক'রে হাস্‌চে এবং কৌতুকের সঙ্গে রাস্তা থেকে ধুলোবালি খোয়া কুড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাকে মারছে।

আমি মেয়েটাকে একটা কড়া ধমক দিয়ে বললাম—ফের মাকে যদি অমন করবি, তবে পুলিশে ধরিয়ে দেবো। পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আনা-সাতেক পয়সা আছে—সেগুলো সব তার ময়লা নেক্‌ড়াখানায় রেখে দিয়ে বললুম—তুমি কেঁদো না বাছা—আমি আবার কাল এসে তোমায় আরও পয়সা দেবো। তোমার মেয়ে আর মারবে না। যদি মারে তো ব'লে দিও, কাল আমি দেখে নেবো—

এমন ছন্নছাড়া করুণ দুরবস্থার রূপ জীবনে কোনদিন দেখিনি। পরদিন হাওড়াপুলে গিয়েছিলাম কিন্তু সেদিন বা আর কোনদিন সেই অন্ধ ভিখারিণীর দেখা পাইনি। তাকে কত খুঁজেছি, ভগবান জানেন। প্রতিদিন শোবার আগে তার কথা আমার মনে হয়।

মনে মনে বলি, আটঘরার বটতলায় তোমায় প্রথম দেখেছিলুম ঠাকুর, তোমার মুখে অত করুণা মাখানো, মানুষকে এত কষ্ট দাও

কেন? তা হবে না, তার ভাল করতেই হবে তোমায়, তোমার আশীর্ব্বাদের পুণ্যধারায় তার সকল দুঃখ ধুয়ে ফেল্‌তে হবে তোমাকে।

এর মধ্যে একদিন কালীঘাটের মন্দিরে গেলুম।

সেদিন বেজায় ভিড়—কি একটা তিথি উপলক্ষে মেলা যাত্রী এসেচে। মেয়েরা পিষে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে অথচ কেউ ওদের সুবিধে-অসুবিধে দেখবার নেই। আমার সামনেই একটি তরুণী বধূ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল—আমি এক জন প্রৌঢ়া বিধবাকে বললাম—গেল, গেল, ও মেয়েটির হাত ধরে তুলুন—। কাদামাখা কাপড়ে বধূটি দিশাহারা ভাবে উঠে দাঁড়াল, আমি তার সঙ্গের লোকদের খোঁজ নিয়ে ভিড়ের ভেতর থেকে অতি কষ্টে খুঁজে বার করলাম—ভিড়ের দ্বারা চালিত হ'য়ে তারা অনেক দূর গিয়ে পড়েছিল। এত করেও অনেকেরই দেবদর্শন ঘটল না, পাণ্ডারা সকলকে মন্দিরে ঢুকতে দিচ্চে না শুনলুম, কেন তা জানিনে। মেয়েদের দুঃখ দেখে আমার নিজের ঠাকুর দেখার ইচ্ছে আর রইল না।

আষাঢ় মাসের শেষ দিন। বৈকালের দিকটা মেজবাবু মোটরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, বেলা পাঁচটার সময়ে ফিরে এসে আমার হিসেবের খাতা দেখাতে ডেকে পাঠালেন। রোজ তিনি দুপুরের পরে আপিসে বসে খাতা সই করেন, আজ তিনি ছিলেন না। মেজবাবুকে খাতা দেখানো বড় মুস্কিলের ব্যাপার, একে মেজবাবুকে আমার একটু ভয় হয়, তার ওপরে তিনি প্রত্যেক খরচের খুঁটিনাটি কৈফিয়ৎ চাইবেন। খাতা দেখতে দেখতে মুখ না তুলেই বললেন—তামাকওয়ালার ভাউচার কোথায়?

আমি বললাম—তামাকওয়ালা ভাউচার দেয়নি। খুচরো দোকান—ওরা ভাউচার রাখে না—

মেজবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন—কেন নবীন মুহুরী তো ভাউচার আনতো?

তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল তিনি আমায় অবিশ্বাস করচেন। আমি জানি নবীন মুহুরী যেখানে ভাউচার মেলে না—মনিবকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে সেখানে ভাউচার নিজেই বানাতো। আমি সে মিথ্যার আশ্রয় নিই না। বললাম—আপনি জেনে দেখবেন ওরা ভাউচার কখনো দেয় না। আমি এসে পর্য্যন্ত তো দেখচি—

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, তার সামনেই বড় জানালা—তার ঠিক ওপার—মেজবাবুর অফিসঘরের সামনা-সামনি একটা শান-বাঁধানো চাতাল। অন্দরমহলের একটা দোর দিয়ে চাতালটায় আসা যায় ব'লে জানালায় প্রায়ই পরদা টাঙানো থাকে। আজ সেটা গোটানো ছিল।

আমি একবার মুখ তুলতেই জানালা দিয়ে নজর পড়ল অন্দরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাদের ছোট্ট একটি খোকা, নিতান্ত ছোট, বছর দুই বয়স হবে। বোধ হ'ল যেন দরজা খোলা না পেয়ে চুপ ক'রে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাবচি বেশ খোকাটি তো, কাদের খোকা? এ বাড়িতে যতদূর জানি অত ছোট ছেলে কারুর তো নেই? ওখানে এল কার সঙ্গে?

মেজবাবু বললেন—এদিক মন, দাও ওদিকে কি দেখচ?

আমি বললাম—কাদের খোকা দাঁড়িয়ে রয়েচে ওখানে—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—ওই যে দাঁড়িয়ে রয়েচে চাতালের দরজায়, বাড়িতে ঢুকতে পাচ্চে না বোধ হয়।

মেজবাবু সেদিকে চেয়ে বললেন—কই? কোথায় কে?

ঠিক সেই সময় অন্দরের দরজা খুলে মেজবাবুর স্ত্রী (তাঁকে অনেকবার মোটরে উঠ্‌তে-নামতে দেখেচি) বার হয়ে এলেন এবং খোকাকে কোলে তুলে নিলেন। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। মেজবাবু বল্‌লেন—কোথায় তোমার খোকা না কি?

আমি বিস্মিত হয়ে বল্‌লাম—বারে, ওই তো উনি খোকাকে কোলে নিলেন!

চোখ তুলে চাতালের দিকে চেয়ে মেজবাবুর স্ত্রীকে আর দেখতে পেলাম না, অন্দরের দরজাও বন্ধ, নিয়ে বোধ হয় বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েচেন। মেজবাবু বল্‌লেন—কে নিয়ে গেলেন? উনি মানে কি? কি বক্‌চ পাগলের মত!...

মেজবাবু আমার দিকে কেমন এক ধরনে চেয়ে রয়েচেন দেখলাম। আমি তাঁর সে দৃষ্টির সামনে থতমত খেয়ে গেলাম—আমার মনে হ'ল মেজবাবু সন্দেহ করচেন আমার মাথা খারাপ আছে না কি? সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হলুম একথা ভেবে যে, এই ওঁর স্ত্রী দরজা খুলে এলেন, খোকাকে কোলে তুলে নিলেন, এই তো দিনমানে আর এই ত্রিশ হাতের মধ্যে চাতাল, এ উনি দেখতে পেলেন না কেন? পরক্ষণেই চট ক'রে আমার সন্দেহ হ'ল আমার সেই পুরোনো রোগের ব্যাপার এর মধ্যে কিছু আছে নাকি? এত সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে যে অন্য কিছু আছে বা হতে পারে, এ এতক্ষণ আমার মনেই ওঠেনি। তা হ'লে কোনো কথা কি বলতাম? এক্ষুনি চাকুরি থেকে ছাড়িয়ে দিতে পারে। বল্‌তেই পারে, এর মাথা খারাপ, একে দিয়ে চল্‌বে না।

কিন্তু আমার বড় কৌতূহল হ'ল। সন্ধ্যার সময় মোহিনী ঝি আমার বারান্দার সাম্‌নে দিয়ে যাচ্চে, তাকে জিগ্যেস্ করলুম—শোন, আচ্ছা বাড়িতে দেড়-বছর দু'বছরের খোকা কার আছে বল তো? ঝি বল্‌লে—অত ছোট খোকা তো কারুর নেই?

সেইদিন রাত বারোটায় খুব হৈ চৈ। মেজবাবুর স্ত্রীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, লোক ছুট্‌লো ডাক্তার আন্‌তে। মেজবাবুর স্ত্রী যে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বা সন্ধ্যার পর থেকে পাস-করা ধাত্রী এসে বসে আছে, এ-সব কথা তখন আমি শুনলাম। কারণ সবাই বলাবলি করচে। শেষরাত্রে শুন্‌লাম তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েচে।

মনে মনে বিস্মিত হ'লেও কারও কাছে এ নিয়ে আর কোন কথা বল্‌লাম না; নিজেই দেখি, অথচ নিজেই বুঝি নে এ-সবের মানে কি। চুপচাপ থাকাই আমার পক্ষে ভাল।

এই ঘটনার পরে আমার ভয় হ'ল আমার সেই রোগ আবার আরম্ভ হবে। ও যখন আসে তখন উপরি-উপরি অনেক বার হয়—তার পর দিনকতকের জন্যে আবার একেবারেই বন্ধ থাকে। এই বার বেশী ক'রে সুরু হ'লে আমার চাকুরী ঘুচে যাবে—তার কোন কিনারাই করতে পারব না।

মেজবাবু হিসেবের খাতা লেখার কাজ দিলেন নবীন মুহুরীকে। তার ফলে আমার কাজ বেজায় বেড়ে গেল—ঘুরে ঘুরে এঁদের কাজে খিদিরপুর, বরানগর, কালীঘাট করতে হয়—আর দিনের মধ্যে সতের বার দোকানে বাজারে যেতে হয় চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় নেই, দিনে রাত্তে শুধু ছুটোছুটি কাজ এই দোকানের হিসেব নবীন-মুহুরীকে বুঝিয়ে দেওয়া একটা ঝঞ্ঝাট—রোজ সে আমাকে অপমান করে ছুতোয়-নাতায়, আমার কথা বিশ্বাস করে না, চাকরদের জিগ্যেস্ করে আড়ালে সত্যি সত্যি কি দরে জিনিষটা এনেচি। সীতার মুখ মনে ক'রে সবই সহ্য ক'রে থাকি।

কার্ত্তিক মাসে ওঁদের দেশের সেই মহোৎসব হবে—আমাদের সকলকে দেশে পাঠানো হ'ল। আমি অনেক আগে থেকেই শুনে আস্‌চি—অত্যন্ত কৌতূহল ছিল দেখ্‌বো ওঁদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুষ্ঠান কি রকম।

গ্রামে এঁদের প্রকাণ্ড বাড়ি, বাগান, দীঘি, এঁরাই গ্রামের জমিদার। তবে বছরে এই একবার ছাড়া আর কখনও দেশে আসেন না। কুঞ্জ-নায়েব বাকী দশ মাস এখানকার মালিক।

একটা খুব বড় ফাঁকা মাঠে মেলা বসেচে—এখানকার দোকান-পসারই বেশী। অনেকগুলো খাবারের দোকান, মাটির খেলনার দোকান, মাদুরের দোকান।

একটা বড় বটগাছের তলাটা বাঁধানো, সেটাই না-কি পীঠস্থান। লোকে এসে সেইখানে পূজো দেয়—আর বটগাছটার ডালে ও ঝুরিতে ইঁট বাঁধা ও লাল নীল নেকড়া বাঁধা। লোকে মানত করার সময় ওই সব গাছের গায়ে বেঁধে রেখে যায়,- মানত শোধ দেওয়ার সময় এসে খুলে দিয়ে পূজো দেয়। বটতলায় সারি সারি লোক ধর্ণা দিয়ে শুয়ে আছে, মেয়েদের ও পুরুষদের ধর্ণা দেওয়ার জায়গা আলাদা আলাদা।

বড়বাবু ও মেজবাবুতে মোহন্তের গদীতে বসেন—কর্ত্তা নীলাম্বর রায় আসেন নি, তাঁর শরীর সুস্থ নয়। এঁদের বেদীর ওপরে আস-পাশে তাকিয়া, ফুল দিয়ে সাজানো, সাম্‌নে ঝক্‌ঝকে প্রকাণ্ড রূপোর থালাতে দিন-রাত প্রণামী পড়চে। দুটো থালা আছে—একটাতে মোহন্তের নজর, আর একটাতে মানত শোধ ও পূজোর প্রণামী।

নবীন-মুহুরী, বেচারাম ও আমার কাজ হচ্চে এই সব টাকাকড়ির হিসেব রাখা। এর আবার নানা রকম রেট বাঁধা আছে, যেমন—পাঁচ সিকার মানত থাক্‌লে গদীর নজর এক টাকা, তিন টাকার

মানতে ছু-টাকা ইত্যাদি। কেউ কম না দেয় সেটা মুহুরীদের দেখে নিতে হবে, কারণ মোহন্তরা টাকাকড়ির সম্বন্ধে কথা বল্‌বেন না।

কাজের ফাঁকে আমি বেড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম চারি ধারে, সবারই সঙ্গে মিশে এদের ধর্ম্মমতটা ভাল ক'রে বুঝ্‌বার আগ্রহে যাদের ভাল লাগে তাদেরই নানা কথা জিগ্যেসা করি, আলাপ ক'রে তাদের জীবনটা বুঝবার চেষ্টা করি।

কি অদ্ভুত ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। কতদূর থেকে যে লোক এসেচে পোঁট্‌লাপুঁটুলি বেঁধে, ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়েও এসেচে অনেকে। এখানে থাক্‌বার জায়গা নেই, বড় একটা মাঠে লোকে এখানে-ওখানে এই কার্ত্তিক মাসের হিমে চট, সতরঞ্চি, হোগলা, মাছুর যে যা সংগ্রহ করতে পেরেচে তাই দিয়ে থাক্‌বার জায়গা তৈরি ক'রে তারই তলায় আছে—কেউবা আছে শুধু গাছ-তলাতে। যে যেখানে পারে, মাটি খুঁড়ে কি মাটির ঢেলা দিয়ে উনুন বানিয়ে রান্না করচে। একটা সজ্‌নে-গাছতলায় এক বুড়ী রান্না করছিল —সে একাই এসেচে হুগলী জেলার কোন গাঁ থেকে। তার এক নাতি হুগলীর এক উকিলের বাসায় চাকর, তার ছুটি নেই, বুড়ী প্রতিবছর একা আসে।

আমায় বললে—বড্ড জাগ্রত ঠাকুর গো বটতলার গোঁসাই। মোর মাঁল্‌সি গাছে কাঁ্যাটাল মোটে ধরতো নি, জালি পড়ে আর খসে খসে যায়। তাই বন্নু বাবার থানে কাঁ্যাটাল দিয়ে আস্‌... হে ঠাকুর কাঁ্যাটাল যেন হয়। বললে না-পেত্যয় যাবে ছোট... এ-বছর সতেরো গণ্ডা এঁচড় ধরেচে গোঁসাইয়ের কিরপায়।

আর এক জায়গায় খেজুরডালের কুঁড়েতে একটি বৌ ব'সে রাঁধচে। আর তার স্বামী কুঁড়ের বাইরে ব'সে খোল বাড়িয়ে গান করচে। কাছে যেতেই বস্‌তে বললে। তারা জাতে কৈবর্ত্ত, বাড়ি খুল্‌না

জেলায়, পুরুষটির বয়স বছর চল্লিশ হবে। তাদের ছোট্ট একটি ছেলে মায়ের কাছে ব'সে আছে, তারই মাথার চুল দিতে এসেচে।

পুরুষটির নাম নিমচাঁদ মণ্ডল। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই বড় ভক্ত। নিমচাঁদ আমার হাতে একখানা বই দিয়ে বললে—পড়ে শোনাও তো বাবু, দু-আনা দিয়ে মেলা থেকে কাল কেন্‌লাম একখানা। বইখানার নাম 'বটতলার কীর্ত্তন'। স্থানীয় ঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক তাতে অনেকগুলো ছড়া। বটতলার গোঁসাই ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এখানে এসে আস্তানা বেঁধেচেন, কলিরাজ ভয়ে তাঁর সঙ্গে এই সন্ধি করলে যে বটতলার হাওয়া যত দূর যাবে তত দূর পর্য্যন্ত কলির অধিকার থাক্‌বে না। বটতলার গোঁসাই পাপীর মুক্তিদাতা, সর্ব্ব জীবের আশ্রয়, সাক্ষাৎ শ্রীহরির একাদশ অবতার।

কলিতে নতুন রূপ শুন মন দিয়া
বটতলে স্থিতি হৈল ভক্তদল নিয়া
খেদে কহে কলিরাজ, এ বড় বিষম কাজ
মোর দশা কি হবে গোঁসাই
ঠাকুর কহিলা হেসে, মনে না করিহ ক্লেশে
থান ত্যজি কোথাও না যাই।
শ্রীদাম স্থবল সনে হেথায় আসিব
বটমূলে বৃন্দাবন সৃষ্টি করি নিব।

নিমচাঁদ শুন্‌তে শুন্‌তে ভক্তিগদগদকণ্ঠে বললে—আহা! আহা! বাবার কত লীলেখেলা!

তার স্ত্রীও কুঁড়ের দোরগোড়ায় এসে বসে শুন্‌চে। মানে বুঝলাম এরা নিজেরা পড়তে পারে না, বইপড়া শোনার আনন্দ এদের কাছে বড্ড নতুন, তা আবার যাঁর ওরা ভক্ত, সেই বটতলার গোঁসাই সম্বন্ধে বই।

নিমচাঁদ বললে—আচ্ছা, বটতলার হাওয়া কত দূর যায় দা-ঠাকুর ?

—কেন বল তো ?

—এই যে বল্‌চে কলির অধিকার নেই ওর মধ্যি, তা কত দূর তাই শুধুচ্চি।

—কত দূর আর, ধর আধ কোশ বড়জোর—

নিমচাঁদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কি ভেবে বললে—কি করবো দা-ঠাকুর, দেশে লাঙল-গরু ক'রে ফেলেচি, কুড়ো-দুই জমিতে এবার বাগুন রুইয়ে রেখে এসেচি—নয়ত এ বাবার থান ত বিন্দাবন, আপনি পড়লেন—এ স্বগ্‌গো ছেড়ে বিলির মোষের মত বিলি ফিরে যাই দা-ঠাকুর ? কি বলিস্ রে তুই, সরে আয় না এদিকে, দা-ঠাকুরকে লজ্জা কি, উনি তো ছেলেমানুষ।

নিমচাঁদের স্ত্রী গলার সুরকে খুব সংযত ও মিষ্টি ক'রে অপরিচিত পুরুষ-মানুষের সাম্‌নে কথা বল্‌তে গেলে মেয়েরা যেমন সুরে কথা বলে, তেম্‌নি ভাবে বললে—হ্যাঁ ঠিকই তো। বাবার চরণের তলা ছেড়ে কোথাও কি যেতে ইচ্ছে করে ?

নিমচাঁদ বললে—দু-মণ কোষ্টা ছিল ঘরে, তা বলি বিক্রী ক'রে চল বাবার থানে বাবার ছিচরণ দর্শন ক'রে আসি আর অম্‌নি গঙ্গাছেনটাও সারবো। টাকা বাবা যোগাবেন, সেজন্যে ভাবিনে। ওরে শোন্, কাল তুই তো ধন্না দিবি সকালে, আজ রাতে ভাতে জল দিয়ে রেখে দিস্—

জিগ্যেস্ ক'রে জান্‌লাম ছেলের অসুখের জন্যে ধর্ণা দেবার ইচ্ছে আছে ওদের।

নিমচাঁদের বৌ বললে—বুঝলেন দাদাঠাকুর, খোকার মামা ওর মুখ দেখে তিনটে টাকা দিলে খোকার হাতে। তখন পয়সার বড় কষ্ট যাচ্চে, কোষ্টা তখন জলে, কাচলি তো পয়সা ঘরে আসবে ?

তো বলি, না, এ টাকা খরচ করা হবে না। এ রইল তোলা বাবার থানের জন্যি। মোহন্ত-বাবার গদীতে দিয়ে আসব।

সেই দিন বিকালে নিমচাঁদ ও তার বৌ পূজো দিতে এল গদীতে। নবীন-মুহুরী তাদের কাছে রেট-মত প্রণামী ও পূজোর খরচ আদায় করলে অবিশ্যি—তা ছাড়া নিমচাঁদের বৌ নিজের হাতে সেই তিনটে টাকা বড়বাবুর সাম্‌নের রূপোর থালায় রেখে দিয়ে বড়বাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে কোলের খোকার মাথায় মুখে দিয়ে দিলে।

তার পর সে একবার চোখ তুলে মোহন্তদের দিকে চাইলে এবং এদের ঐশ্বর্য্যের ঘটাতেই সম্ভব অবাক হয়ে গেল—বুদ্ধিহীন চোখে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে টাকা-পয়সাতে পরিপূর্ণ ঝক্‌ঝকে রূপোর আলোটার দিকে বার-কতক চাইলে, রঙীন শালু ও গাঁদাফুলের মালায় মোড়া থামগুলোর দিকে চাইলে—জীবনে এই প্রথম সে গোঁসাইয়ের থানে এসেচে, সব দেখে-শুনে লোকের ভিড়ে, মোহন্ত মহারাজের আড়ম্বরে, অনবরত বর্ষণরত প্রণামীর ঝম্‌ঝমানি আওয়াজে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কতক্ষণ হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, বাইরে থেকে ক্রমাগত লোক ঢুক্‌চে, তাকে ক্রমশঃ ঠেলে একধারে সরিয়ে দিচ্চে, তবুও সে দাঁড়িয়েই আছে।

ওকে কে এক জন ঠেলা দিয়ে এগিয়ে আসতে গেল, আমি ওর দিকে থেকে চোখ ফেরাতে পারি নি। ওর মুখচোখের মুগ্ধ ভক্তিস্তব্ধ দৃষ্টি আমায়ও মুগ্ধ করেচে—এ এক নতুন অভিজ্ঞতা আমার জীবনের, এই বাজে শালুর বাহার আর লোকের হৈ চৈ আর মেজবাবু, বড়বাবুর চশমামণ্ডিত দাম্ভিক মুখ দেখে এত ভাব ও ভক্তি আসে!—যে ঠেলা দিয়ে এদিকে আসছিল, আমি তাকে ধমক দিলুম। তার পর ওর চমক ভাঙ্‌তে ফিরে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে একটি বৃদ্ধা এল, তার বয়স অনেক হয়েচে, বয়সে

গলার সুর কেঁপে গিয়েচে, হাত কাঁপচে, সে তার আঁচল থেকে একটি আধুলী খুলে থালায় দিতে গেল। নবীন-মুহুরী বললে—ও গো, রাখ—আধুলি কিসের?

বুড়ী বললে—এই-ই ঠা-কুরে-র মা-ন-ত শো-ধে-র পে-র-ণা-মী—

নবীন-মুহুরী বললে—পাঁচ সিকের কমে ভোগের পূজো নেই—পাঁচ সিকিতে এক টাকা গদীর নজর—

বুড়ী শুন্‌তে পায় না, বললে—কত?

নবীন আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌লে—এক টাকা—

বুড়ী বললে—আর নে-ই-ই, মা-দু-র কি-নে-লা-ম ছ-আ-না-র, আর—

নবীন-মুহুরী আধুলি ফেরৎ দিয়ে বললে—নিয়ে যাও, হবে না। আর আট আনা নিয়ে এস—

বড়বাবু একটা কথাও বললেন না। বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল এবং ঘণ্টাখানেক পর সিকিতে, দুআনিতে, পয়সাতে একটা টাকা নিয়ে এসে প্রণামীর থালায় রাখলে।

ওরা চলে গেলে আমার মনে হ'ল এই সরল, পরম বিশ্বাসী পল্লীবধূ, এই বৃদ্ধা ওদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ কাকে দিয়ে গেল—মেজবাবুকে, বড়বাবুকে? এই এত লোক এখানে এসেছে, এরা সবাই চাষী গরীব গৃহস্থ, কি বিশ্বাসে এখানে এসেছে জানি নে—কিন্তু অম্লানবদনে খুসীর সঙ্গে এদের টাকা দিয়ে যাচ্চে কেন? এই টাকায় কল্‌কাতা ওঁদের স্ত্রীরা গহনা পরবেন, মোটর চড়বেন, থিয়েটার দেখ্‌বেন, মাম্‌লা করবেন, বড়মানুষী সাহেবিয়ানা করবেন—ছোটবাবু বন্ধুবান্ধব নিয়ে গানবাজনার মজলিসে চপ্‌-কাটলেট্‌ ওড়াবেন, সেই জন্যে?

পরদিন সকালে দেখলাম নিমচাঁদের স্ত্রী পুকুরে স্নান ক'রে সারাপথ সষ্টাঙ্গ নমস্কার করতে করতে ধুলোকাদা-মাখা গায়ে বটতলায় ধর্ণা দিতে

চলেচে—আর নিমচাঁদ ছেলে কোলে নিয়ে ছলছল চোখে তার পাশে পাশে চলেচে।

সেই দিন রাত্রে শুনলাম মেলায় কলেরা দেখা দিয়েচে। পরদিন দুপুরবেলা দেখি বটতলার সাম্নের মাঠটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েচে, অনেকেই পালিয়েচে। নিমচাঁদের কুঁড়েঘরের কাছে এসে দেখি নিমচাঁদের স্ত্রী বসে—আমায় দেখে কেঁদে উঠ্‌ল। নিমচাঁদের কলেরা হয়েচে কাল রাত্রে—মেলার যারা তদারক করে, তারা ওকে কোথায় নাকি নিয়ে যেতে চেয়েচে, মাঠের ওদিকে কোথায়। আমি ঘরে ঢুকে দেখি নিমচাঁদ শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করচে, খুব ঘাম্‌চে।

নিমচাঁদের স্ত্রী কেঁদে বললে—কি করি দাদাঠাকুর, হাতে শুধু যাবার ভাড়াটা আছে—কি করি কোথা থেকে—

মেজবাবুকে কথাটা বললাম গিয়ে। তিনি বললেন—লোক পাঠিয়ে দিচ্চি, ওকে সিগ্রিগেশন্‌ ক্যাম্পে নিয়ে যাও—মেলার ডাক্তার আছে সে দেখ্‌বে—

নিমচাঁদের বৌ-এর কি কান্না ওকে নিয়ে যাবার সময়। আমরা বোঝালুম অনেক। ডাক্তার ইন্‌জেক্‌সন দিলে। মাঠের মধ্যে মাদুর দিয়ে সিগ্রিগেশন্‌ ক্যাম্প করা হয়েচে—অতি নোংরা বন্দোবস্ত। সেখানে সেবাশুশ্রূষার কোন ব্যবস্থাই নেই। ভাবলুম চাকুরী যায় যাবে, ওকে বাঁচিয়ে তুলব, অন্ততঃ বিনা তদারকে ওকে মরতে দেবো না। সারারাত জেগে রোগীকে দেখাশুনো করলুম একা। সিগ্রিগেশন্‌ ক্যাম্পে আরও চারিটি রোগী এল—তিনটে সন্ধ্যার মধ্যেই মরে গেল। মেলার ডাক্তার অবিশ্যি নিয়ম-মত দেখলে। এদের পয়সা নিয়ে যারা বড়-মানুষ, তারা চোখে এসে দেখেও গেল না কাউকে। রাত্রিটা কোন রকমে কাটিয়ে বেলা উঠলে নিমচাঁদও মারা গেল। সে এক অতি করুণ ব্যাপার! ওদের দেশের লোক খুঁজে

বার ক'রে নিমচাঁদের সৎকারের ব্যবস্থা করা গেল। নিমচাঁদের স্ত্রীর দিকে আমি আর চাইতে পারি নে—বটতলায় ধর্ণা দেওয়ার দিন থেকে সেই যে সে উপবাস ক'রে আছে, গোলমালে আর তার খাওয়াই হয় নি। রুক্ষ চুল একমাথা, সেই ধূলিধূসরিত কাপড়—— পেয়ে সে ধর্ণা ফেলে বটতলা থেকে উঠে এসেচে—চোখ কেঁদে কেঁদে লাল হয়েচে, যেন পাগ্‌লীর মত দৃষ্টি চোখে। এখন আর সে কাঁদচে না, শুধু কাঠের মত বসে আছে, কথাও বলে না, কোন দিকে চায়ও না।

মেজবাবুকে বলাতে তিনি ওকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার খরচ দু-টাকা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু সে আমি যথেষ্ট বললাম ও অনুরোধ করলাম ব'লে। আরও কত যাত্রী এ-রকম মরে গেল বা তাদের কি ব্যবস্থা হ'ল এ-সব দেখবার দায়িত্ব এদেরই তো। ওরাই রইল নির্ব্বিকার ভাবে ব'সে। আমার কাছে কিছু ছিল, যাবার সময় নিমচাঁদের স্ত্রীর হাতে দিলুম। চোখের জল রাখ্‌তে পারি নে, যখন সে চলে গেল।

দিন-দুই পরে রাত্রে বসে আমি ও নবীন-মুহুরী হিসেব মেলাচ্চি মেলার দেনা-পাওনার। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কার্ত্তিকের সংক্রান্তিতে পরশু মেলা শেষ হয়ে গিয়েচে, বেশ শীত আজ রাত্রে।

এমন সময় হঠাৎ আমার কি হ'ল বলতে পারিনে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে নবীন-মুহুরী, মেলার আটচালা ঘর, সব যেন মিলিয়ে গেল। আমি যেন এক বিবাহ-সভায় উপস্থিত হয়েচি—অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সীতার বিবাহ-সভা। জ্যাঠামশায় কন্যাসম্প্রদান করতে বসেছেন, খুব বেশী লোকজনের নিমন্ত্রণ হয় নি, বরপক্ষেও বরযাত্রী বেশী নেই। দাদাকেও দেখলুম—দাদা ব'সে ময়দা ঠাস্‌চে।...আরও সব কি কি...ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন সবটা দেখচি—খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট।

চমক ভাঙ্‌লে দেখি নবীন-মুহুরী আমার মাথায় জল দিচ্চে। বললে—কি হয়েচে তোমার, মাঝে মাঝে ফিট্ হয় না-কি?

আমি চোখ মুছে বললুম—না। ও কিছু না—

আমার তখন কথা বলতে ভাল লাগ্‌চে না। সীতার বিবাহ নিশ্চয়ই হচ্চে, আজ এখুনি হচ্চে। আমি ওকে বড় ভালবাসি—আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে জ্যাঠামশায় ওর বিবাহ দিতে পারবেন না। আমি সব দেখেচি।

নবীন-মুহুরীকে বললাম—তুমি আমাকে ছুটি দাও আজ, শরীরটা ভাল নেই, একটু শোব।

পরদিন বড়বাবুর চাকর কল্‌কাতা থেকে এল। মায়ের একখানা চিঠি কল্‌কাতার ঠিকানায় এসে পড়েছিল, মায়ের জবানি, জ্যাঠামশায়ের লেখা আসলে। ২রা অগ্রহায়ণ সীতার বিয়ে, সেই জ্যাঠামশায়ের ঠিক-করা পাত্রের সঙ্গেই। তিনি কথা দিয়েচেন, কথা খোয়াতে পারেন না। বিশেষ, অত বড় মেয়ে ঘরে রেখে পাঁচ জনের কথা সহ্য করতে প্রস্তুত নন। আমরা কোন্ কালে কি করব তার আশায় তিনি কতকাল বসে থাকেন—ইত্যাদি।

বেচারী সীতা! ওর সাবান মাখা, চুলবাঁধা, মিথ্যে সৌখীনতার অক্ষম চেষ্টা মনে পড়ল। কত ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে এত কাল কিছু গ্রাহ্য করিনি! বেশ দেখতে পেলাম ওর ঘন কাল চুলের সিঁতিপাটি ব্যর্থ হয়ে গেল—ওর শুভ্র, নিষ্পাপ জীবন নিয়ে সবাই ছিনিমিনি খেললে।

৯

এখান থেকে কল্‌কাতায় যাবার সময় হয়ে এল। বিকেলে আমি বটতলার পুকুরের ঘাটে বসে মাছ-ধরা দেখচি, নবীন-মুহুরী এসে বললে—তোমায় ডাক্‌চেন মেজবাবু।

ওর মুখ দেখে আমার মনে হ'ল গুরুতর একটা কিছু ঘটেচে কিংবা ও-ই আমার নামে কি লাগিয়েচে। নবীন-মুহুরী এ-রকম বার-কয়েক আমার নামে লাগিয়েচে এর আগেও। কারণ তার চুরীর বেজায় অসুবিধে ঘটচে আমি থাকার দরুণ।

মেজবাবু চেয়ারে বসে, কুঞ্জ-নায়েবও সেখানে দাঁড়িয়ে।

মেজবাবু আমাকে মানুষ বলেই কোনো দিন ভাবেন নি। এ-পর্য্যন্ত আমিও পারতপক্ষে তাঁকে এড়িয়েই চলে এসেচি। লোকটার মুখের উগ্র দাম্ভিকতা আমাকে ওর সাম্‌নে যেতে উৎসাহিত করে না। আমায় দেখে বললেন—শোন এদিকে। কল্‌কাতায় গিয়ে তুমি অন্য জায়গায় চাকুরীর চেষ্টা করবে। তোমাকে এক মাসের নোটিশ দিলাম।

—কেন, কি হয়েচে ?

—তোমার মাথা ভাল না, এ আমিও জানি, নবীনও দেখেচে বল্‌চে। হিসেব-পত্রে প্রায়ই গোলমাল হয়। এ-রকম লোক দিয়ে আমার কাজ চল্‌বে না। ষ্টেটের কাজতো ছেলেখেলা নয় ?

নবীন এবার আমায় শুনিয়েই বল্‌লে—এই তো সেদিন আমার সাম্‌নেই হিসেব মেলাতে মেলাতে মৃগীরোগের মত হয়ে গেল—আমি তো ভয়েই অস্থির—

মেজবাবুকে বিদ্বান ব'লে আমি সম্ভ্রমের চোখেও দেখতাম। বললাম—দেখুন, তা নয়। আপনি তো সব বোঝেন, আপনাকে বল্‌চি। মাঝে মাঝে আমার কেমন একটা অবস্থা হয় শরীরের ও মনের, সেটা ব'লে বোঝাতে পারি নে—কিন্তু তখন এমন সব জিনিষ দেখি, সহজ অবস্থায় তা দেখা যায় না। ছেলেবেলায় আরও অনেক দেখতুম, এখন কমে গিয়েচে। তখন বুঝতাম না, মনে ভয় হ'ত, ভাবতাম এ-সব মিথ্যে, আমার বুঝি কি রোগ হয়েচে। কিন্তু এখন বুঝেচি ওর মধ্যে সত্যি আছে অনেক।

মেজবাবু কৌতুক ও বিদ্রূপ মিশ্রিত হাসি-মুখে আমার কথা শুন্‌ছিলেন—কথা শেষ হ'লে তিনি কুঞ্জ-নায়েবের দিকে চেয়ে হাস্‌লেন। নবীন-মুহুরীর দিকে চাইলেন না, কারণ সে অনেক কম দরের মানুষ। ষ্টেটের নায়েবের সঙ্গে তবুও দৃষ্টি-বিনিময় করা চলে। আমার দিকে চেয়ে বললেন—কত দূর পড়াশুনা করেচ তুমি?

—আই-এ পাস করেছিলাম শ্রীরামপুর কলেজ থেকে—

—তাহ'লে তোমায় বোঝানো আমার মুস্কিল হবে। মোটের ওপর ও-সব কিছু না। নিউরোটিক যারা—নিউরোটিক বোঝ? যাদের স্নায়ু দুর্ব্বল তাদের ওই রকম হয়। রোগই বইকি, ও এক রকম রোগ—

আমি বললাম—মিথ্যে নয় যে তা আমি জানি। আমি নিজের জীবনে অনেক বার দেখেচি—ও-সব সত্যি হয়েচে। তবে কেন হয় এইটেই জানি নে, সেই জন্যেই আপনাকে জিগ্যেস্ করচি। আমি সেণ্ট ফ্রান্সিস্ অফ্ আসিসির লাইফ-এ পড়েচি তিনিও এ-রকম দেখতেন—

মেজবাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন—তুমি তাহ'লে সেণ্ট হয়ে গিয়েচ দেখচি? পাগল কি আর গাছে ফলে?

নবীন ও কুঞ্জ দু-জনেই মেজবাবুর প্রতি সম্ভ্রম বজায় রেখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

আমি নানা দিক থেকে খোঁচা খেয়ে মরীয়া হয়ে উঠলাম। বললাম—আর শুধু ওই দেখি যে তা নয়, অনেক সময় মারা গিয়েচে এমন মানুষের আত্মার সঙ্গে কথা বলেচি, তাদের দেখতে পেয়েচি।

নবীন-মুহুরীর বুদ্ধিহীন মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের অবিশ্বাস ও ব্যঙ্গের ছাপ ফুটে উঠল, কিন্তু নিজের বুদ্ধির ওপর তার বোধ হয় বিশেষ আস্থা না থাকাতে সে মেজবাবুর মুখের দিকে চাইলে। মেজবাবু এমন ভাব দেখালেন যে, এ বদ্ধ উন্মাদের সঙ্গে আর কথা ব'লে লাভ কি আছে! তিনি কুঞ্জ-নায়েবের দিকে এভাবে চাইলেন যে একে আর এখানে কেন? পাগলামি চড়ে বসলেই একটা কি ক'রে ফেল্‌বে এক্ষুনি!

আমি আরও মরীয়া হয়ে বললাম—আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন আর নাই করুন তাতে যে-জিনিষ সত্যি তা মিথ্যে হয়ে যাবে না। আমার মনে হয় আপনি আমার কথা বুঝতেও পারেন নি। যার নিজের অভিজ্ঞতা না হয়েচে, সে এ-সব বুঝতে পারে না, এ-কথা এতদিনে আমি বুঝেচি। খুব বেশী লেখাপড়া শিখলেই বা খুব বুদ্ধি থাকলেই যে বোঝা যায়, তা নয়। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে বলি, আমি যে-ঘরটাতে থাকি, ওর ওপাশে যে ছোট্ট বাড়িটা আছে, ভাঙা রোয়াক, যার সাম্‌নে—ওখানে আমি একজন বুড়োমানুষের অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরেচি—কি করে পেরেচি, সে আমি নিজেই জানিনে—খুব তামাক খেতেন, বয়স অনেক হয়েছিল, খুব রাগী লোক ছিলেন, তিনি মারা গিয়েচেন কি বেঁচে আছেন তা আমি জানি নে। ওই জায়গাটায় গেলেই এই ধরনের লোকের কথা আমার মনে হয়। বলুন তো ওখানে কেউ ছিলেন এ-রকম?

কুঞ্জ-নায়েবের সঙ্গে মেজবাবুর অর্থসূচক দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। মেজবাবু শ্লেষের সঙ্গে বললেন—তোমাকে যতটা সিম্পল্ ভেবেছিলাম তুমি তা নও দেখচি। তোমার মধ্যে ভণ্ডামিও বেশ আছে—তুমি বলতে চাও তুমি এত দিন এখানে এসেচ, তুমি কারও কাছে শোন নি ওখানে কে থাকতো?

—আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তা শুনি নি। কে আমায় বলেচে আপনি খোঁজ নিন্?

—ওখানে আমাদের আগেকার নায়েব ছিল, ওটা তার কোয়ার্টার ছিল, সে বছর-চারেক আগে মারা গিয়েচে, শোন নি এ-কথা?

—না আমি শুনি নি। আরও কথা বলি শুনুন, আপনার ছেলে হওয়ার আগের দিন কল্‌কাতায় আপিসে আপনাকে কি বলেছিলুম মনে আছে? বলেছিলুম একটি খোকা দাঁড়িয়ে আছে—দরজা খুলে মেজবৌরাণী এসে তাকে নিয়ে গেলেন—এ-কথা বলেছিলুম কি না? মনে ক'রে দেখুন।

হ্যাঁ, আমার খুব মনে আছে। সেও তুমি জান্‌তে না যে আমার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা ছিল? যদি আমি বলি তুমি একটা বেশ চাল চেলেছিলে—যে কোনো একটি সন্তান তো হ'তই—তুমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিলে, দৈবাৎ লেগে গিয়েছিল। শার্লাটান্‌রা ও-রকম বুজরুকী করে—আমি কি বিশ্বাস করি ওসব ভেবেচ?

—বুজরুকী কিসের বলুন? আমি কি তার জন্যে আপনার কাছে কিছু চেয়েছিলুম? বা আর কোনোদিন সে-কথার কোনো উল্লেখ করেছিলুম? আমি জানি আমার এ একটা ক্ষমতা—ছেলেবেলায় দার্জ্জিলিঙের চা-বাগানে আমরা ছিলাম, তখন থেকে আমার এ-ক্ষমতা আছে। কিন্তু এ দেখিয়ে আমি কখনও টাকা রোজগারের চেষ্টা তো করিনি কারোর কাছে? বরং বলিই নে—

মেজবাবু অসহিষ্ণুভাবে বললেন—অল্ ফিডলষ্টিক্—মনের ব্যাপার তুমি কিছু জানো না। তোমাকে বোঝাবার উপায়ও আমার নেই। ইট্ প্লেজ্ কুইয়ার ট্রিক্স্ উইথ্ আস্—যদি ধরে নিই তুমি মিথ্যা-বাদী নও—ইউ মে বি এ সেল্ফ্ ডিলিউডেড্ ফুল্ এবং আমার মনে হয় তুমি তাই-ই। আর কিছু নয়। যাও এখন—

আমি চলে এলাম। নবীন-মুহুরী আমার পিছু পিছু এসে বললে—তোমার সাহস আছে বলতে হবে—মেজবাবুর সঙ্গে অমন ক'রে তর্ক আজ পর্য্যন্ত কেউ করে নি। না! যা হোক্, তোমার সাহস আছে। আমার তো ভয় হচ্চিল এই বুঝি মেজবাবু রেগে ওঠেন—

আমি জানি নবীনই আমার নামে লাগিয়েছিল, কিন্তু এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করবার প্রবৃত্তি আমার হ'ল না। কেবল একটা কথা ওকে বললাম। দেখ, নবীন-দা, চাকুরীর ভয় আমি আর করি নে। যে-জন্যে চাকুরী করছিলাম, সে কাজ মিটে গিয়েচে। এখন আমার চাক্‌রী করলেও হয়, না-করলেও হয়। ভেবো না, আমি নিজেই শীগগির চলে যাবো ভাই।

ক-দিন ধরে একটা কথা ভাবছিলাম। এই যে এতগুলো পাড়াগেঁয়ে গরিব চাষীলোক এখানে পূজো দিতে এসেছিল—এরা সকলেই মূর্খ, ভগবানকে এরা সে ভাবে জানে না, এরা চেনে বটতলার গোঁসাইকে। কে বটতলার গোঁসাই? হয়ত এক জন ভক্ত বৈষ্ণব, গ্রাম্য লোক, বছর পঞ্চাশ আগে থাকত ওই বটতলায়। সেই থেকে লৌকিক প্রবাদ এবং বোধ হয় মেজবাবুদের অর্থগৃধ্নুতা দুটোতে মিলে বটতলাটাকে করেচে পরম তীর্থস্থান। কোথায় ভগবান, কোথায় প্রথিতযশা ঐতিহাসিক অবতারের দল—এই বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁদের সন্ধানই রাখে না হয়ত। এদের এ কি ধর্ম্ম? ধর্ম্মের নামে ছেলেখেলা।

কিন্তু নিমচাঁদকে দেখেচি। তার সরল ভক্তি, তাদের ত্যাগ। তার স্ত্রীর চোখে যে অপূর্ব্ব ভাবদৃষ্টি, যা সকল ধর্ম্মবিশ্বাসের উৎসমুখ—এ-সব কি মূলহীন, ভিত্তিহীন জলজ শেওলার মত মিথ্যার মহাসমুদ্রে ভাসমান? এ-রকম কত নিমচাঁদ এসেছিল মেলায়। জ্যাঠাইমাদের আচারের শেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ঐশ্বর্য্যের ঘটা দেখানো দেবার্চ্চনার চেয়ে, এ আমার ভাল লেগেচে। ঘুসুড়ির সেই ষষ্ঠীমন্দিরের মত।

কোন্ দেবতার কাছে নিমচাঁদের তিনটে টাকার ভোগ অর্ঘ্য গিয়ে পৌঁছুলো জীবনের শেষনিঃশ্বাসের সঙ্গে পরম ত্যাগে সে যা নিবেদন করলে?

আর একটা কথা বুঝেচি। কাউকে কোন কথা ব'লে বুঝিয়ে বিশ্বাস করানো যায় না। মনের ধর্ম্ম মেজবাবু আমায় কি শেখাবেন, আমি এটুকু জেনেচি নিজের জীবনে মানুষের মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না সে জিনিষকে, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের। আমি যা নিজের চোখে কতবার দেখ্‌লুম, বাস্তব ব'লে জানি—ঘরে-বাইরে সব লোক বললে ও মিথ্যে। পণ্ডিত ও মূর্খ এখানে সমান—ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডীর সীমানা পার হয়ে কারুর মন অনন্ত অজানার দিকে পাড়ি দিতে চায় না। যা সত্যি, তা কি মিথ্যা হয়ে যাবে?

কল্‌কাতায় ফিরে এলাম বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে। জামাইকে বিয়ের রাত্রে বেবি অষ্টিন্ গাড়ী যৌতুক দেওয়া হ'ল—বিবাহ মণ্ডপের মেরাপ বাঁধতে ও ফুল দিয়ে সাজাতেই ব্যয় হ'ল আট-শ টাকা। বিয়ের পরে ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাতে আট-দশ জন লোক হিমশিম খেয়ে গেল। ছোটবাবুর বন্ধুবান্ধবদের একদিন পৃথক ভোজ হ'ল, সেদিন

সখের থিয়েটারে হাজার টাকা গেল এক রাত্রে। তবুও তো শুন্‌লাম এ তেমন কিছু নয়—এরা পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ জমিদার মাত্র, খুব বড়মানুষী করবে কোথা থেকে।

ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাতে খুব খাটুনি হ'ল। দু-মণ দই, আধ মণ ক্ষীর, এক মণ মাছ, লরি-বোঝাই তরিতরকারী, চল্লিশখানা সাজানো থালায় নানা ধরনের তত্ত্বের জিনিষ—সব বন্দোবস্ত ক'রে তত্ত্ব বার ক'রে ঝি-চাকরের সারি সাজাতে ও তাদের রওনা করতে—সে এক রাজসূয় ব্যাপার!

ওদের রঙীন কাপড়-পরা ঝি-চাকরের লম্বা সারির দিকে চেয়ে মনে হ'ল এই বড়মানুষির খরচের দরুণ নিমচাঁদের স্ত্রী তিনটে টাকা দিয়েচে। অথচ এই হিমবর্ষী অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রে হয়ত সে অনাথা বিধবার খেজুরডালের ঝাঁপে শীত আটকাচ্চে না, সেই যে বুড়ী যার গলা কাঁপ-ছিল, তার সেই ধার-করে দেওয়া আট আনা পয়সা এর মধ্যে আছে। ধর্ম্মের নামে এরা নিয়েচে, ওরা স্বেচ্ছায় হাসিমুখে দিয়েচে।

সব মিথ্যে। ধর্ম্মের নামে এরা করেচে ঘোর অধর্ম্ম ও অবিচারের প্রতিষ্ঠা। বটতলার গোঁসাই এদের কাছে ভোগ পেয়ে এদের বড় মানুষ ক'রে দিয়েচে, লক্ষ গরিব লোককে মেরে—জ্যাঠামশায়দের গৃহ-দেবতা যেমন তাদের বড় ক'রে রেখেছিল, মাকে, সীতাকে ও ভুবনের মাকে করেছিল ওদের ক্রীতদাসী।

সত্যিকার ধর্ম্ম কোথায় আছে? কি ভীষণ মোহ, অনাচার ও মিথ্যের কুহকে ঢাকা পড়ে গেছে দেবতার সত্য রূপ সেদিন, যেদিন থেকে এরা হৃদয়ের ধর্ম্মকে ভুলে অর্থহীন অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মের আসনে বসিয়েচে।

দাদার একখানা চিঠি পেয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম। দাদা যেখানে কাজ করে, সেখানে এক গরিব ব্রাহ্মণের একটি মাত্র মেয়ে ছিল, ওখানকার সবাই মিলে ধরে-পড়ে মেয়েটির সঙ্গে দাদার বিয়ে দিয়েচে। দাদা নিতান্ত ভালমানুষ, যে যা বলে কারও কথা ঠেলতে তো পারে না! কাউকে জানানো হয় নি, পাছে কেউ বাধা দেয়, তারাই জানাতে দেয় নি। এদিকে জ্যাঠামশায়ের ভয়ে বাড়িতে বৌ নিয়ে যেতে সাহস করচে না, আমায় লিখেচে, সে বড় বিপদে পড়েচে, এখন সে কি করবে? চিঠির বাকী অংশটা নব-বধূর রূপগুণের উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতিতে ভর্ত্তি।

"—জিতু, আমার বড় মনে কষ্ট, বিয়ের সময় তোকে খবর দিতে পারি নি! তুই একবার অবিশ্যি অবশ্যি আস্‌বি, তোর বউদিদির বড় ইচ্ছে তুই একবার আসিস্। মায়ের সম্বন্ধে কি করি আমায় লিখবি। সেখানে তোর বউদিকে নিয়ে যেতে আমার সাহসে কুলায় না। ওরা ঠিক কুলীন ব্রাহ্মণ নয়, আমাদের স্বঘরও নয়, অত্যন্ত গরিব, আমি বিয়ে না করলে মেয়েটি পার হবে না সবাই বললে, তাই বিয়ে করেচি। কিন্তু তোর বৌদিদি বড় ভাল মেয়ে, ওকে যদি জ্যাঠামশায় ঘরে নিতে না চান, কি অপমান করেন, সে আমার সহ্য হবে না।…"

পত্র পড়ে বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই হ'ল। দাদা সংসারে বড় একা ছিল, ছেলেবেলা থেকে আমাদের জন্যে খাটচে, জীবনটাই নষ্ট করলে সেজন্যে, অথচ ওর দ্বারা না হ'ল বিশেষ কোনো উপকার মায়ের ও সীতার, না হ'ল ওর নিজের। ভালই হয়েচে, ওর মত স্নেহপ্রবণ, ত্যাগী ছেলে যে একটি আশ্রয়নীড় পেয়েচে, ভালবাসার ও ভালবাসা পাবার পাত্র পেয়েচে, এতে ওর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলুম। কত রাত্রে শুয়ে শুয়ে দাদার দুঃখের কথা ভেবেচি!

মাকে কাছে নিয়ে আসতে পত্র লিখে দিলাম দাদাকে। জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে রাখবার আর দরকার নেই। আমি শীগ্‌গিরই গিয়ে দেখা করবো।

মাঘ মাসের প্রথমে আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনে কেমন একটা উদাস ভাব, কিসের একটা অদম্য পিপাসা। আমার মনের সঙ্গে যা খাপ খায় না, তা আমার ধর্ম্ম নয়। ছেলেবেলা থেকে আমি যে অদৃশ্য জগতের বার-বার সম্মুখীন হয়েছি, অথচ যাকে কখনও চিনি নি, বুঝি নি—তার সঙ্গে যে-ধর্ম্ম খাপ খায় না, সেও আমার ধর্ম্ম নয়।

অথচ চারিদিকে দেখছি সবাই তাই। তারা সৌন্দর্য্যকে চেনে না, সত্যকে ভালবাসে না, কল্পনা এদের এত পঙ্গু যে, যে-খোঁটায় বদ্ধ হয়ে ঘাসজল খাচ্ছে গরুর মত—তার বাইরে ঊর্দ্ধের নীলাকাশের দেবতার যে-সৃষ্টি বিপুল ও অপরিমেয় এরা তাকে চেনে না।

বছরখানেক ঘুরে বেড়ালুম নানা জায়গায়। কতবার ভেবেচি একটা চাকুরী দেখে নেবো, কিন্তু শুধু ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কিছু ভাল লাগতো না। যেখানে শুনতাম কোনো নতুন ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, কি সাধু-সন্ন্যাসী আছে, সেখানে যেন আমায় যেতেই হবে, এমন হয়েছিল। কাল্‌নার পথে গঙ্গার ধারে একদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল।

কাছেই একটা ছোট গ্রাম, চাষী কৈবর্ত্তের বাস। ওখানেই আশ্রয় নেবো ভাবলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খড়ের ঘর, বেশ নিকোনো-পুছোনো, উঠোন পর্য্যন্ত এমন পরিষ্কার যে সিঁদুর পড়লে উঠিয়ে নেওয়া যায়। সকলের ঘরেই ধানের ছোটবড় গোলা, বাড়ির সামনে পিছনে

ক্ষেত-খামার। ক্ষেতের বেড়ায় মটরশুঁটির ঝাড়ে সাদা গোলাপী ফুল ফুটে মিষ্টি সুগন্ধে সন্ধ্যার অন্ধকার ভরিয়ে রেখেচে।

একজন লোক গোয়াল-ঘরে গরু বাঁধছিলো; তাকে বললাম—এখানে থাকবার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে? সে বললে—কোত্থেকে আসা হচ্চে? আপনারা?

ব্রাহ্মণ শুনে নমস্কার ক'রে বললে—ওই দিকে একটু এগিয়ে যান—আমাদের অধিকারী-মশাই থাকেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর ওখানে দিব্বি থাকার জায়গা আছে।

একটু দূরে গিয়ে অধিকারীর ঘর। উঠোনের এক পাশে একটা লেবুগাছ। বড় আটচালা ঘর, উঁচু মাটির দাওয়া। একটি ছোট ছেলে বললে, অধিকারী বাড়ি নেই, হলুদপুকুরে কীর্ত্তনের বায়না নিয়ে গাইতে গিয়েচে—কাল আসবে।

আমি চলে যাচ্ছি এমন সময়ে একটি মেয়ে ঘরের ভেতর থেকে বললে—চলে কেন যাবেন? পায়ের ধুলো দিয়েছেন যদি রাতে এখানে থাকুন না কেনে?

কথার মধ্যে রাঢ় দেশের টান। মেয়েটি তার পর এসে দাওয়ায় দাঁড়াল, বয়স সাতাশ-আটাশ হবে, রং ফর্সা, হাতে টেমির আলোয় কপালের উল্কি দেখা যাচ্চে।

মেয়েটি দাওয়ায় একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে দিলে, এক ঘটি জল নিয়ে এল। আমি হাত পা ধুয়ে সুস্থ হয়ে বস্‌লে মেয়েটি বললে—রান্নার কি যোগাড় ক'রে দেবো ঠাকুর?

আমি বললাম আপনারা যা রাঁধবেন, তাই খাবো।

রাত্রে দাওয়ায় শুয়ে রইলাম। পরদিন দুপুরের পরে অধিকারী-মশাই এল। পেছনে জন-তিনেক লোক, এক জনের পিঠে একটা খোল

বাঁধা। তামাক খেতে খেতে আমার পরিচয় নিলে, খুব খুশী হ'ল আমি এসেচি বলে।

বিকেলে উল্কি-পরা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কি নিয়ে তার ঝগড়া বেধে গেল। স্ত্রীলোকটি বলচে শুনলাম—অমন যদি করবি মিন্সে, তবে আমি বলরামপুরে চলে যাব। কে তোর মুখনাড়ার ধার ধারে? একটা পেট চলে যাবে রে, সেজন্যে তোর তোয়াক্কা রাখি ভেবেচিস্ তুই!

আগুনে জল পড়ার মত অধিকারীর রাগ একদম শান্ত হয়ে গেল। রাত্রে ওদের উঠোনে প্রকাণ্ড কীর্ত্তনের আসর বস্‌ল। রাত তিনটে পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হ'ল। আসরসুদ্ধ সবাই হাত তুলে নাচতে সুরু করলে হঠাৎ। দু-তিন ঘণ্টা উদ্দণ্ড নৃত্যের পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ার দরুণই হোক বা বেশী রাত হওয়ার জন্যেই হোক্, তারা কীর্ত্তন বন্ধ করলে।

আমি যেতে চাই, ওরা—বিশেষ ক'রে সেই স্ত্রীলোকটি—আমায় যেতে দেয় না। কি যত্ন সে করলে! আর একটা দেখলাম, অধিকারী-কেও সেবা করে ঠিক ক্রীতদাসীর মত—মুখে এদিকে যখন-তখন যা-তা শুনিয়ে দেয়, তার মুখের কাছে দাঁড়াবার সাধ্যি নেই অধিকারীর।

যাবার সময়ে মেয়েটি দিব্যি করিয়ে নিলে যে আমি আবার আস্‌বো। বললে—তুমি তো ছেলেমানুষ, যখন খুশী আসবে। মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাবে। তোমার খাওয়ার কষ্ট হচ্চে এখানে—মাছ মিলে না, মাংস মিলে না। বোশেখ মাসে এস, আম দিয়ে দুধ দিয়ে খাওয়াবো।

কি সুন্দর লাগল ওর স্নেহ!

আমার সেই দর্শনের ক্ষমতাটা ক্রমেই যেন চলে যাচ্চে। এই দীর্ঘ এক বছরের মধ্যে মাত্র একটি বার জিনিষটা ঘটেছিল।

ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মত। তারই ফলে আটঘরায় ফিরে আসতে হচ্চে। সেদিন দুপুরের পরে একটি গ্রাম্য ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারী-ঘরে বেঞ্চিতে শুয়ে বিশ্রাম করচি—ডাক্তারবাবু জাতিতে মাহিষ্য, সর্ব্বদা

ধর্ম্মকথা বল্‌তে ও শুনতে ভালবাসে ব'লে আমায় ছাড়তে চাইত না, সব সময় কেবল ঘ্যান ঘ্যান ক'রে ওই সব কথা পেড়ে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল—আমি ধর্ম্মের কথা বলতেও ভালবাসি না, শুনতেও ভালবাসি না—ভাবছি শুয়ে শুয়ে কাল সকালে এর এখান থেকে চলে যাব—এমন সময় একটু তন্দ্রামত এল। তন্দ্রাঘোরে মনে হ'ল আমি একটা ছোট্ট ঘরের কুলুঙ্গি থেকে বেদানা ভেঙে কার হাতে দিচ্চি, যার হাতে দিচ্চি সে তার রোগজীর্ণ হাত অতিকষ্টে একটু ক'রে তুলে বেদানা নিচ্চে, আমি যেন ভাল দেখতে পাচ্চি নে ঘরটার মধ্যে ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা—বারকতক এই রকম বেদানা দেওয়া-নেওয়ার পরে মনে হ'ল রোগীর মুখ আর আমার মায়ের মুখ এক। তন্দ্রা ভেঙ্গে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল এবং সেই দিনই সেখান থেকে আঠারো মাইল হেঁটে এসে ফুলসরা ঘাটে ষ্টিমার ধ'রে পরদিন বেলা দশটায় কলকাতা পৌঁছুলাম। মায়ের নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেচে, আটঘরা যেতেই হবে।

শেয়ালদ' ষ্টেশনের কাছে একটা দোকান থেকে আঙুর কিনে নেবো ভাবলাম, পকেটেও বেশী পয়সা নেই। পয়সা গুণচি দাঁড়িয়ে, এমন সময় দূর থেকে মেয়েদের বিশ্রাম-ঘরের সামনে দণ্ডায়মানা একটি নারীমূর্ত্তির দিকে চেয়ে আমার মনে হ'ল দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা আমার পরিচিত। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারলাম না—আঙুর কিন্‌তে চলে গেলাম। ফিরবার সময় দেখি ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের কাছে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শ্রীরামপুরের ছোট-বৌঠাকরুণ! আমি কাছে যেতেই বৌঠাকরুণ চমকে উঠলেন প্রায়। বললেন—আপনি! কোত্থেকে আস্‌চেন! এমন চেহারা!

আমি বললুম—আপনি একটু আগে মেয়েদের ওয়েটিং-রুমের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন?

—হ্যাঁ, এই যে আমরা এখন এলাম এই যোগবাণীর গাড়ীতে—

আমরা শ্রীরামপুরে যাচ্ছি। ইনি মেজদা—এঁকে দেখেন নি কখনও?

যুবকটি আমায় বললে—আপনি তা হ'লে একটু দাঁড়ান দয়া ক'রে—আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি- এখানে দরে বনচে না—

সে চলে গেল। ছোট-বৌঠাকরুণ বললেন—মাগো কি কালীমূর্ত্তি চেহারা হয়েচে! বড়দি বলছিল আপনি নাকি কোথায় চলে গিয়েছিলেন, খোঁজ নেই—সত্যি?

—নিতান্ত মিথ্যে কি ক'রে বলি! তবে সম্প্রতি দেশে যাচ্ছি।

ছোট-বৌঠাকরুণ হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন একটু, তার পর বললেন—আপনার মত লোক যদি কখনও দেখেচি। আপনার চক্ষে সবই সম্ভব। জানেন, আপনি চলে আসবার পরে বড়দির কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জিগ্যেস্ ক'রে ক'রে শুনেচি। তখন কি অত জানতাম? বড়দি বাপের বাড়ি গিয়েচে আশ্বিন মাসে—আপনার সঙ্গে দেখা হবে'খন। আচ্ছা, আর শ্রীরামপুরে গেলেন না কেন? এত ক'রে বললাম, রাখলেন না কথা? আমার ওপর রাগ এখনও যায় নি বুঝি!

—রাগ কিসের? আপনি কি সত্যি ভাবেন আমি আপনার ওপর রাগ করেছিলাম?

ছোট-বৌঠাকরুণ নতমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

—বলুন!

ছোট-বৌঠাকরুণ নতমুখেই বললেন—ও কথা যাক্। আপনি এ-রকম ক'রে বেড়াচ্চেন কেন? পড়াশুনো আর করলেন না কেন?

—সে সব অনেক কথা। সময় পাই তো বলব এক দিন।

—আসুন না আজ আমাদের সঙ্গে শ্রীরামপুরে? দিনকতক থেকে যান, কি চেহারা হয়ে গিয়েচে আপনার! সত্যি, আসুন আজ।

—না, আজ নয় দেশে যাচ্ছি, খুব সম্ভব মায়ের বড় অসুখ—

ছোট-বৌঠাকরুণ বিস্ময়ের সুরে বললেন—কই সে কথা তো এতক্ষণ বলেন নি! সম্ভব মানে কি, চিঠি পেয়েচেন তো, কি অসুখ!

একটু হেসে বললাম—না চিঠি পাই নি। আমার ঠিকানা কেউ জানতো না। স্বপ্নে দেখেচি—

ছোট-বৌঠাকরুণ একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদু শান্ত সুরে বললেন—আমি জানি। তখন জানতাম না আপনাকে, তখন তো বয়সও আমার কম ছিল। বড়দি তার পর বলেছিল। একটা কথা রাখবেন? চিঠি দেবেন একখানা? অন্ততঃ একখানা লিখে খবর জানাবেন?···

ছোট-বৌঠাকরুণ আগের চেয়ে সামান্য একটু মোটা হয়েচেন, আর চোখে সে বালিকাসুলভ তরল ও চপল দৃষ্টি নেই, মুখের ভাব আগের চেয়ে গম্ভীর। আমি হেসে বললাম—আমি চিঠি না দিলেও, শৈলদির কাছ থেকেই তো জানতে পারবেন খবর—

এই সময় ওঁর মেজদাদা ট্যাক্সিতে চড়ে এসে হাজির হ'লেন। আমি বিদায় নিলুম।

সন্ধ্যার সময় আটঘরা পৌঁছে দেখি সত্যিই মায়ের অসুখ। আমাদের ঘরখানায় মেঝের ওপর পাতা বিছানায় মা শুয়ে। অন্ধকারে আমায় চিনতে না পেরে ক্ষীণস্বরে বললেন—কে ওখানে, হারু?

তারপর আমায় দেখে কেঁদে উঠে বললেন—কে জিতু, আয় বাবা আয়, এতদিন পরে মাকে মনে পড়লো তোর? আয় এই বালিশের কাছে আয়—ওমা, একি হয়ে গিয়েছিস্ রে! রোগা, কালো চেহারা—ওরা সত্যিই বলত তো!

মা একটি ঘরে শুয়ে—জনপ্রাণী কেউ কাছে নেই। সন্ধ্যা হব-হব,

ঘরে একটা আলো পর্য্যন্ত কেউ জ্বালেনি। এমনিই বাড়ি বটে! কেন, এত ছেলে মেয়ে বৌ বাড়িতে, এক জন কাছে থাকতে নেই? অথচ—কিন্তু পরের দোষ দিয়ে লাভ কি, আমিই বা কোথায় ছিলুম এতদিন?

বললাম—মা, দাদা কোথায়? সীতা আসে নি?

মা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। বললেন—ওরা কেউ চিঠি দেয় না, ব'লে ব'লে আজ বুঝি হারু একখানা পত্র দিয়েচে সীতাকে।

—ক'দিন অসুখ হয়েচে তোমার মা? ওরা কেউ দেখে না? জ্যাঠাইমা, কাকিমারা আসে না?

—ভুবনের মা মাঝে মাঝে আসে। এই বিকেলে সাবু দিয়ে গেল—তা সাবু কি খেতে পারি, ওই রয়েচে বাটিতে। ছোটবৌ এসেছিল বিকেলবেলা। বটঠাকুর বাড়ি নেই বুঝি—আর কেউ এ দিকে মাড়ায় না।

তারপর আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—হ্যাঁরে জিতু, তুই নাকি সন্নিসি হয়ে গিয়েচিস্—দিদি, হারু, মেজবৌ, ঠাকুরপোরা সবাই বলে—সত্যি? বলে সে আর আসবে না, সে কোন্ দিকে বেরিয়ে চলে গিয়েচে। তার ঠিকানা কেউ জানে না। আমি ভাবি জিতু আমায় ভুলে যাবে এমনি হবে? আবার ভাবি আমার কপাল খারাপ নইলে এ-সব হবেই বা কেন—ভেবে ভেবে রাতে জেগে বসে থাকি।

—কেঁদো না, কাঁদে না, ছিঃ। ওসব মিথ্যে কথা। কে বলেচে সন্নিসি হয়ে গেছি! এই দ্যাখ না সাদা কাপড় পরনে, সন্নিসি কি সাদা কাপড় পরে?

মনে বড় অনুতাপ হ'ল—কি অন্যায় কাজ করেচি এতদিন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে! আর এদেরও কি অন্যায়, সবাই মিলে মাকে এমন ক'রে ভয় দেখানোই বা কেন, মা সরল মানুষ, সকলের কথাই বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমার দোষ ছিল না, আমি ভেবেছিলাম মা আছেন

দাদার কাছে। নিশ্চিন্ত ছিলুম অনেকটা সেজন্যে। জিগ্যেস্ করলাম—মা, দাদা তোমায় নিয়ে যায় নি!

—সে অনেক কথা। নিতু নিতেও এসেছিল, বট্ঠাকুর বললেন—যাও, কিন্তু আমার এখানে আর আসতে পাবে না। সীতার শ্বশুরবাড়ির লোক ভাল না এখন দেখচি—তারাও বট্ঠাকুরের হাতের লোক, বললে তা হ'লে মেয়ে-জামায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচে যাবে। মেয়ে তারা আর পাঠাবে না। বৌমাকেও এখনও দেখিনি, এমনি আমার কপাল। বট্ঠাকুর সে বউকে এ-বাড়ি নাকি ঢুকতে দেবেন না। তা নিতু আমায় লিখলে, মা এই কটা মাস যাক—কোথায় নাকি ভাল চাকরি পাবে—এখানে পাড়াগাঁয়ে বাসাও পাওয়া যায় না। আমি আবার গিয়ে ওর শ্বশুরবাড়ি উঠবো সেটা ভাল দেখাবে না। মাঘ মাসে একেবারে নিয়ে যাবে এখান থেকে। এই তো নিতু ওমাসেও এসেছিল। আহা, বাছাকে কি অপমান করলে সবাই মিলে! আমার কপালে কেবল চারিদিকে অপমান ছাড়া আর কিছু জোটে না—

কেন চাকরি ছেড়ে দিলাম? কেন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াই? এখন দেখতে পাচ্চি সীতার বিবাহ হয়ে গেলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েচে ভাবা উচিত ছিল না। মাকে আমি উপেক্ষা করে এসেচি এত দিন, দাদা সাধ্যমত অবিশ্যি করেচে—কিন্তু আমি কিছুই করি নি। কেন আমার এমন ধারা মতিগতি হ'ল! কোথায় আমার কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে আমি অন্ধ ছিলাম কেন?

লজ্জিত ও অনুতপ্ত সুরে বললাম—মা আঙুর খাবে?…আঙুর এনেচি, ভাল আঙুর—শেয়ালদ' থেকে—

ভূতোকে বললাম, একটা আলো নিয়ে আয়, তা দেয় নি দেখচি—বল্‌তে বল্‌তে ছোটকাকীমা ঘরের দোরের কাছে এসে আমায় দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে বললেন…কে বসে ওখানে?

আমি অপরাধীর মত কুণ্ঠিত স্বরে বললাম—আমি কাকীমা।

এগিয়ে এসে বললেন—কে নিতু?

—না, আমি।

কাকীমা অবাক হয়ে বললেন—ওমা, জিতু যে দেখচি, কোথেকে, কি ভাগ্যি তোমার মায়ের! তারপর কি মনে করে?

আমি মাথা হেঁট ক'রে বসে রইলাম, কি আর বল্‌ব!

কাকীমা বললেন—তোমার কাণ্ডজ্ঞান যে কবে হবে, তা ভেবেই পাই নে। একেবারে এ-কটা বছর নিরুদ্দেশ নিখোঁজ।—আর এই এ-ভাবে মাকে ফেলে রেখে? তোমাদের একটু জ্ঞান নেই যে এটা কার বাড়ি? এখানে কে দ্যাখে তোমার মাকে? সবই তো জান—বয়েস হয়েচে, এখনও বুদ্ধি হ'ল না? বট্‌ঠাকুর বাড়ি নেই, একটা ডাক্তার-বদ্যি কে দেখায় তার নেই ঠিক। হরি ডাক্তারকে একবার আন্‌তে হয়—টাকাকড়ি কিছু আছে? নেই বোধ হয়, সে দেখেই বুঝিচি—নেই? আচ্ছা, টাকা আমি দেব এখন ভেব না, ডাক্তার আন।

ছোটকাকীমার পায়ের ধূলো নেবার ইচ্ছা হ'ল। এ-বাড়িতে সবাই পশু, সবাই অমানুষ—সত্যিকার মেয়ে বটে ছোটকাকীমা।

রাত্রেই ডাক্তার এল। ওষুধপত্রও হ'ল। দাদাকে পত্র দিলাম পরদিন সকালে।

আমায় নিয়ে খুব হৈ চৈ হ'ল। জ্যাঠাইমা আমায় রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে খেতে দেবেন না—আমি জাতবিচার মানি নে বাগ্‌দি দুলে সবার হাতে খেয়ে বেড়াই, এ-সব কথা কে এসে গাঁয়ে বলচে। নানা রকম অলঙ্কার দিয়ে কথাটা রাষ্ট্র হয়েচে গাঁয়ে।

মায়ের অবস্থা শেষরাত থেকে বড় খারাপ হ'ল। সকালে আমাকে আর চিন্‌তে পারেন না—ভুল বক্‌তেও লাগলেন!

সন্ধ্যার সময় একটা মিটমিটে টেমি জ্বলচে ঘরের মেজেতে—আমি

একা বসে আছি মায়ের শিয়রে, এমন সময় বাইরে উঠোনে একখানা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াবার শব্দ হ'ল। একটু পরেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে মাটিতে আঁচল লুটোতে লুটোতে সীতা ঘরে ঢুকল। আমায় দেখে বললে, ছোড়দা? মা কেমন আছেন ছোড়্দা?

আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম। সীতা একেবারে বদলে গিয়েচে, মাথায় কত বড় হয়েচে, দেখতেও কি সুন্দর হয়েচে—ওকে চেনা যায় না আর।

মাকে বললাম—মা, ওমা, সীতা এসেচে,--

মা চাইলেন, কি বললেন বোঝা গেল না। বোধ হয় বুঝতে পারলেন না যে সীতা এসেচে।

সীতা খুব শক্ত মেয়ে। সে কেঁদেকেটে আকুল হয়ে পড়লো না। আমায় বললে—দাদা, আমার বালাজোড়াটা দিচ্চি, তাই দিয়ে ভাল ডাক্তার নিয়ে এস। এখানকার হরিডাক্তার তো? তার কাজ নয়।

আমি অক্ষমতার লজ্জায় কুণ্ঠিত সুরে বললাম—তার পর তোর শ্বশুরবাড়ির লোকে তোকে বক্‌বে। সে কি ক'রে হয়—

সীতা বললে—ইস্! বক্‌বে কিসের জন্যে, বালা কি ওদের? মায়ের বালা, মা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়। বাবা গড়িয়ে দিয়েছিলেন মাকে। তুমি বালা নিয়ে যাও, তার পর ওরা যা বলে বলবে—

এই সময় সীতার স্বামী ঘরে ঢুকল। আমি যে-রকম চেহারা কল্পনা করছিমাম, লোকটা তার চেয়েও খারাপ। কালো তো বটেই, পেটমোটা, বোধ হয় পিলে আছে, কাঠখোট্টা গড়ন, চোয়ালের হাড় উঁচু—গায়ে একটা ছেলেমানুষের মত ছিটের জামা, একটা রাঙা আলোয়ান, পায়ে কেম্বিসের জুতো। আমায় দেখে দাঁত বার ক'রে হেসে বললে—এই যে ছোটবাবু না? কখন আসা হ'ল? বড়বাবু বুঝি এখনও আসবার ফুরসুৎ পান নি—তার পর অসুখটা কি?...এখন কেমন আছেন?

তারপর সে খানিকক্ষণ বসে থেকে বললে—বস তোমরা। আমি জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি—একটু চায়ের চেষ্টাও দেখা যাক্, গরুর গাড়িতে গা-হাত ব্যথা হয়ে গিয়েচে।

ওর কথার ভঙ্গিতে একটা চাষাড়ে ভাব মাখানো। এই লোকটা সীতার স্বামী! সীতার মত মেয়ের। সীতাকেও আমরা সবাই মিলে উপেক্ষা করেচি।

এই সময় হঠাৎ শৈলদিদির কথা আমার মনে পড়ল। শেয়ালদ' ষ্টেশনে ছোট-বৌঠাকৃরুণ বলেছিলেন শৈলদি এখানেই আছে। সীতার বালাজোড়াটা নেব না—ওকে তার জন্যে অনেক দুঃখ পোয়াতে হবে সেখানে, ও যে-রকম চাপা মেয়ে, কোন অভিযোগ করবে না কখনও কারু কাছে। শৈলদিদির কাছ থেকে টাকা ধার নেবো, মায়ের অসুখের পরে যে-ক'রে হোক্ দেনা শোধ হবেই।

একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখি সীতার স্বামী ওদের রান্নাঘরে বসে হুঁকো-হাতে তামাক খেতে খেতে খুব গল্প জমিয়েচে—আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভায়েদের সকলেরই প্রায় বিয়ে হয়ে গিয়েচে এবং বৌয়েরা সকলেই সম্পর্কে ওর শালাজ—তাদের সঙ্গে।

রাত দশটার সময় শৈলদিদি এসে হাজির। আমায় দেখে বললে—এই যে সন্নিসি-ঠাকুর ফিরে এসেচে দেখচি। এই যে সীতা—এস এস, সাবিত্রী সমান হও, কখন এলে ভাই? আমি শুনলাম এই খানিকটা আগে, আমাদের ও-পাড়ায় কে খবর দেবে বল।

আমি আর সীতা শুধু ঘরে মায়ের পাশে বসে। সীতার স্বামী খেয়ে দেয়ে শুয়েচে, অবিশ্যি সে বসে থাকতে চেয়েছিল—আমি বলেছিলাম তার দরকার নেই। তুমি খেয়ে একটু বিশ্রাম কর—দরকার হলে ডাক্‌ব রাত্রে।

শৈলদিদিও রাত্রে থাকতে চাইলে, বললে—আজ রাতে লোকের

দরকার। তোরা দুটীতে মোটে বসে আছিস্। আমি খেয়ে আসি আমিও থাক্‌ব।

আমি বললাম—না শৈলদি, আমরা দু-জন আছি, ভগ্নীপতি এসেচে—তোমার আর কষ্ট করতে হবে না।

তারপর বাইরে ডেকে টাকার কথা বললাম। শৈলদি বললে—কত টাকা।

—গোটাকুড়ি দাও গিয়ে এখন। কাল সকালেই আমি তা হ'লে চলে যাই ডাক্তার আন্‌তে—

—তা হ'লে কাল সকালে যাবার সময় আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবি। ওখান দিয়েই তো পথ—কেমন তো?

—ছোটকাকীমা এই সময়ে এলেন। শৈলদিকে দেখে বললেন—জিতুর মাকে নিয়ে বেজায় মুস্কিল হয়েচে ভাই—ওরা ছেলেমানুষ, কি বা বোঝে, নিতু এখনও তো এল না। হঠাৎ চার পাঁচ দিনের জ্বরে যে মানুষ এমন হয়ে পড়বে তা কি ক'রেই বা জানবো। তবুও তো জিতু কোথা থেকে ঠিক সময়ে এসে পড়েছিল তাই রক্ষে।

রাতে জ্যাঠাইমাও এসে খানিকটা বসে রইলেন। অনেক রাত্রে সবাই চলে গেল, আমি সীতাকে বললাম—তুই ঘুমিয়ে নে সীতা। আমি জেগে থাকি। রাতে কোন ভয় নেই।

সকাল বেলা আটটা-নটার পর থেকে মা'র অবস্থা খুব খারাপ হ'ল। দশটার পর দাদা এল—সঙ্গে বৌদিদি ও দাদার খোকা। বৌদিদিকে প্রথম দেখেই মনে হ'ল শান্ত, সরল, সহিষ্ণু মেয়ে। তবে খুব বুদ্ধিমতী নয়, একটু অগোছালো, আনাড়ি ধরনের। নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বাইরে কোথাও বেরোয় নি বিশেষ, এই বোধ হয় প্রথম, কিছু তেমন দেখেও নি। গরম জলের বোতল গায়ে সেঁক করতে হবে শুনে ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিপন্ন মুখে সীতার দিকে চেয়ে

রইল। কাপড়-চোপড় পরবার ধরনও অগোছালো—আজকালকার মত নয়। বৌদিদি যেন বনে ফোটা শুভ্র কাঠমল্লিকা ফুল, তুলে এনে তোড়া বেঁধে ফুলের দোকানে সাজিয়ে রাখবার জিনিষ নয়। আর একেবারে অদ্ভুত ধরনের মেয়েলী, ওর সবটুকুই নারীত্বের কমনীয়তা মাখানো।

সীতা আমায় আড়ালে বললে—চমৎকার বৌদি হয়েচে, ছোটদা। আহা, মা যদি একটিবারও চোখ মেলে চেয়ে দেখতেন। আমাদের কপাল!

বেলা তিনটের সময় মা মারা গেলেন। যে মায়ের কথা তেমন ক'রে কোন দিন ভাবিনি, আমাদের কাজকর্ম্মে, উদ্যমে, আশায়, আকাঙ্ক্ষায় উচ্চাভিলাষে মায়ের কোন স্থান ছিল না, সবাই মিলে যাঁকে উপেক্ষা ক'রে এসেচি এত দিন—আজ সেই মা কত দূরে কোথায় চলে গেল—সেই মায়ের অভাবে হঠাৎ আমরা অনুভব করলাম অনেকখানি খালি হয়ে গিয়েচে জীবনের। ঘরের মধ্যে যেমন প্রকাণ্ড ঘরজোড়া খাট থাকে, আজন্ম তার ওপর শুয়েচি, বসেচি, খেলেচি, ঘুমিয়েচি, সর্ব্বদা কে ভাবে তার অস্তিত্ব, আছে তো আছে। হঠাৎ একদিন খাটখানা ঘরে নেই—ঘরের পরিচিত চেহারা একেবারে বদলে গিয়েচে—সে ঘরই যেন নয়, এক দিনে ঘরের সে নিবিড় সুপরিচিত নিজস্বতা কোথায় হারিয়ে গেল, তখন বোঝা যায় ঘরের কতখানি জায়গা জুড়ে কি গভীর আত্মীয়তায় ওর সঙ্গে আবদ্ধ ছিল সেই চিরপরিচিত একঘেয়ে সেকেলে খাটখানা—ঘরের বিরাট ফাঁকা আর কিছু দিয়েই পূর্ণ হবার নয়।

সীতার ধৈর্য্যের বাঁধ এবার ভাঙ্‌লো। সে ছোট মেয়ের মত কেঁদে আব্‌দার ক'রে যেন মাকে জড়িয়ে থাকতে চায়। মা আর সে দু-জনে মিলে এই সংসারে সকালে সন্ধ্যায় দু-বেলা খেটে দুঃখের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসেছিল—সে-সব দিনের দুঃখের

সঙ্গিনী হিসাবে মা আমাদের চেয়েও ওর কাছে বেশী আপন, বেশী ঘনিষ্ঠ—অভাগী এত দিনে সত্যি সত্যি নিঃসঙ্গ হ'ল সংসারে। ওর স্বামী যে ওর কেউ নয়, সে আমার বুঝতে দেরী হয় নি এতটুকু। কিন্তু ও হয়ত এখনও তা বোঝে নি।

দিন-দুই পরে বৌদিদি দুপুরবেলায় ওদের রান্নাঘরে একটা ঘড়া আন্‌তে গিয়েচেন। জ্যাঠাইমা বলেচেন—ওখানে দাঁড়াও, দাওয়াটাতে—অম্‌নি হট্ ক'রে ঘরে ঢুক্‌লে যে?

বৌদিদি অবাক্ হয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েচেন, জ্যাঠাইমা ঘড়া বার ক'রে দিয়েচেন দাওয়াতে। বৌদিদি নিয়ে এসেচে। কিন্তু বুঝ্‌তে পারে নি ব্যাপারটা কি, বুদ্ধিমতী মেয়ে হ'লে তখনই বুঝত।

এ-কথা তখন সে কাউকে বলে নি।

পরদিন মেজকাকা আমায় ডেকে বললেন—একটা কথা আছে শোন। তোমার মায়ের কাজটা এখানে না ক'রে অন্য জায়গায় গিয়ে করো। মানে তোমার দাদার বৌয়ের এখানে তো পাকস্পর্শ হয় নি, বড়দাদাও নেই বাড়ি—এ-অবস্থায় শ্রাদ্ধের সময় কেউ খেতে আস্‌বে না। তোমার দাদার বৌকে আমরা সে-ভাবে ঘরে তো নিই নি? এই বুঝে যা হয় ব্যবস্থা করো। ব'লো তোমার দাদাকে।

তলায় তলায় এঁরা সীতার স্বামী গোপেশ্বরকে কি পরামর্শ দিয়েচেন জানি নে, সে হঠাৎ বেঁকে দাঁড়িয়ে বল্‌লে চতুর্থীর শ্রাদ্ধ সীতাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েই করবে—অথচ আগে ঠিক হয়েছিল চতুর্থীর শ্রাদ্ধ এখানেই হবে। কালই শ্রাদ্ধের দিন, সুতরাং আজই সে সীতাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হ'ল। এর কোনও দরকার ছিল না, সীতা এখানে শ্রাদ্ধ করলে তাতে কোন দোষ সমাজের মতেও হবার কথা নয়—কিন্তু সে কিছুতেই কথা শুন্‌লে না। এই অবস্থায় বৌদিদিকে পেয়ে সীতা আনকাটা [illegible]

বৌদিদির সঙ্গে সীতার বেশী মেশামেশিটা যেন গোড়া থেকেই আমার ভগ্নীপতি পছন্দ করে নি। নিজেই হোক্ আর ওদের পরামর্শেই হোক্।

যাবার সময় সীতা বৌদিদির গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। আমায় আড়ালে বললে—ছোড়দা আমায় বনবাসে ফেলে রেখে ভুলে থেকো না যেন, মাঝে মাঝে আস্‌বে বল? আর শোনো, বৌদি বড্ড ভালমানুষ, ও এখনও জানে না যে ওর জন্যেই মায়ের কাজ এখানে করতে দিচ্চে না ওরা। এ-কথা যেন বৌদিদির কানে না যায়, ব'লে দিও দাদাকে।

বৌদিদিকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল এখানে শ্রাদ্ধ করতে খরচ বেশী পড়বে, কারণ জ্যাঠামশায়দের নাম বেশী, লোকজন নিমন্ত্রণ করতে হয় অনেক। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধের কাজ করলে অনেক কম খরচে হবে। বৌদিদি তাই বুঝে গেল।

যাবার সময় আমাদের ঘরের চাবীটা ছোটকাকীমার হাতে দিয়ে বললুম—এ-বাড়িতে আর কাউকে আপন ব'লে জানি নে, কাকীমা। সীতার খোঁজখবর মাঝে মাঝে একটু নিও—ওর তো এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক একরকম মিটেই গেল।

ছোটকাকীমার চোখে জল এল। বললেন—আমার কোন ক্ষমতা নেই, নইলে নিতুর বৌকে এ-বাড়ি থেকে আজকে অন্য জায়গায় যেতে বলে?

আমি বললুম—সে-কথা ব'লো না কাকীমা। আমরা এখানে এসেছিলাম প্রার্থী হয়ে, পরের দয়ার ওপর নির্ভর করে। এখানে কোন অধিকার নেই আমাদের।

কাকীমা বললেন—তুই ওকি কথা বলচিস্ জিতু? এ তোদের যে সাতপুরুষের ভিটে। জায়গা-জমি আর দু-খানা ঘর [illegible]

কি আর গেলেই বা কি? এ ভিটেতে হারুর কি যোগেশের যে অধিকার, তোদের দু-ভায়ের অধিকার তার চেয়ে এক চুল কম নয়।

ছোটকাকীমার এক মূর্ত্তি দেখেছিলাম বাল্যে, এ আর এক মূর্ত্তি। এই এক জনই এ-বাড়ির মধ্যে বদ্‌লে গিয়েচে একেবারে। গাড়ীতে যেতে যেতে সেই কথাটা বার-বার মনে হচ্চিল।

১০

মাস পাঁচ ছয় পরে ঘুরতে ঘুরতে একবার গেলাম দাদার বাড়িতে।

দাদা ছিল না বাড়ি, বৌদিদি বাটনা-মাখা হাতে ছুটে বার হয়ে এল—আমার হাত থেকে পুঁটুলিটা নিয়ে বললে—এস এস ঠাকুরপো রদ্দুরে মুখ রাঙা হয়ে গিয়েচে একেবারে। কই, আস্‌বে ব'লে চিঠি দেও নি তো? তা হ'লে একখানা গরুর গাড়ী ষ্টেশনে যেত।

তখনই বৌদিদি চিনি ভিজিয়ে সরবৎ ক'রে নিয়ে এল। বললে—ঠাকুরপো তোমার মায়া নেই শরীরে। এত দেরি ক'রে আস্‌তে হয়? উনি কেবল বলেন তোমার কথা।

বিকেলে দাদা এল। আমায় পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলে। কিসে আমার সুখ-সুবিধে হবে, কিসে আমায় বড় মাছ, ভালটা-মন্দটা খাওয়ানো যাবে, এই যোগাড়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এরা বেশ সুখে আছে। দাদা যা চাইত, তা সে পেয়েচে। সে চিরকালই সংসারী মানুষ, ছেলেপুলে গৃহস্থালী নিয়েই ও সুখী. তাই

নিয়েই ও থাক্‌তে ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে দাদাকে দেখে এসেচি, সংসার কিসে গোছালো হবে, কিসে সংসারের দুঃখ ঘুচবে, এই নিয়েই সে ব্যস্ত থাকৃত। লেখাপড়াই ছেড়ে দিলে আমাদের দু-পয়সা এনে খাওয়াবার জন্যে। কিন্তু পরের বাড়িতে পরের তৈরী ব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যে সেখানে তো কোন স্বাধীনতা ছিল না, কাজেই দাদার সে সাধ তখন মেটে নি। যার জন্যে ওর মন চিরকাল পিপাসিত ছিল, এত দিনে তার সন্ধান মিলেছে, তাই দাদা সুখী। দাদা ও বৌদিদি একই ধরনের মানুষ। নীড় বাঁধবার আগ্রহ ওদের রক্তে মেশানো রয়েচে। বৌদিদির বাপের বাড়ির অবস্থা খারাপই। একান্নবর্ত্তী প্রকাণ্ড পরিবারের মেয়ে সে। তার বাপের বাড়িতে সবাই একসঙ্গে কষ্ট পায়, সবাই ছেঁড়া কাপড় পরে, একঘরে পুরনো লেপকাঁথা পেতে শীতের রাতে তুলো বেরুনো, ওয়াড়-বিহীন ময়লা লেপ টানাটানি ক'রে ছেলেপুলেরা রাত কাটায়—সব জিনিষই সকলের, নিজের বলে বিশেষ কোন ঘরদোরও নেই, তৈজসপত্রও নেই—সেই রকম ঘরে বৌদিদি মানুষ হয়েচে। এতকাল পরে সে এমন কিছু পেয়েচে যাকে সে বলতে পারে এ আমার। এ আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার ঘরদোর—আর কারও ভাগ নেই এতে। এ অনুভূতি বৌদিদির জীবনে একেবারে নতুন।

দাদা আমায় তার পরদিন সকালে ওর কপির ক্ষেত, শাকের ক্ষেত, দেখিয়ে বেড়ালে। বৌদিদি বললে—শুধু ওদিক দেখলে হবে না ঠাকুরপো, তুমি আমার গোয়াল দেখে যাও ভাই এদিকে। এই দ্যাখো এই হচ্চে মুংলী। মঙ্গলবারে সন্দেবেলা ও হয়, ওই সজনেগাছতলায় তখন গোয়াল ছিল। ও হ'ল, সেই রাতেই বিষম ঝড় ভাই। গোয়ালের চালা তো গেল উড়ে। তারপর এই নতুন গোয়াল হয়েচে এই বোশেখ মাসে। বৌদিদি বাছুরের গলায় হাত বুলিয়ে আদর

করতে করতে বললে—বড্ড পয়মন্ত বাছুর, যে-মাসে হ'ল সেই মাসেই ওঁর সেই মনিব আমায় শাঁখা-শাড়ী পাঠিয়ে দিলে, ওঁর দু-টাকা মাইনে বাড়ালে।

দিনকতক যাবার পরে বৌদিদির একটা গুণ দেখলাম, লোককে খাওয়াতে বড় ভালবাসে। অসময়ে কোন ফকির বৈষ্ণব, কি চুড়িওয়ালী বাড়িতে এসে খেতে চাইলে নিজের মুখের ভাত তাদের খাওয়াবে। নিজে সে-বেলাটা হয়ত মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দিলে।

এক দিন একটা ছোক্‌রা কোথা থেকে একখানা ভাঙ্গা খোল ঘাড়ে ক'রে এসে জুটলো। তার মুখে ও গালে কিসের ঘা, কাপড়-চোপড় অতি নোংরা, মাথায় লম্বালম্বা চুল। ছ-সাত দিন রইল, দাদাও কিছু বলে না, বৌদিদিও না। আমি একদিন বৌদিদিকে বললাম—বৌদি, দেখচো না ওর মুখে কিসের ঘা। বাড়ির থালা গেলাসে ওকে খেতে দিও না। ও ভাল ঘা নয়, ছেলেপুলের বাড়ি, ওকে পাতা কেটে আন্‌তে বললেই তো হয়, তাতেই খাবে। আটদিন পরে ছোকরা চলে গেল। বোধ হয় আরও আট দিন থাক্‌লে দাদা বৌদিদি আপত্তি করত না।

বৌদিদি খাটতে পারে ভূতের মত। ঝি নেই, চাকর নেই, একা হাতে কচি ছেলে মানুষ-করা থেকে স্থুরু করে ধানসেদ্ধ, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা, জল-তোলা—সমস্ত কাজই করতে হয়। কোনদিন ব্যাজার হ'তে দেখলাম না সে জন্যে বৌদিদিকে।

এদের মায়ায় আমিও যেন দিনকতক জড়িয়ে গেলাম। এরকম শান্তির সংসার কতকাল ভোগ করি নি—বোধ হয় চা-বাগানেও না, কারণ সেখানে বাবা মাতাল হয়ে রাত্রে ফিরবেন, সে ভয় ছিল। ভেবে দেখ্‌লাম সত্যিকার শান্তি ও আনন্দভরা জীবন আমরা কাকে বলে কোনদিন জানি নি—স্রোতের শেওলার মত বাবা স্ত্রীপুত্র নিয়ে

এ-চাবাগানে ও-চাবাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, শেষকালে না-হয় কিছুদিন উম্প্লাং বাগানে ছিলেন—এতে মন আমাদের এক জায়গায় বস্‌তে না-বস্‌তেই আবার অন্য জায়গায় উঠে যেতে হ'ত—এই সব নানা কারণে নিজের ঘর, নিজের দেশ, এমন কি নিজের জাতি ব'লে কোন জিনিস আমাদের ছিল না। তার অভাব যদিও আমরা কোন দিন অনুভব করি নি—অত অল্পবয়সে করবার কথাও নয়—বিশেষ ক'রে যখন হিমালয় আমাদের সকল অভাবই পূর্ণ করেছিল আমাদের ছেলেবেলাতে।

এখানে সকলের চেয়ে আমার ভাল লেগেচে বৌদিদিকে। আমি বৌদিদির ধরনের মেয়ে কখনও দেখি নি। যা তা জিনিষ দিয়ে বৌদিদিকে খুশী করা যায়, যে-কোন ব্যাপার যত অসম্ভবই হোক্ না কেন—বৌদিদিকে বিশ্বাস করানো যায়, খুব অল্পেই ভয় দেখানো যায়—ঠকিয়ে কোন জিনিষ বৌদিদির কাছ থেকে আদায় করা মোটেই কঠিন নয়। অথচ একটি সহজাত বুদ্ধির সাহায্যে বৌদিদি ঘরকন্না ও সংসার সম্বন্ধে দাদার চেয়েও ভাল বোঝে, বড় কিছু একটা আশা কখনও করে না, ভারি গোছালো, নিজের ধরনে ঠাকুরদেবতার ওপর ভক্তিমতী। কেবল একটা দোষ আমার চোখে বড় লাগে—নিজে যে-সব কুসংস্কার মানে, অপরকেও সেই সব মান্‌তে বাধ্য করবে। অনেক ব্যাপারে দেখলাম ভাবটা এই রকম, আমার সংসারে যতক্ষণ আছ ততক্ষণ তোমায় মান্‌তেই হবে, তার পর বাইরে গিয়ে হয় মেনো না-হয় না-মেনো। কড়া কথা ব'লে নয়, মিনতি অনুরোধ ক'রে মানাবে। কড়া কথা বলতে বৌদিদি জানে না—টকের ঝাঁজ নেই কোথাও বৌদিদির স্বভাবে, সবটাই মিষ্টি।

সপ্তাহ দুই পরে ওদের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আস্‌বার সময়ে দাদা বললে—শোন্ জিতু, আটঘরার বাড়ি সম্বন্ধে কি

করা যাবে, তুই একটা মত দিস্। ছোটকাকীমা ঠিকই বলেচেন—ওবাড়ি আমরা ছাড়বো না। আর একটা কথা শোন্, একটা চাকরি দেখে নে, এরকম ক'রে বেড়াস নে। তোর বৌদিদি বলছিল এই বছরেই তোর একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। তার পর দু-ভায়ে ঘরবাড়ি করি আয়, দু-জনে মিলে টাকা আন্‌লে ভাবনা কিসের সংসার চালাবার? সংসারটা বেশ গড়ে তুলতে পারবো এখন। আর ছ্যাখ্, পয়সা রোজগার করতে না পারলে, ঘরবাড়ি না থাক্‌লে কি কেউ মানে? নিজের বাড়ি কোথাও একখানা থাকা চাই, নইলে লোকে বড় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।

দাদার শুধু সংসার আর সংসার। আর লোকে আমার সম্বন্ধে কি ভাবলে না-ভাবলে তাতেই বা আমার কি? লেখাপড়া শিখলে না কিছু না, দাদা যেন কেমন হয়ে গিয়েচে। লোকে কি বলবে সেই ভাবনাতেই আকুল। দাদার ওই সব ছাপোষা গেরস্থালী-ধরনের কথাবার্ত্তায় আমার হাসি পায়, দাদার ওপর কেমন একটা মায়াও হয়।

ভাবলুম, কোথায় যাওয়া যায়? কলকাতায় গিয়ে একটা চাকুরি দেখে নেবো? দাদা যদি তাতেই সুখী হয়, তাই না-হয় করা যাক। আমি নিজে বিয়ে করি আর না-করি, ওদের সংসারে কিছু কিছু সাহায্য করা তো যাবে! নৈহাটির কাছে অনেক পাটের কল আছে, কলকাতায় না গিয়ে সেখানে গেলে কেমন হয়? পাটের কলে শুনেচি চাকুরি জোটান সহজ।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কলকাতাতেই এলাম। মাস দুই কাটল, একটা মেসে থাকি আর নানা জায়গায় চাকুরির চেষ্টা করি। কোন জায়গাতেই কিছু সুবিধে হয় না।

একদিন রবিবারে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড্ ধরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর চলে গেছি, দমদমাও প্রায় ছাড়িয়েচি, হঠাৎ বড় বৃষ্টি এল। দৌড়ে একটা বাগানবাড়ির ঘরে আশ্রয় নিলাম। ঘরটাতে বোধ হ'ল বহুদিন কেউ বাস করে নি, ছাদ ভাঙ্গা, মেজের সিমেণ্ট উঠে গিয়েচে। বাগানটাতেও জঙ্গল হয়ে গিয়েচে।

একটা লোক সেই ভাঙ্গা ঘরে বারান্দাটাতে শুয়ে ছিল, বোধ হয় ক'দিন থেকে সেখানে সে বাস করচে, একটা দড়ির আল্‌নায় তার কাপড়-চোপড় টাঙানো। আমায় দেখে লোকটা উঠে বস্‌ল,—এসো, বসো বাবা। বেশ ভিজেচ দেখচি বৃষ্টিতে! বসো।

লোকটার বয়স পঞ্চাশের ওপর, পরনে গেরুয়া আলখেল্লা, দাড়ী-গোঁপ কামানো। আমায় জিগ্যেস্ করলে—তোমার নাম কি বাবা? বাড়ি এই কাছাকাছি বুঝি?

নাম বললাম, সংক্ষেপে পরিচয়ও দিলাম।

বললে—বাবা, ভগবান তোমায় এখানে পাঠিয়েচেন আজ। তুমি বসো, তুমি আমার অতিথি। একটু মিষ্টি খেয়ে জল খাও—

আমি খেতে না চাইলেও লোকটা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তারপর কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ ডান হাতটা শূন্যে একবার নেড়েই হাত পেতে বললে—এই নাও—

হাতে একটা সন্দেশ।...

আমি ওর দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে আছি দেখে বললে—আর একটা খাবে? এই নাও।

হাত যখন ওঠালে, আমি তখন ভাল ক'রে চেয়েছিলাম, হাতে কিছু ছিল না। শূন্যে হাতখানা বার দুই নেড়ে আমার সামনে যখন পাতলে তখন হাতে আর একটা সন্দেশ। অদ্ভুত ক্ষমতা তো লোকটার!

আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল, বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল কিন্তু আমি আর নড়লাম না সেখান থেকে।

লোকটা অনেক গল্প করলে। বললে—আমি গুরুর দর্শন পাই কাশীতে। সে অনেক কথা বাবা। তোমার কাছে বলতে কি আমি বাঘ হ'তে পারি, কুমীর হ'তে পারি। মন্ত্রপড়া জল রেখে দেবো, তার পর আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলে বাঘ কি কুমীর হয়ে যাব—আর একটা পাত্রে জল থাকবে, সেটা ছিটিয়ে দিলে আবার মানুষ হবো। সাত-ক্ষীরেতে ক'রে দেখিয়েছিলাম, হাকিম উকিল মোক্তার সব উপস্থিত সেখানে—গিয়ে জিগ্যেস্ ক'রে আস্তে পার সত্যি না মিথ্যে। আমার নাম চৌধুরী-ঠাকুর—গিয়ে নাম করো।

আমি অবাক হয়ে চৌধুরী-ঠাকুরের কথা শুন্‌ছিলাম। এসব কথা আমার অবিশ্বাস হ'ত যদি-না এই মাত্র ওকে খালি-হাতে সন্দেশ আন্‌তে না-দেখতুম। জিগ্যেস্ করলাম—আপনি এখন কি কলকাতায় যাচ্ছেন?

—না বাবা মুরশিদাবাদ জেলায় একটা গাঁয়ে একটা চাঁড়ালের মেয়ে আছে, তার অদ্ভুত সব ক্ষমতা। খাগড়াঘাট থেকে কোশ-দুই তফাতে! তার সঙ্গে দেখা করবো ব'লে বেরিয়েচি।

আমি চাকরি-বাকরী খুঁজে নেওয়ার কথা সব ভুলে গেলাম। বললাম—আমায় নিয়ে যাবেন? অবিশ্যি যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়।

চৌধুরী-ঠাকুর কি সহজে রাজী হন, অতিকষ্টে মত করালুম। তারপর মেসে ফিরে জিনিষপত্র নিয়ে এলাম। চৌধুরী-ঠাকুর বললেন—এক কাজ করা যাক্ এস বাবা। আমার হাতে রেলভাড়ার টাকা নেই, এস হাঁটা যাক।

আমি বললাম—তা কেন ? আমার কাছে টাকা আছে, দু'জনের রেলভাড়া হয়ে যাবে।

চাঁড়াল মেয়েটির কি ক্ষমতা আছে দেখ্‌বার আগ্রহে আমি অধীর হয়ে উঠেচি।

খাগ্‌ড়াঘাট ষ্টেশনে পৌঁছতে বেলা গেল। ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরে একটা ছোট মুদির দোকান। সেখানে যখন পৌঁছেচি, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। দোকানের সাম্‌নে বটতলায় আমরা আশ্রয় নিলাম। রাত্রে শোবার সময় চৌধুরী-ঠাকুর বললেন, আমার এই দুটো টাকা রেখে দাও গে তোমার কাছে! আজকাল আবার হয়েচে চোর-ছেঁচড়ের উৎপাত। তোমার নিজের টাকা সাবধানে রেখেচ তো ?

চৌধুরী-ঠাকুরের ভয় দেখে আমার কৌতুক হ'ল। পাড়াগাঁয়ের মানুষ ত হাজার হোক্‌, পথে বেরুলেই ভয়ে অস্থির। বললাম—কোন ভয় নেই, দিন আমাকে। এই দেখুন ঘড়ির পকেটে আমার টাকা রেখেচি, বাইরে থেকে বোঝাও যাবে না, এখানে রাখা সব চেয়ে সেফ্‌—

সকালে একটু বেলায় ঘুম ভাঙলো। উঠে দেখি চৌধুরী-ঠাকুর নেই, ঘড়ির পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার টাকাও নেই, চৌধুরী-ঠাকুরের গচ্ছিত দুটা টাকাও নেই, নীচের পকেটে পাঁচ-ছ আনার খুচরা পয়সা ছিল তাও নেই।

মানুষকে বিশ্বাস করাও দেখচি বিষম মুস্কিল। ঘণ্টাখানেক কাটল, আমি সেই বটতলাতে বসেই আছি। হাতে নাই একটি পয়সা, আচ্ছা বিপদে তো ফেলে গেল লোকটা! মুদিটি আমার অবস্থা দেখে শুনে বললে—আমি চাল ডাল দিচ্চি, আপনি রেঁধে খান বাবু। ভদ্রলোকের ছেলে, এমন জুয়োচোরের পাল্লায় পড়লেন কি ক'রে? দামের জন্যে ভাববেন না, হাতে হ'লে পাঠিয়ে দেবেন। মানুষ দেখলে চিনতে [illegible]

হয় না, আপনি যা দরকার নিন্ এখান থেকে। ভাগ্যিস্ আপনার স্থুট-কেস্‌টা নিয়ে যায় নি?

দুপুরের পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে পশ্চিম মুখে চল্‌লাম। আমার স্থুট্‌কেসে একটা ভাল টর্চ্চলাইট ছিল, মুদিকে ওর চাল-ডালের বদলে দিতে গেলাম, কিছুতে নিলে না।

পথ হাঁটি, একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা। সন্ধ্যার কিছু আগে একটা বড় পাকুড়গাছের তলায় পথের ধারে জনকয়েক লোক দেখে সেখানে গেলাম। চারজন পুরুষ মানুষ ও একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক—তারা গাছতলায় উনুন জেলে রাঁধবার উদ্যোগ করছে।

এক জন বললে—কনে থেকে আস্‌ছেন বাবু?

—খাগড়াঘাট থেকে—তোমরা আস্‌চ কোথা থেকে?

—আমরা আস্‌তেছি তো বড় দূর থেকে। যাব কেঁদুলীর মেলায়।

এক জন তামাক সেজে নিয়ে এসে বললে—তামাক ইচ্ছে করুন বাবু। ও জুড়ন, বাবুকে বসবার কিছু দে।

—আমি তামাক খাইনে, তোমরা খাও। তোমরা দেশ থেকে বেরিয়েচ কতদিন?

জুড়ন বৈরাগী এগিয়ে এসে সঙ্গীর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে বললে—বাবু বড় কষ্ট, আর পূন্নিমেতে বাড়ির বার হওয়া হয়েছে। রাস্তায় কি অনাবিষ্টি! তিনদিন ধরে আর থামে না, জিনিষপত্তর ভিজে একসা, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট কোশ এখান থেকে—নওদা, চেনেন? সেই নওদার সন্নিপত্যি আমাদের বাড়ী, হাতীবাঁধা গ্রাম, যশোর জেলা।

গল্পগুজবে আধঘণ্টা কাটলো। জুড়ন বললে—দাদাঠাকুরের খাওয়া-দাওয়ার কি হবে? এক কাজ করুন দাদাঠাকুর, আমাদের সঙ্গে সবই আছে, রসুই করুন, আমরা পেরসাদ পাব এখন। ব্রাহ্মণের পাতের অন্ন কতকাল খাই নি। ও কাপাসীর মা, পুকুর থেকে জলডা নিয়ে এস, আর রাত কোরো না।

আমি বিশেষ কোন আপত্তি করলাম না! এদের সঙ্গ আমার বড় ভাল লাগ্‌ছিল, এই রাত্রে তা ছাড়া যাবই বা কোথায়? রান্না চড়িয়ে দিলাম। কাপাসীর মা আলু বেগুন ছাড়াতে বস্‌লো। ওদের মধ্যে এক জনের নাম বাবুরাম—সে পুকুরে চাল ধুতে গেল। জুড়ন শুক্‌নো কাঠকুটো কুড়িয়ে আন্‌তে গেল।

পথের ধারে এই দরিদ্র, সরল মানুষগুলির সঙ্গে গাছতলায় রাত্রি-যাপন, জীবনের এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। রাতটিও বেশ, কি রকম সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে! নির্জ্জন মাঠে জ্যোৎস্নায় অনেক দূর দেখা যাচ্ছে।

এই জ্যোৎস্নারাতে আমার কেবল মনে হয় আমি আর সে-সব জিনিষ দেখি নে! কতদিন দেখি নি। যখন চিন্‌তে শিখি নি, তখন রোগ ভেবে যাকে ভয় করেছি কত, এখন তা হারিয়ে বুঝেছি কি অমূল্য সম্পদ ছিল তা জীবনের। বোধ হয় মাঠের ধারের এই সবুজ দুর্ব্বাঘাসের শয্যায় শুয়ে চোখ বুঁঝে ভাব্‌লে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই—এই সব বিজন মাঠে শেষপ্রহরের জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে মুখ উঁচু ক'রে চেয়ে থাক্‌লে অনন্তপথের যাত্রীদের দেখা যায় ওপর আকাশের জ্যোৎস্নামাখা বায়ুস্তর তাদের গমন পথে পথে দেহগন্ধে সুরভি হয়—পরের দুঃখে কোনো দয়ালু আত্মা যে চোখের জল ফেলে, নদী-সমুদ্রে ঝিনুকের মধ্যে পড়লে তা থেকে মুক্তা হয়, বিলবাঁওড়ের পদ্মফুলে পড়লে পদ্মমধুর সৃষ্টি করে···আমার নিবে-যাওয়া দৃষ্টি-প্রদীপে আলো জ্বেলে দিতে যদি কেউ পারে তো সে ওরাই পারবে।

সীতার কথা মনে হয়। আচ্ছা, এই রাত্রে এতক্ষণ সে কি করছে? যে-জীবনের মধ্যে সে আছে, সে-জীবনের জন্তে সে তৈরী হয় নি। হয়ত রান্নাঘরে বসে এতক্ষণে এইরকম রাঁধচে, ও অত বই পড়তে ভালবাসে, তাদের ঘরে একখানাও বই নেই, বই পড়া হয়ত সেখানে ঘোর অপরাধ. যেমন ছিল জ্যাঠাইমার কাছে। জীবনের যে-কোনো আনন্দভরা অভিজ্ঞতার সময়েই সীতার ব্যর্থ জীবনের কথা আমার মনে না এসে পারে না।

সবাই মিলে খেতে বস্‌লাম। রান্না হ'ল বড়ির ঝোল, আলুভাতে, পটলভাজা। কাপাসীর মা অবিশ্যি দেখিয়ে দিল। কাল ঠিক এই সময়ে খাগড়াঘাটের পথে বটতলায় চৌধুরী-ঠাকুর ভজন গাইচে। কি খারাপ লোকটা! টাকার দরকার ছিল, আমায় বললে তো আমি দিতামই। চুরি ক'রে কি হ'ল!

জুড়ন বৈরাগী খাওয়া-দাওয়ার পরে গল্প করতে লাগল। বলেল—শুনুন দাদাঠাকুর, এই যে কাপাসীর মা দেখচেন, এর বাবা অনেক টাকা জমিয়ে মারা গিয়েছিল। খেতো না, শুধু টাকা জমাতো। মরবার সময় ভাইকে বললে, অমুক জায়গায় মালসায় টাকা পোঁতা আছে, নিয়ে এসে আমায় দেখা। তা এই পানচালার কোণে ভাঙ্গা উনুনের মধ্যি মাল্‌সা পোঁতা ছিল—কেউ জান্‌তো না। মরবার সময় তাই টাকার মাল্‌সা সামনে নিয়ে খোলে। টাকা দেখতি দেখতি মরে গেল।

—সে টাকা কে পেলে তার পর?

—তারপর বুড়ো তো মরে গেল। তার ভাই রটানে মাল্‌সাসুদ্ধু টাকা সেই রাতি গোলমালে চুরি হয়েছে। এমন কি টাকার অভাবে বুড়োর ছেরাদ্দটাও হ'ল না। পেটের ওপর বাণিজ্যি ক'রে টাকা জমিয়ে গেল, নিজের ভোগে ত লাগলোই না—একটিমাত্তর মেয়ে এই কাপাসীর মা, তার ভোগেও হ'ল না। টাকার মাল্‌সা রাতারাতি কে যে কোথায় সরিয়ে ফেললে—

কাপাসীর মা ঝাঁজের সঙ্গে ব'লে উঠল—হ্যাগো হ্যাঁ। সরিয়ে ফেলতে এসেছিল পাড়ার লোক। যে নেবার সে নিয়েছে। আমি কি আর কিছু জানি নে, না বুঝিনে ? ধম্ম আছেন মাথার ওপর—তিনি দেখবেন। ছ-মাসের মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে লোকের দোর-দোর ঘুরিচি দুটো ভাতের জন্যি—আমায় যিনি বাপের ধনে—

বাবুরাম বললে—আর শাপমন্যি করো না বাপু। তোমার অদেষ্টে থাকত, পেতে। বাদ দেও ওসব কথা। উনুনে আগুন আছে কিনা দেখো তো, আর একবার কল্‌কেটা ধরাই।

ওদের মধ্যে আর এক জন বললে—ও জুড়নখুড়ো, স্বরূপগঞ্জের বাজারে কাল দুপুরের আগে পৌঁছানো যাবে না ?

—দুটোর কম হবে না। ছ'ডী কোশ, তার আগে খাওয়া-দাওয়া ক'রে নেওয়া যাবে।

বাবুরাম বললে—এবার কেঁদুলীর মেলায় লোক যাচ্ছে কই তেমন জুড়নখুড়ো ?···সে বছর দেখেছিলে তো ? পথে সারারাতই লোক হাঁটতো।

অদ্ভুত লাগছিল এ রাতটি আমার কাছে। এত কথাও মনে এনে দেয়! ঘুম আর আসে না। ভাবছিলাম মানুষ এত অল্পেও সুখী হয়! আর সুখ জিনিষটা কি অনির্দ্দেশ্য রহস্যময় ব্যাপার—এই নির্জ্জন রাত্রে মুক্ত অপরিচিত প্রান্তরের মধ্যে তারাখচিত আকাশের নীচে শুয়ে সবাই সুখের স্বপ্ন দেখ্‌ছে—কিন্তু এক জনের সুখের ধারণার সঙ্গে অন্য আর এক জনের ধারণার কি বিষম পার্থক্য!

সকালে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পশ্চিম মুখেই হাঁটি। রাঢ় দেশের বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে পথ। রাঙা বালি, দিগন্তে তালবনের সারি। হয়ত মাঠের মাঝে প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড দীঘি, তালবনে ঘেরা। কি ফাঁকা জায়গা এ-সব! মনে হ'ত যেন সীমাহারা দিক্‌সমুদ্রে ভেলা

ভাসিয়ে চলেছি, কোন্ অজ্ঞাত দিগন্তের বননীল উপকূলে গিয়ে ভিড়বো, কোনখানে তমালতরুনিকরে বনভূমি শ্যামায়মান, সেখানে গন্ধভরা অন্ধকার বীথিপথ বেয়ে অভিসারিকারা চিরদিন পা টিপে টিপে হাঁটে ; বৃন্দাবনের দিন ফুরিয়ে গেল, মহাভারতের যুগ কেটে গেল, যমুনার তটে কেলিকদম্বের ছায়া কালের অন্ধকারে লুকিয়েছে, তবুও ওদেরও যাওয়ার শেষ হবে না, আমারও না।

মাঠের পথের প্রথমটায় কেঁদুলি মেলার লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'ত। পরে আর তেমন লোক দেখিনি, এত বড় মাঠের মধ্যে অনেক সময় আমি একাই পথিক। এই ধূ ধূ সীমাহীন প্রান্তরে সূর্য্যাস্তের কি মূর্ত্তি! আমাদের অঞ্চলে কোনোদিন তা দেখিনি। অন্ধকার হ'লে মাঠের মধ্যেই কতদিন রাত কাটিয়েছি। ছেলেবেলায় চা-বাগানে কাটিয়ে এই শিক্ষা পেয়েছিলাম, রাত্রিতে যে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে, একথা মনেই ওঠে না। শীতের দেশ নয়, ঘন হিমারণ্যের হিংস্র শ্বাপদ নেই এখানে—নিতান্ত নিরীহ, নিরাপদ দেশ—এখানে নক্ষত্রভরা মুক্ত আকাশের চাঁদোয়ার তলায় মাটির ওপর যা-হয় একটা কিছু পেতে রাত কাটানোর মত আনন্দ খাট-পালঙ্কে শুয়ে পাই নি।

একদিন এই অবস্থায় একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হ'ল। একটা অপূর্ব্ব নাম-না-জানা অনুভূতির অভিজ্ঞতা। মুখে সে কথা বলা যায় না, বোঝানো যায় না, শুধু সে-ই বোঝে, যার এ রকম হয়েছে।

সকালে বামুনহাটি ব'লে একটা গ্রামে এক গ্রাম্য হাতুড়ে কবিরাজের অতিথি হয়েছিলুম সেদিন ; তাঁর স্ত্রী একটি রণচণ্ডী—যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, তার গালবাদ্যের বিরাম ছিল না। আমি গিয়ে সবে বসেছি,

তিনি দোরের আড়াল থেকে স্বামীর উদ্দেশ্যে আরম্ভ করলেন—ও অলপ্পেয়ে মিন্‌সে, আমার সঙ্গে তোমার এত শত্তুরতা কিসের বল দিকি? রান্নাঘরের রোয়াকে চালা তুলতে তোমায় বলেছে কে? গরমে একে ঘরের মধ্যে টেঁকা যায় না উনুন জ্বল্‌লে, যাও বা একটু হাওয়া আসতো, চালা তুল্‌লে হাওয়া আসবে তো ও ড্যাক্‌রা? ওই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তোমার পিণ্ডি রাঁধবো খেও।

স্ত্রী চলে গেলে কবিরাজ-মশাই বললেন—আর বলেন কেন মশাই, হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল। শুনলেন তো দাঁতের বাদ্যি—ওই রকম সদাসর্ব্বদা চলছে। আর ঘোর শুচিবাই, দুনিয়ার জিনিষ সব অশুদ্ধু। দিনের মধ্যে সাতবার নাইছে, নিমুনিয়া হয়ে যদি না মরে তবে কি বলেছি। আজ এক বছর ধরে ওই গোয়ালের একপাশে তক্তপোষ পেতে শোয় আলাদা—ঘরের জিনিষ সব অশুদ্ধু যে, সেখানে কি শোয়া যায়? ওরকম ছিল না মশায়, ছেলেটা মরে গিয়ে অবধি ওই রকম—

তারপর যে কথা বলছিলাম। বামুনহাটি থেকে বিকেলে বার হয়ে ক্রোশ-তিনেক যেতে-না-যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে একটা ছোট নদী, রাস্তা থেকে একটু দূরে। নদী এত ছোট যে তাকে আমাদের দেশ হ'লে বলতো খাল। দু-পাড়ে রাঙা কাঁকর বিছানো, ধারে ধারে কাঁটাঝোপ আর তালগাছ। সেখানে রাত্রি যাপন করবো বলে মাটির ওপর ছোট সতরঞ্চিখানা পেতে তার ওপরে বসলাম। কোন দিকে জনপ্রাণী নেই।

খালের ওপারে একটা তালগাছের মাথায় শুক্‌নো পাতা হাওয়ায় খড় খড় শব্দ করছে—এই অন্ধকার প্রদোষে তালগাছের মাথার ওপরকার আকাশে নিঃসঙ্গ একটি তারা—আমি একবার তারাটির দিকে চাইছি, একবার চারিদিকের নিস্তব্ধ, পাত্‌লা অন্ধকারের দিকে

চাইছি। হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা আনন্দ হ'ল। সে আনন্দ এত অদ্ভুত যে বেদনা থেকে তা বেশী পৃথক নয়, সে পুলক চোখে জল এনে দিল, মনে কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য অভাবের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে যেন।

কিছুক্ষণ আগেও যে-জগতে ছিলাম, এ যেন সে-জগৎ নয়!

এ জগৎ যুগযুগের তুচ্ছ জনকোলাহল কত গভীর মাটির স্তরের নীচে চাপা পড়ে যাওয়ার জগৎ। ফুল ফুটে নির্জ্জনে ঝরে পড়ার জগৎ··· অজানা কত বনপ্রান্তরে কত অশ্রুভরা আনন্দতীর্থের জগৎ···কত স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া···কত আশার হাসি মিলিয়ে যাওয়া···

শুধু নির্জ্জনে চূতবীথির, তালীবনরেখার মাথার ওপর শ্যামলতার পাড়টানা সীমাহীন নীল শূন্যে বহুদূরের কোন ক্ষীণরশ্মি নক্ষত্রের সঙ্গে এ জগৎ এক···শতাব্দীতে শতাব্দীতে কত লক্ষ মনের আনন্দ, আশা, গর্ব্ব, হাসি, দৃষ্টি-ক্ষমতার বাহাদুরী কোথায় মুছিয়ে নিয়ে ফেলে দেয়, ক্ষীণ দুর্ব্বল হাত প্রিয়কে নির্ম্মম জীবনের গ্রাস থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, না বুঝে হাসে, খুশী হয়, আশার স্বপ্নজাল বোনে···

অন্ধকারে কোন্ খনিগর্ভে চুনাপাথর হয়ে যায় তাদের হাড়···

আবার নবীন বুকে নবীন আনন্দ জেগে ওঠে। আবার হাসি, আবার খুশী হওয়া, আবার আশার স্বপ্নজাল বোনা··· অথচ সব সময় তাদের মাথার ওপর দিয়ে অনন্ত কালের প্রবাহ ছুটে চলে, পুরনো পাতা ঝরে পড়ে, নতুন গান পুরোনো হ'য়ে যায়। গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে কত দৃশ্য, অদৃশ্য লোকে, কত অজানা জীবজগতেও এরকম বেদনা, দীনতা দুঃখ। দূরের সে-সব অজানালোকে ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদী দীর্ঘ বনগাছের ছায়ায় বয়ে যায়, তাদের শান্ত বন-বীথির মূলে প্রিয়জনের, বহুদিন-হারা প্রিয়জনের কথা ভাবে—নদীর স্রোতে শেওলা-দাম-ভাসা জলে অনন্তের স্বপ্ন দেখে···যে অনন্ত তার চারধার

ঘিরে আছে সব সময়, তার নিঃশ্বাসে, তার বুকের অদম্য প্রাণস্রোতে, তার মনের খুশীতে, নাক্ষত্রিক শূন্যপারের মিট্‌মিটে তারার আলোয়। দূরের ওই দিগ্বলয় যেখানে চুপি চুপি পৃথিবীর পানে মুখ নামিয়ে কথা কইছে, শূন্যপথে অদৃশ্য চরণে দেবদেবীরা যেন এই সন্ধ্যায় ওখানে নেমে আসেন। যখন নদীজল শেষরৌদ্রে চিক্ চিক্ করে, কূলে কূলে অন্ধকার ফিরে আসে, পানকলস শেওলার ফুল কালো জলে সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়—তখনই। আমার মনে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, এমন এক দেবতার ছায়া মনে নামে—যেন জ্যাঠাইমাদের শালগ্রামশিলার চেয়ে বড়। আটঘরার বটতলার সেই পাথরের প্রাচীন মূর্ত্তিটির চেয়ে বড়, মহাপুরুষ খ্রীষ্টের চেয়েও বড়—চক্রবালরেখায় দূরের স্বপ্নরূপে সেই দেবতারই ছায়া, এই বিশাল প্রান্তরে ম্লান সন্ধ্যার রূপে মাথার ওপর উড়ে-যাওয়া বালিহাঁসের সাঁই সাঁই পাখার ডাকে।···সেই দেবতা আমায় পথ দেখিয়ে দিন। আমি যা হারিয়েছি তা আর চাই নে, আমি চাই আজকার সন্ধ্যার মত আনন্দ, এবং যে নতুন দৃষ্টিতে এই এক মুহূর্ত্তের জন্যে জগৎটাকে দেখেছি সে দৃষ্টি হারিয়ে যাবে জানি, সে আনন্দ জীবনে অক্ষয় হয় না জানি—কিন্তু আর একবারও যেন অন্ততঃ তারা আসে আমার জীবনে।

১১

পরদিন দুপুরে সন্ধান মিলল ক্রোশ-চারেক দূরে দ্বারবাসিনী গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ আখড়াবাড়ি আছে, সেখানে মাঝে মাঝে ভাল ভাল বৈষ্ণব সাধু আসেন। গাঁয়ের বাইরে আখড়া-বাড়ি, সেখানে থাক্‌বার জায়গাও মেলে।

সন্ধ্যার সামান্য আগে দ্বারবাসিনীর আখড়াবাড়িতে পৌঁছলাম। গ্রামের প্রান্তে একটা পুকুরের ধারে অনেকগুলো গাছপালা—ছায়াশূন্য, কাঁকরভরা, উষর ধূ ধূ মাঠের মধ্যে এক জায়গায় টলটলে স্বচ্ছ জলেভরা পুকুর। পুকুরপাড়ে বকুল, বেল, অশোক, তমাল, নিম গাছের ছায়াভরা, ঘনকুঞ্জ দু-চারটে পাখীর সান্ধ্যকাকলি—মরুর বুকে শ্যামল মরুদ্বীপের মত মনে হ'ল। এ-অঞ্চলে এর নাম লোচনদাসের আখড়া। আমি যেতেই একজন প্রৌঢ় বৈষ্ণব, গলায় তুলসীর মালা, পরণে মোটা তসরের বহির্ব্বাস, উঠে এসে জিগ্যেস্ করলে, কোত্থেকে আসা হচ্চে বাবুর? তারপর তালপাতার ছোট চাটাই পেতে দিলে বস্‌তে, হাত-মুখ ধোয়ার জল নিজেই এনে দিলে। গোলমত উঠোনের চারিধারে রাঙা মাটির দেওয়াল-তোলা ঘর, সব ঘরের দাওয়াতেই দুটি-তিনটি বৈষ্ণব, খুব সম্ভবতঃ আমার মতই পথিক, রাত্রের জন্যে আশ্রয় নিয়েছে।

সন্ধ্যার পরে আমি তালপাতার চাটাইয়ে বসে একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণবের একতারা বাজ্‌না ও গান্ শুন্‌চি—এমন সময় একটি মেয়ে আমার সামনে উঠোনে এসে জিগ্যেস্ করলে—আপনি রাত্তিরে কি খাবেন—?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—আমায় বলচেন?

মেয়েটি শান্ত সুরে বললে—হ্যাঁ। রাত্তিরে কি ভাত খান?

আমি থতমত খেয়ে বললাম—যা হয়, ভাতই খাবো। আপনাদের যাতে সুবিধে।

মেয়েটি বললে—আমাদের সুবিধে নিয়ে নয়—এখানে আপনার যা ইচ্ছে হবে খেতে তাই বল্‌বেন। চা খান্ কি আপনি?

.এ-পর্য্যন্ত কোন জায়গায় এমন কথা শুনিনি, কোন মন্দিরে বা বৈষ্ণবের আখড়াতেই নয়। ডেকে কেউ জিগ্যেস্ করে নি আমি কি খেতে চাই। বললাম—চা খাওয়া অভ্যেস আছে, তবে সুবিধে না হ'লে—

মেয়েটি আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই চলে গেল এবং মিনিট কুড়ি পরে এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে নিঃসঙ্কোচে আমার হাতেই দিলে। বললে—চিনি ঠিক হয়েছে কিনা দেখুন।

আবার তাকে দেখলাম রাত্রে খাবার সময়ে। লম্বা দাওয়ায় সারি দিয়ে সাত-আট জন লোক খেতে বসেছে, মেয়েটি নিজের হাতে সবাইকে পরিবেশন করলে। প্রকাণ্ড বড় ভাতের ডেক্‌চী নিজে দু-হাতে ধরে নিয়ে এসে আমাদের সাম্‌নে রাখলে—তা থেকে থালা ক'রে ভাত নিয়ে সকলকে দিতে লাগল। আমার পাশের লোকটিকে বল্‌লে—ও কি শ্যামা কাঁকা, নাউয়ের ঘণ্ট দিয়ে আর দুটো খান্। ওবেলা ত খাওয়াই হয় নি!

সে সসম্ভ্রমে বললে—না দিদিঠাক্‌রুণ, আমাকে বল্‌তে হবে না আপনার। পেটে জায়গা নেই। তেঁতুল মেখে বরং দুটো খাবো—

—হ্যাঁ কাসছেন, তেঁতুল না খেলে চল্‌বে কেন? দুধ দিচ্চি—

তারপর আমার সাম্‌নে এসে বললে—আপনার বোধ হয় ওবেলা খাওয়াই হয় নি? আপনাকেও দুধ দিচ্ছি।

এতগুলো লোক খেতে বসেছে, দুধ দেওয়া হ'ল মোটে তিন

জনকে—কিন্তু সে ব্যক্তিগত প্রয়োজনবিশেষে এবং তার বিচারকর্ত্রী ওই মেয়েটিই। আমার কৌতুক হ'ল ভারি।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম চমৎকার মেয়েটি ত! দেখতে সুশ্রী বটে, তবে খুব সুন্দরী নয়। কিন্তু আমি ওরকম মুখের গড়ন কখনও দেখি নি, প্রথমে সন্ধ্যাবেলায় ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল একথা। বার-বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়—সে ওর সুন্দর ডাগর চোখ দুটির জন্যে, না ওর মুখের একটি বিশিষ্ট ধরনের লাবণ্যময় গড়নের জন্যে, রাত্রে তা ভাল বুঝতে পারি নি। মেয়েটি কে? নিতান্ত ছেলেমানুষ তো নয়—সারাদেহে যৌবনশ্রী ফুটে উঠেছে পরিপূর্ণ ভাবেই—এখানে ওভাবে থাকে কেন? আখড়ার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? নানা প্রশ্ন মনে উঠে ঘুম আর আসে না।

পরদিন সকালে মেয়েটির সঙ্গে অনেকবার দেখা হ'ল। অতিথিদের কারও অযত্ন অসুবিধে না হয় সেদিকে দেখ্‌লাম ওর বেশ দৃষ্টি আছে। এ-অঞ্চলে চালে কাঁকর ব'লে সে নিজে সকালে কুলো নিয়ে বসে প্রায় আধমণ চাল ঝাড়লে। বেলা নটার সময় হঠাৎ এসে আমায় বললে—আপনার ময়লা জামা-কাপড় যদি পুঁটুলিতে থাকে ত দিন্ কেচে দেবো। আপনার গায়ের জামাটাও ময়লা হয়ে গিয়েছে খুলে দিন্। খুব রোদ, দুপুরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

আমি প্রথমটা একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলাম। তার পর দেখলাম সে সকলকেই জিগ্যেস্ করছে কারও ময়লা কাপড়-চোপড় কিছু আছে কিনা। এক জন বৃদ্ধ বাউলের গেরুয়া আলখেল্লা ময়লা হয়েছিল ব'লে খুলিয়ে নিয়ে গেল। পরে শুনলাম মেয়েটি ওরকম প্রায়ই করে, আখড়াতে ময়লা জামা-কাপড়ে থাকবার যো নেই।

এখানে দিন দুই কাটবার পরে আর একটা জিনিষ আমার বিশেষ ক'রে চোখে পড়ল যে মেয়েটির মধ্যে কোন মিথ্যে সঙ্কোচ নেই। সহজ

সিধে ব্যবহার, কি কাজে, কি কথাবার্ত্তায়। সজীব ও দীপ্তিময়ী, যেন সঞ্চরিণী দীপশিখা, যদি শ্যামাঙ্গী মেয়েকে দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তৃতীয় দিন বিকেলে এসে বললে—পুকুরপাড়ের বাগান দেখেছেন? আসুন দেখিয়ে নিয়ে আসি।

এই কথাটা আমার বড় ভাল লাগল—এ পর্য্যন্ত আমি কোন মেয়ে দেখি নি যে বাগান ভালবাসে, দেখাবার জিনিস ব'লে মনে করে।

ওর সঙ্গে গেলাম। অনেক গাছ আমাকে সে চিনিয়ে দিলে। কাঞ্চন ফুলের গাছ এই প্রথম চিন্‌লাম। এক কোণে একটা বড় তমাল-গাছের তলায় ইটের একটা তুলসীমঞ্চ ও বেদী দেখিয়ে বললে—বাবা এখানে বসে জপ করতেন।

জিগ্যেস্ করলাম—আপনার বাবা এখন কোথায়?

মেয়েটি কেমন যেন একটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—বাবা ত নেই, এই চার বছর হ'ল মারা গিয়েছেন। এই যে পুকুরটা, বাবা কাটিয়েছিলেন, আর ওই বকুলগাছের ওপাশে বিষ্ণুমন্দির তুলছিলেন, শেষ ক'রে যেতে পারেন নি।

এই কথায় সূত্র খুঁজে পেলাম ওর সম্পূর্ণ পরিচয় জিগ্যেস্ করবার। এ দু-দিন কাউকে ওর সম্বন্ধে কোন কথা বলিনি, পাছে কেউ কিছু মনে করে। কৌতূহলের সঙ্গে বললাম—আপনার বাবার নামেই বুঝি এই আখড়া?

—কি, লোচনদাসের আখড়া? তা নয়, আমরা ব্রাহ্মণ, আমার বাবার নাম ছিল কাশীশ্বর মুখুয্যে। লোচনদাস এই আখড়া করেন, কিন্তু মরবার সময়ে বাবার হাতে এর ভার দিয়ে যান। তারপর বাবা আট-ন বছর আখড়া চালান। আখড়ার নামে যত ধানের জমি, সব বাবার। আসুন, বিষ্ণুমন্দির দেখবেন না?

মনে ভাবি বিষ্ণুমন্দির তুচ্ছ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত আমি সঙ্গে

যেতে রাজী আছি। পুকুরপাড়ের একটা বকুলগাছের পাশে একটা আধ-তৈরি ইটের ঘর। মেয়েটি বললে—গাঁথা শেষ হয় নি ত, হঠাৎ বাবা—তাইতে আদ্দেক হয়ে আছে। কাঁচা গাঁথুনি, আর-বছরের বর্ষায় ওদিকের দেওয়ালের খানিকটা আবার ভেঙে পড়ে গিয়েছে।

বকুলগাছে কি লতা উঠেচে, দেখিয়ে বললাম—বেশ ফুল ফুটেছে ত, কি লতা এটা?

ও বললে—মালতী লতা।

একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে বললে—জানেন? আমার নাম—

ওর কথার ভঙ্গিতে মনে হ'ল এ এখনও ছেলেমানুষ। বললাম—আপনার নাম মালতীলতা? ও! কাল উদ্ধবদাস বাবাজী রুনি ব'লে ডাকছিলেন আপনাকে, তাই ভাবলাম বোধ হয়—

ও সলজ্জ মুখে বললে—লতা নয়, মালা।

দু-জনেই আখড়াবাড়ির নাটমন্দিরে ফিরে এলাম। তার পর মালতীকে আর দেখতে পেলাম না, সেই যে সে রান্নাঘরে কি কাজ নিয়ে ঢুকল রাত দশটা পর্য্যন্ত আর সেখান থেকে বেরুল না।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠে মনে কেমন এক ধরনের মধুর অনুভূতি। মালতীকে যেন স্বপ্নে দেখেছি—ওর প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থিব অস্তিত্ব যেন নেই। স্বপ্ন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মনে পড়ল, বকুলতলায় তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছি, সে হাসিমুখে নিজের নাম বলেছে, তার চোখ-মুখের সেই সচেতন নারীত্বের সলজ্জতা অথচ বালিকার প্রগল্‌ভ কৌতুক-প্রিয়তা—তার সারা দেহের সুঠাম লাবণ্য, এ-সব যেন অবাস্তব স্বপ্নজগৎ থেকে সংগ্রহ করা স্মৃতি। কিন্তু মনে সে বেদনা অনুভব করলাম না, যা আসে এই কথা ভেবে যে স্বপ্নে যা দেখেচি ও-সব মিথ্যে, ছায়া, মায়া—ও আর পাব না, ও ছায়ালোকের রচা স্বর্গ, ওর চন্দ্রালোকিত নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরও মিথ্যে, ওর দিব্যাঙ্গনারাও মিথ্যে, মালতী এইখানেই

আছে, কাছে কাছেই আছে, তাকে আরও কতবার দেখবো। মালতী আস্‌বে ত?

মালতী সকালে এক রাশ তুলো পিঁজতে বস্‌ল। বেলা এগারটা পর্য্যন্ত সে আর কোন কাজে গেল না। প্রথম এখানে এসে যে প্রৌঢ় বৈষ্ণবটিকে দেখেছিলাম, তার নাম উদ্ধবদাস—সেই লোকটি মালতীর অভিভাবক, কার্য্যতঃ কিন্তু মালতীর খেয়ালে তাকে চলতে হয়। সেও মালতীর কাছে বসে তুলো পিঁজতে ব্যস্ত আছে, মালতীর কথা ঠেলবার সাধ্য তার নেই।

মালতীর ইতিহাস উদ্ধবদাসের মুখে একদিন ইতিমধ্যে শুনলুম উদ্ধব বাবাজীকে একদিন আখড়ার বাইরের মাঠে নিয়ে গিয়ে কৌশলে ঘুরিয়ে মালতীর কথা জিগ্যেস্ করতেই ও বললে—ওর বাবা আমার পাঠশালার পোড়ো বন্ধু। ওরা ব্রাহ্মণ, এ দেশের সমাজে কুলীন। মালতীর ঠাকুরদাদা শ্রীধর মুখুটি বেশ নাম-করা কীর্ত্তন-গাইয়ে ছিলেন। নিজের দল ছিল। দু-পয়সা হাতে করেছিলেনও। একদিন রাত্তিরে বাইরে বেরুচ্চেন, দরজার চৌকাঠের কাছে বাড়ির বেড়ালটা যেন কিসের সঙ্গে খেলা করছে। ফুট্‌ফুট্ করছে অনন্তচতুর্দ্দশীর রাত, ভাদ্র মাস, যেমন বাইরে পা দিতে গিয়েছে অমনি সাপে ছোবল দিয়েছে পায়ে। সাপ ছিল চৌকাঠের বাইরে, আলো-আঁধারে লেগে বুড়ো তা টের পায় নি। ঘরে তখন ছেলের বৌ মালতীর মা, মালতীর বাবা বাড়ি নেই। চেঁচিয়ে বললেন—বৌমা, শীগ্‌গির আলো জ্বালো, আমায় এক গাছা দড়ি দাও শীগ্‌গির। দড়ি নিয়ে বাঁধন দিয়ে উঠোনে গিয়ে বস্‌লো। বললে—আমায় আর ঘরে যেতে হবে না বৌমা,

তলব পড়েছে। লোকজন এল, ঝাড়ানো হ'ল—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ভোর রাত্রে মারা গেল।

মালতীর বাবা পৈতৃক কিছু হাতে পেয়ে একটা লবণ-কলায়ের দোকান করলে। তার মত অতিথসেবার বাতিক আমি কখন কারও দেখি নি। দোকান ত ছাই, বাড়ি হয়ে উঠল একটা মস্ত অতিথ-শালা। যত লোকই বাড়িতে আসুক, ফিরতো না। একবার রাত দুপুরের সময় পঁচিশ জন সাধু এসে হাজির, গঙ্গাসাগর যাচ্চে, অনেক দূর থেকে শুনে এসেছে এখানে জায়গা পাবে। দোকানের জিনিষপত্র ভাঙিয়ে পঁচিশমূর্ত্তি সাধুর সেবা হ'ল। সকালে তারা বললে, আমাদের জনপিছু দু-টাকা প্রণামী দাও। অত টাকা নগদ কোথায় পাবে? সাধুরা বললে—না দাও তো অভিসম্পাত দেবো। আমি বললাম—মিতে, অভিসম্পাত দেয় দিক, টাকা দিও না ওদের। ওরা লোক ভাল না। সে বললে—অভিসম্পাতের ভয় করি নে, তবে আমার কাছে চেয়েছে, আমি যেখান থেকে পাই, নিয়ে এসে দেবোই। মালতীর মায়ের কাণের মাকড়ী আর ফাঁদি নথ শ্রীমন্তপুরের বাজারে বিক্রী ক'রে টাকা নিয়ে এল। তাতেও কুলোয় না, আমি বাকী সাতটা টাকা দিলাম—তবে সাধুরা বিদেয় হয়।

মালতী তখন ছোট, একদিন হঠাৎ স্ত্রীকে এসে বললে—ছাখ আর সংসারে থাকবো না। স্ত্রী বললে—আমায় সঙ্গে নাও। স্ত্রীকে বললে—বাঁশবাগানের ওই হাঁড়িটা পড়ে আছে, নিয়ে এসে ধুয়ে ওতে ভাত রাঁধো। খেয়ে চলো। লবণ-কলায়ের দোকান বিলিয়ে দিলে। ডোমপাড়া থেকে সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে বললে—যার যা খুশী নিয়ে যাও। দশ মিনিটের মধ্যে দোকান সাফ্। সবাই বললে—পাগল হয়ে গিয়েছে। তার পর বৌ আর মেয়ের হাত ধরে কোথায় চলে গেল। বছর দুই পরে এসে ওই লোচনদাস বাবাজীর আখড়ায়

উঠলো। বাবাজী তখন বুড়ো হয়েছেন, বড় ভালবাসতেন, তিনি বললেন—বাবা, মহাপ্রভু তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার আখড়ার ভার তোমায় নিতে হবে, আমি আর বেশী দিন নয়। পরের বছর বাবাজী দেহ রাখলেন, ওই পুকুরপাড়ের তমালতলায় তাঁকে সমাজ দেওয়া হ'ল। ক্রমে মালতীর বাবার নাম দেশময় ছড়িয়ে পড়ল।

গোঁসাইজী বল্‌তো সবাই। গোঁসাইজীকে দেবতা ব'লে জান্‌তো এ-দেশের লোক। অমন নির্লোভ, অমন অমায়িক লোক কেউ কখনও দেখে নি। শরীরে অহঙ্কার ব'লে পদার্থ ছিল না। আর অমন মুক্ত মানুষ হয় না—কোন বাঁধন, কোন নিয়মগণ্ডীর ধার ধারত না। আমাদের বোষ্টমের সমাজেও অনেক আইন-কানুন আছে, মেনে না চললে সমাজে নিন্দে হয়, বড় বড় মচ্ছবের সময় নেমন্তন্ন পাওয়া যায় না। সে গ্রাহ্যও করতো না, একেবারে আপনভোলা, সদানন্দ, মুক্ত পুরুষ ছিল। দ্বারবাসিনীর কামারদের গাড়ীর কাজ আছে কল্‌কাতায়, একবার তাদের বাড়ী কাঙালীভোজন হচ্ছে, বেশ বড়লোক তারা। কামারদের মেজকর্ত্তা রতনবাবু দাঁড়িয়ে তদারক করছেন—এমন সময় দেখেন গোঁসাইজী কাঙালীদের সারিতে পাতা পেতে বসে খাচ্ছেন। পাছে কেউ টের পায় ব'লে থামের আড়ালে বসেছেন। হৈ হৈ কাণ্ড, বাড়িসুদ্ধ এসে হাতজোড় ক'রে দাঁড়ালো। এ কি কাণ্ড গোঁসাইজী, আমাদের অকল্যাণ হবে যে! লোকটা এত সরল—কোনো লম্বা চওড়া কথা নয়, কোনো উপদেশ নয়, অবাক হয়ে বললে, তাতে দোষ কি? আমি শুনলাম কাঙালীভোজন হবে, ভাল-মন্দ খেতে পাওয়া যাবে, তাই এসেছি, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে জাত মানতো না, সমাজ মানতো না, আপন-পর বুঝতো না, নিয়ম-কানুনের ধার ধারতো না। কতলোক মন্ত্র নিতে আসতো। বলতো—

মালতীর মা আগেই মারা গিয়েছিল। গোঁসাইজীর নিজের মরণও হ'ল স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছর পরে। একদিন কোথা থেকে বৃষ্টিমাথায় ভিজে আখড়ায় এলেন। তার পরদিন সকালে আমায় বললেন—উদ্ধব, কাল আমার বড় ঠাণ্ডা লেগেছে, একটু যেন জ্বর মত হয়েছে। আজ আর ভাত খাব না, কি বলো? দু-দিন পরে জ্বর নিমোনিয়ায় দাঁড়ালো। বুঝ্‌তে পেরেছিলেন নিজে বাঁচবেন না, মেয়েকে মরণের আগের দিন ডেকে বলে গেলেন—মালতী মা, তোর বিয়ে দিয়ে যেতে পারলাম না, তা আমার বলা রইল যাকে তোর মন চায়, তাকেই বিয়ে করিস্। তিনি তো চলে গেলেন, মালতীকে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় ফেলে রেখে। হাতে পয়সা রাখতে জানতেন না। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতেন না—সেটা আমি গুণ বলি নে, দোষই বলি—বিশেষ ক'রে অতবড় মেয়ে—আর ওর কেউ নেই ত্রিসংসারে। বাপ নেই, মা নেই, পয়সা নেই, বাড়ি নেই, ঘরবাড়ি এই আখড়া। মালতীও যে দেখেছেন—ও মেয়েও পাগল, ও বাপের ধারায় গিয়েছে। লোকজনকে খাওয়াচ্ছে, সেবাযত্ন করছে—ওই নিয়েই থাকে। কিছু মানে না, ভয় করে না। অন্য মেয়ে হ'লে এই সব পাড়াগাঁয়ে কত বদ্‌নাম রট্‌তো—গোঁসাইজীর মেয়ে বলেই সবাই মানে, তাই কেউ কিছু বলে না।

দিন-পনের কেটে গেল।

মালতীর বাবার ইতিহাস শুনে বুঝেছি আমি এখানে ছ-মাস থাকলেও এরা আমায় চলে যেতে বলবে না—বিশেষ ক'রে মালতী তো বলবেই না। কিন্তু আমার পক্ষে থাকাও যেমন অসম্ভব হয়ে

উঠ্‌ছে চলে যাওয়াও তার চেয়েও অসম্ভব যে! মালতীকে নতুন চোখে দেখতে শিখেছি ওর বাবার পরিচয় শুনে পর্যন্ত। মালতীর বাবার মত লোকের সন্ধানে কত ঘুরেছি, এতদিন পরে সন্ধান মিলেছে, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা হ'ল না। জগতের সকল নিঃস্বার্থ নির্মৎসর লোক পরস্পরের স্বগোত্র—তা সে লোক গঙ্গাতীরে নবদ্বীপের আকাশেই প্রথম দিনের আলো দেখুন, কিংবা দেখুন কপিলাবাস্তু বা প্যালেষ্টাইন্ বা আসিসির ওপরকার ইটালীর ইন্দ্রনীল আকাশের তলে।

মালতীকে কত কথা বলবার আছে ভাবি, কিন্তু ওর সঙ্গে আর আমার তেমন নির্জ্জনে দেখা হয় না। আমি দেখি মালতীর আশাতেই আমি সারাদিন বসে থাকি—ও কখন আসবে। ও থাকে সারাদিন নিজের কাজে ব্যস্ত—হয়ত দেখলাম ঘর থেকে ও বার হ'ল, ভাবি আমার কাছেই আসছে বুঝি—কিন্তু তা না এসে থালা-হাতে কাকে ভাত দিতে গেল। নয়ত আল্‌নাতে কাপড় টাঙাতে ব্যস্ত আছে। হয়ত একবার থাকতে না পেরে ডেকে বলি—ও মালতী—

মালতী বললে—আসছি।

আমি বসেই আছি, বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। ও এল কই?

দিনগুলো প্রায়ই এই রকম। তা ছাড়া আমার ওপর ওর কোন বিশেষ পক্ষপাত আছে ব'লে আমার মনে হয় না। প্রথম দিনকতক যে সে রকম ধারণা না হয়েছিল এমন নয়। কিন্তু এখন সে ভুল ভেঙেছে। ও সকলকে যেমন যত্ন করে, আমাকেও তেমনি করে।

একদিন ব'সে উদ্ধবদাসের একতারা মেরামত করছি—মালতী দেখতে পেয়ে উঠনের ওকোণ থেকে চঞ্চলপদে এসে সামনে দাঁড়াল। সকৌতুক সুরে বললে—ও! কাকার সেই একতারাটা? আপনি সারাচ্ছেন নাকি? কি জানেন আপনি একতারা সারানোর?

খানিকটা তার হাতে এসেছিল—তাই পরিয়ে দিচ্ছি। কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে চোখ তুলে চাইতেই ওর সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল। সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ আমার মনে হ'ল মালতীকে এখানে একা নিঃসহায়, নির্ব্বান্ধব, রিক্ত অবস্থায় ফেলে আমি কোথাও যেতে পারব না। ওর এখানে কে আছে? একপাল অনাত্মীয়, অশিক্ষিত গেঁয়ো বৈষ্ণবের মেলার মধ্যে ওকে ফেলে রেখে যাব কি ক'রে? তারা ওর কেউ নয়। তারা ওকে বুঝবে না। তার চেয়ে আমার মনের দেশে ও আমার অনেক আপন, আমার নিকটতম প্রতিবেশী।

ভাবলাম মালতীকে সব কথা বলি। বলি, মালতী, সংসারে তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। তুমি সাধু বাপের সতী মেয়ে, তোমার সংসার বিরাগী আপন-ভোলা বাপের আশীর্ব্বাদ ওই শ্যামসুন্দর তমালতরু ছায়ার মত তোমাকে ঘিরে রেখেছে জানি, কিন্তু আমিও যে-সন্ধানে বেরিয়েছি, সে-সন্ধান সফল হবে না তুমি যদি পাশে এসে না দাঁড়াও।

কিন্তু তার বদলে বললাম—ভাল কথা মালতী, তোমাকে অনেক দিন থেকে বলব ভাবচি। উদ্ধব বাবাজীকে ব'লে আমায় এখানে একটা পাঠশালা করার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার? আমার কিছু হয় তা থেকে।

মালতী এসে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসল। ওর মুখের পাশটা দেখা যাচ্চে, একটা সুকুমার লাবণ্য যেন ওর মুখের চারিপাশে ঘিরে আছে—এক ধরনের সুন্দর মুখ আছে, মনে হয় যেন তাদের মুখের চারিপাশে একটা অদৃশ্য সৌন্দর্য্যজালের বেষ্টনী রয়েছে, যখন কথা না বলে চুপ ক'রে থাকে, তখন তাদের মুখের এই ভাবটা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে—মালতীর মুখ সেই ধরনের। আমার কথায় ওর মুখচোখ চিন্তাকুল হয়ে উঠল, যেন কি একটা বিষম সমস্যা তার ঘাড়ে আমি চাপিয়ে দিয়েছি।

বললে—কিন্তু এখানে যা ভেবে করবেন, তার কিছু হবে না। এখানে মাইনে দেবে না কেউ। এখানে ভদ্রলোক নেই। দ্বারবাসিনীতে কামারেরা আছে, ওদের কলকাতায় গাড়ীর কারখানা, সেইখানেই থাকে। সরকারেরা তিন বছর পরে এসেছিল পূজোর সময় দেশে। তারপর হেসে ছেলেমানুষের মত ঘাড় দুলিয়ে বললে—ধান নিয়ে ছেলে পড়াতে পারবেন? এদেশে মাইনের বদলে ধান দেয়। নাঃ, সে-সব আপনার কাজ নয়। তা আপনি ত এখানে জলে পড়ে নেই? হাতে কিছু নেই, একদিন হবেই। যতদিন না হয়, এখানে থাকুন। আপনাকে এ-অবস্থায় কোথাও যেতে দেব না। এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়, না? সত্যি কথা বলুন।

—সত্যি কথা কি সব সময় বলা যায় মালতী?

—কেন, বলুন না কি কথা বলবেন?

এখন থাক্, আমার কাজ আছে। শোন, উদ্ধবদাসের একতারাটা এখানে রইল, ব'লো তাকে। তোমার জন্যে সারানো হ'ল না।

মালতী অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে—কোথায় যাবেন? শুনুন। বারে, অদ্ভুত মানুষ কিন্তু আপনি!

বাইরের মাঠে এসে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল আকাশ-বাতাসের রূপ ও রং যেন এই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বদলে গেছে আমার চোখে। মালতী ও-কথা বললে কেন যে আপনাকে এ অবস্থায় কোথাও যেতে দিতে পারব না? এই সেই মাঠ, সেই নীলাকাশ, মাঠের মধ্যে দ্বারবাসিনীর কামারদের কাটানো বড় দীঘিটা, সবই সেই আছে—কিন্তু মালতীর মুখের এক কথায় সব এত সুন্দর, এত অপরূপ, এত মধুময় হয়ে উঠল কেন?

ঠিক সেই অদ্ভুত রাত্রিটির মত—মাঠের মধ্যে নির্জ্জন নদীর ধারে শুয়ে যেমন হয়েছিল সেদিন। অনুভূতি-হিসেবে দুই-ই এক। কোন প্রভেদ নেই দেখলুম। কোথায় সেই বিরাট দেবতা, আর কোথায় এই মালতী!

তারপর দিন-কতক ধরে মালতীর সঙ্গে কি জানি কেন আমার প্রায়ই দেখা হয়। সময়ে-অসময়ে, কারণে-অকারণে ও আমার সামনে যখনই এসে পড়ে কিংবা কাছ দিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে দুটো কথা না ব'লে যায় না। হয়ত অতি তুচ্ছ কথা—বসে আছি, সামনে দিয়ে যাবার সময় ব'লে গেল—বসে আছেন? এ-কথা বলবার কোন প্রয়োজনই নেই—কিন্তু সারাদিনের এই টুক্‌রো টুক্‌রো অকারণ কথা, একটুখানি হাসি, কৃত্রিম শ্লেষ, কখন-বা শুধু চাহনি—এর মধ্যে দিয়ে ওর কাছে আমি অনেকটা এগিয়ে যাই—ও আমার কাছে এগিয়ে আসে। এতে ক'রে বুঝি ও আমার অস্তিত্বকে উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে না—ও আমার সঙ্গে কথা ব'লে আনন্দ পায়।

বিকেলে যখন ওর সঙ্গে এক-এক দিন গল্প করি, তখন দেখি ওর মনের চমৎকার একটা সজীবতা আছে। নিজে বেশী কথা বলতে ভালবাসে না—কিন্তু শ্রোতা-হিসাবে সে একেবারে প্রথম শ্রেণীর। যে-কোন বিষয়ে ওর কৌতূহল জাগানো যায়—মনের দিক থেকে সেটা বড় একটা গুণ। এমন ভাবে সকৌতূহলে ডাগর চোখ দুটি তুলে একমনে সে শুনবে—তাতে যে বলছে তার মনে আরও নতুন নতুন কথা জোগায়, ওকে আরও বিস্মিত করবার ইচ্ছে হয়।

মালতী বড় চাপা মেয়ে কিন্তু—এতদিন পরে হঠাৎ সেদিন উদ্ধবের মুখে শুনলাম যে ও বেশ সংস্কৃত জানে। ওর বাবার এক বন্ধু ত্রিগুণাচরণ কাব্যতীর্থ নাকি শেষ বয়সে এই আখড়ায় ছিলেন, এখানেই মারা যান। তাঁর কেউ ছিল না—মালতীর বাবা তখন বেঁচে—তিনিই এখানে তাঁকে আশ্রয় দেন। ত্রিগুণা-পণ্ডিতেরই কাছে মালতী তিন-চার বছর সংস্কৃত পড়েছিল। মালতীকে জিগ্যেস্ করতেই মালতী বললে—এখন আর আমার ওসব চর্চ্চা নেই, ভুলে গিয়েছি। সামান্য একটা ধাতুর রূপও মনে নেই। তবে রঘুর শ্লোক অনেক মুখস্থ আছে,

যা যা ভাল লেগেছিল তাই কিছু কিছু মুখস্থ করেছিলাম, সেইগুলো ভুলি নি। তবে সহজ ভাষা যদি হয়, পড়লে মানেটা খানিকটা বুঝতে পারি। সে এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়! উদ্ধব-জ্যাঠা আবার তাই আপনাকে গিয়েছে বলতে—উদ্ধব-জ্যাঠার যা কাণ্ড!

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু ও নিজে যেন কিছুই মানে না—এই ভাবের। কখনও কোন পূজা-অর্চ্চনা ওকে করতে দেখি নি, এক ওর বাবার বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখানো ছাড়া। আখড়ায় প্রতিষ্ঠীত বিগ্রহের পূজার জোগাড় করে উদ্ধব নিজে, মালতীকে সেদিকে বড়-একটা ঘেঁসতে দেখি নি। তা ব'লে ওর মন ওর বাপের মত সংস্কারমুক্তও নয়। ছোটখাটো বাচ-বিচার এত মানে যে, আখড়ার লোকে অতিষ্ঠ। সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে তুলেছিল ব'লে একটি বাবাজীকে মালতীর কাছে কড়া কথা শুনতে হয়েছিল। ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই বড়-একটা নেই—মুচির ছেলেকেও ঘরের দাওয়ায় বসিয়ে খাওয়াচ্ছে, কাওরা পাড়ায় অসুখ হ'লে সাবু ক'রে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে আসতে দেখেছি।

একদিন বিকেলে আখড়ার সামনের মাঠে পাঠশালা করছি, মালতী এসে বললে—দিন আজ ওদের ছুটি। আসুন একটা জিনিষ দেখিয়ে আনি।

আখড়ার পাশে ছোট একটা মাঠ পেরিয়ে একটা রাঙা মাটির টিলা। তার ওপর শালপলাশের বন—টিলার নীচে ঘন বনসিম্ফির জঙ্গল। টিলার ওপারে পলাশবনের আড়ালে একটা ছোট মন্দির। মালতী বললে—এই দেখাতে আনলাম আপনাকে। নন্দিকেশ্বর শিবের মন্দির—বড় জাগ্রত ঠাকুর—খৃষ্টান মানুষ হ'লেও মাথাটা নোয়ান—দোষ হবে না।

মন্দিরের পূজারী দু-খানা বাতাসা দিয়ে আমাদের জল দিলে। সে

উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ, উপাধি মহান্তি, বহুকাল এদেশে আছে, বাংলা জানে ভাল। মালতীকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে।

তারপর আমরা তিন জনেই মন্দিরের পশ্চিম দিকের রোয়াকে বসলুম। মালতী বললে—মহান্তি-কাকা, বলুন ত এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথাটা এঁকে। ইনি আবার খৃষ্টান কিনা, ওসব মানেন না—

আমি বললুম—আঃ, কেন বাজে বক্‌ছ, মালতী? কি মানি না-মানি—মানে প্রত্যেক মানুষের—

মালতি আমার কথাটা শেষ করতে দিলে না। বললে—আপনার বক্তৃতা রাখুন। শুনুন, এটা খুব আশ্চর্য্য কথা—বলুন তো মহান্তি-কাকা?

মহান্তি বললে—এইখানে আগে গোয়ালাদের বাথান ছিল, বছর-পঞ্চাশ আগেকার কথা। রোজ তাদের দুধ চুরি যেত। দু-তিনটে গরু সকালে একদম দুধ দিত না। একদিন তারা রাত জেগে রইল। গভীর নিশুতি রাতে দেখে টিলার নীচের ওই বনসিদ্ধির জঙ্গল থেকে কে এক ছোকরা বার হয়ে এসে গরুর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খাচ্ছে। যে-সব গরু বাছুর ভিন্ন পানায় না, তারাও বেশ দুধ দিচ্ছে। ছোকরার রূপ দেখে ওরা কি জানি কি বুঝলে, কোন গোলমাল করলে না; ছোকরাও দুধ খেয়ে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পরের দিন সকালে বনে খোঁজ ক'রে দেখে কিছুই না। খুঁজতে খুঁজতে এক শিবলিঙ্গ পাওয়া গেল। ওই যে শিবলিঙ্গ দেখছেন মন্দিরের মধ্যে। মাঘমাসে মেলা হয়—ভারি জাগ্রত ঠাকুর।

মালতী গর্ব্বের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—শুনলেন পাদ্রি-মশাই? মানেন না যে বড় কিছু?

আমি বললাম—আমি বেড়াতে বেড়াতে অনেক জায়গায় এ-রকম দেখেছি। কত গাঁয়ে প্রাচীন বটতলায় নুড়ি, ষষ্ঠীদেবী, ওলাবিবি,

কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার মূলে এই ধরনের প্রবাদ আছে। লোকে কত দূর থেকে এসে পুজো দেয়, তাদের মধ্যে সত্যিকার ভক্তি দেখেছি। এক পাড়াগাঁয়ের বোষ্টমের আখড়ায় একখানা পাথর দেখেছিলাম—তার ওপরে পায়ের চিহ্ন খোদাই করা, আখড়ার অধিকারী পয়সার লোভে যাত্রীদের বলতো ওটা খোদ শ্রীকৃষ্ণের পায়ের দাগ, সে বৃন্দাবন থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছে পাথরখানা। আমি দেখেছি একটি তরুণী ভক্তিমতী পল্লীবধূকে চোখের জলে আকুল হয়ে পাথরটা গঙ্গাজলে ধুয়ে নিজের মাথার লম্বা চুল দিয়ে মুছিয়ে দিতে। কি জানি কোথায় পৌঁছালো ওর প্রণাম? কোন্ ঊর্দ্ধমূল অবকাশাখ দেবতা ওর সেবা গ্রহণ করতে সেদিন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বহুপল্লবিত বাহু?

কি অপূর্ব্ব সূর্য্যাস্ত হচ্ছে বিশাল পশ্চিম দিগন্তে! দূরের তালগাছের মাথাগুলো যেন বাঁধাকপির মত ছোট দেখাচ্ছে, গুঁড়িগুলো দেখাচ্ছে যেন সরু সরু নলখাগড়ার ডাঁটা—আর তার ওপরকার নীলাকাশে রঙীন মেঘলোকে পিঙ্গলবর্ণের পাহাড়, সমুদ্র, কোন্ স্বপ্নসাগরের অজানা বেলাভূমি।...পায়ের নীচের মাটি সারাদিন রোদে পুড়েছে—বাতাসে তারই সুগন্ধ।

মালতী বললে—বিষ্ণুমন্দিরে সাঁজ জ্বলে নি এখনও। প্রদীপ দিইগে চলুন—

সেখানে ওর বাবার মন্দিরে প্রদীপ দেওয়া হয়ে গেল। আমি পুকুর পাড়ের তেঁতুলগাছের মোটা শেকড়ে বসলুম, ও দাঁড়িয়ে রইল। বললাম—আমায় তুমি যে খৃষ্টান খৃষ্টান কর, তুমি আমার কথা কিছু জান না। তার পর ওকে আমার বাল্যজীবন, মিসনরী মেমেদের কথা, আমাদের দারিদ্র্য, মা, সীতা ও দাদার কথা সব বললাম। বিশেষ ক'রে উল্লেখ করলাম আমার সেই দৃষ্টিশক্তির কথাটা—যা এখন হারিয়েছি। ছেলে-বেলার ঘটনা আমার এখন আর তেমন মনে নেই—তবুও বললাম যা

মনে ছিল—যেমন চা-বাগানের দু-একটা ঘটনা, বাল্যে পানীর মৃত্যু-দিনের ব্যাপার, হীরু রায়ের মৃত্যুর কথা, মেজবাবুর পুত্রসন্তান হওয়া সংক্রান্ত ব্যাপার।

বললাম—যীশুখৃষ্টকে ভক্তি করি ব'লে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছি জীবনে। কিন্তু সে আমার দোষ নয়, ছেলেবেলার শিক্ষা। ওই আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলাম। আমি এখনও তাঁর ভক্ত। তুমি তাঁর কথা কিছু জান না—বুদ্ধ চৈতন্য যেমনি মহাপুরুষ, তিনিও তেমনি। মহাপুরুষদের কি জাত আছে মালতী? কর আদায় করতো লেভি, ইহুদীসমাজে সে ছিল নীচ, পতিত, সমাজের ঘৃণ্য। সবাই তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। যীশু তাকে বললেন—লেভি, তুমি নীচ কে বলে? তুমি ভগবানের সন্তান। লেভি আনন্দে কেঁদে ফেললে। সমাজের যত হেয় লোককে তিনি কোল দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বেশ্যা ছিল, জালজীবী ছিল, কুষ্ঠী ছিল। তাঁকে সবাই বলত পাগল, ধর্ম্মহীন, আচারভ্রষ্ট। তাঁর বাপ, মা, ভাই আপনার জনও তাঁকে বলতো পাগল—তারা জানত না ঈশ্বরকে যে জেনেছে, তার বাইরের আচারের প্রয়োজন নেই। তাঁর ধর্ম্ম সেবার ধর্ম্ম।

তার পর আমি ওকে সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা বললাম। পুকুরের ওপারে দূরবিসর্পিত আকাশের দিকে চোখ রেখে আমার মনে এল যে রাঢ়দেশের এই সীমাহীন রাঙামাটির মাঠের মধ্যে সেদিন আমি অন্য এক দেবতার স্বপ্ন দেখেছি। সে কি বিরাট রূপ! ওই রাঙা গোধূলির মেঘে, বর্ণে, আকাশে তাঁর ছবি। তাঁর আসন সর্ব্বত্র—তালের সারিতে, তমালনিকুঞ্জে, পুকুরে-ফোটা মৃণালদলে, দুঃখে, শোকে, মানুষের মুখের লাবণ্যে, শিশুর হাসিতে ···সে এক অদ্ভুত দেবতা! কিন্তু কতটুকুই বা সে অনুভূতি হ'ল! যেমন আসা অমনি মিলিয়ে যাওয়া!···

মালতী, আগেই বলেছি, অদ্ভুত শ্রোতা। সে কি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলে যখন আমি বকে গেলুম! চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ, যেন কি ভাবছে।

তারপর হঠাৎ বললে—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা বলি। প্রেম ও সেবার ধর্ম্ম কি শুধু যীশুখৃষ্টের দেওয়া? আমাদের দেশে ওসব বুঝি বলে নি? আমাদের আখড়ায় লোচনদাস বাবাজী ছিলেন ঠ্যাং-ভাঙা কুকুর পথ থেকে বুকে ক'রে তুলে আনতেন। একবার একটা ষাঁড়ের শিং ভেঙে গিয়েছিল, ঘায়ে পোকা থুক্ থুক্ করছে, গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। লোচন-জ্যাঠা তাকে জোর ক'রে পেড়ে ফেলে ঘা থেকে লম্বা লম্বা পোকা বার ক'রে ফিনাইল দিয়ে দিতেন ন্যাকড়া ক'রে। তাতেই এক মাস পরে ঘা সারলো।

—এ-সব কথা বলবার দরকার করে না, মালতী। আমি তোমাকে বলেছি তো ধর্ম্মের দেশকাল নেই, মহাপুরুষদের জাত নেই। যখন শুনি তোমার বাবা গরিব প্রতিবেশীদের মেয়ের বিয়েতে নিজের বাড়ি থেকে দান-সামগ্রীর বাসন বার ক'রে দিতেন—দিতে দিতে বাসনের পৈতৃক আমলের বড় সিন্দুক খালি ক'রে ফেলেছিলেন—তখনই আমি বুঝেছি ভগবান সবদেশেই অদৃশ্যলোক থেকে তাঁর বাণী প্রচার করছেন, কোন বিশেষ দেশ বা জাতের ওপর তাঁর পক্ষপাত নেই। মানুষের বুকের মধ্যে বসে তিনি কথা কন, আর যার কান আছে, সে শুনতে পায়।

ওর বাবার কথায় ওর চোখ জলে ভরে এল। অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। দেখেছি মালতী শুষ্কচোখে কখনও ওর বাপের কথা শুনতে পারে না! সন্ধ্যা হয়েছে। উঠছি এমন সময় তমালছায়ায় বিষ্ণুমন্দিরের দিকে আর একবার

চোখ পড়তেই আমাদের গ্রামের পুকুরপাড়ের বটতলার সেই হাতভাঙা পরিত্যক্ত সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা আমার কেমন ক'রে মনে এল। মনে এল ছেলেবেলায় সীতা আর আমি কত ফুলের মালা গেঁথে মূর্ত্তির গলায় পরিয়েছি—তার পর আর কতদিন সেদিকে যাই নি, কি জানি মূর্ত্তিটার আজকাল কি দশা হয়েছে, সেখানে আছে কিনা? কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম যেন, মালতী কি একটা কথা বললে তা আমার কানেই গেল না ভাল ক'রে। বারে, পুকুরপাড়ের সে ভাঙা দেবমূর্ত্তির সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?

বিষ্ণুমন্দির থেকে দু-জনে যখন ফিরেছি, আখড়ায় তখন আরতি আরম্ভ হয়েছে। দিগন্তপ্রসারী মাঠের প্রান্তে গাছপালার অন্তরালবর্ত্তী এই নিভৃত ছোট দেবালয়টি সন্ধ্যারতি প্রতিদিনই আমায় কেমন একটা অপূর্ব্বভাবে অনুপ্রাণিত করত—আজ কিন্তু আমার আনন্দ যেন হাজার গুণে বেড়ে গেল। তার ওপর আজ এক জন পথিক বৈষ্ণব জীবগোস্বামীর সংস্কৃত পদাবলী একতারায় অতি সুস্বরে গাইলে—আমার মানসবৃন্দাবনের বংশীবটমূলে কিশোর হরি চিরকাল বাঁশী বাজান, আমার প্রাণের গোষ্ঠে তাঁর ধেনুদল চরে; সেখানে তাঁর খেলাধুলো চলে রাখালবালকদের নিয়ে দীর্ঘ সারাদিন, দীর্ঘ সারারাত।

কেন এত আনন্দ আমার মনে এল কে বলবে? আমি যেন অন্য জন্ম গ্রহণ করেছি। ঘুম আর আসে না—সে গভীর রাত্রে তমালশাখার আড়ালে চাঁদ অস্ত গেলে আমি আখড়ার সামনের মাঠে গাছের তলায় এসে বসলুম।

আকাশের অন্ধকার দূর করেছে শুধু জলজ্বলে শুকতারার আলোয়। কে জানে হয়ত ওই শুকতারার দেশের নদীতীরে, জ্যোৎস্নামাখা বনপ্রান্তরে, উপবনে মৃত্যুহীন জরাহীন দেবকন্যারা মন্দারবীথির ঘন

ছায়ায় প্রণয়ীদের সঙ্গে গোপন মিলনে সারারাত্রি কাটায়···তৃপ্তিহীন অমর প্রেম তাদের চোখের জ্যোৎস্নায় জেগে থাকে, লজ্জাভরা হাসিতে ধরা দেয়। পীত সূর্য্যাস্তের আলোয় করুণ সুর বহু দূরের শূন্য বেয়ে সেখানে ভেসে এসে সান্ধ্য আকাশকে আরও মধুর ক'রে তোলে—কোথা থেকে সে সুর আসে কেউ জানে না···কেউ বলে বহু দূরের কোন নক্ষত্রলোকে এক বিরহী দেবতা একা বসে বসে এমনি তাঁর বীণা বাজান, সেই সুর ভেসে আসে প্রতি সন্ধ্যায়···ঠিক কেউ বলতে পারে না···কেবল আধ-আলো আধ-ছায়ায় পুষ্পবীতিথে লুকিয়ে বসে সুখী প্রেমিক-প্রেমিকা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে···তাদের চোখে অকারণে জল এসে পড়ে···অবাক হয়ে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ আমার সামনে অস্পষ্ট অন্ধকারে এক জন তরুণ যুবক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বললে—এস আমার সঙ্গে—

তার গেরুয়া উত্তরীয় আমার গায়ে এসে পড়ছে উড়ে। আমি বলি—কোথায় যাব? কে আপনি?

নবীন বৈষ্ণব বললে—আমি জীবগোস্বামী—আমারই পদাবলী তুমি সন্দেবেলা শুনেচ যে। এত শীগ্‌গির ভুলে যাও কেন হে ছোক্‌রা? এস আমি বৃন্দাবনে যাব। শ্রীকৃষ্ণকে আমার পাওয়া চাই।

—আপনি ত মারা গিয়েছেন আজ তিন-শো বছরের ওপর। আপনি আবার কোথায়?

পাগল! কে বললে আমি মরেছি। আর ম'লেই কি আমার যাওয়া ফুরিয়েছে নাকি? এসো···এসো···আমি সংসার ছেড়েছি, সব ছেড়েছি, তাঁর জন্যে। দেখছ না পাগল হয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি?

এমন ভাবে কথাগুলো সে বললে আমি যেন শিউরে উঠলুম। বললাম—তাতো দেখ্‌তে পাচ্ছি, পাগলের আর বাকী কি? আপনি

যান, আমি যীশুখৃষ্টের ভক্ত, আমি বৃন্দাবনে যাব না। তাছাড়া মালতীকে ফেলে এক পাও এখান থেকে নড়ছি নে আমি।

তরুণ বাউল হেসে একতারা বাজাতে বাজাতে চলে গেল—পথের মাঝে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে যেতে যেতে দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল···অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার গলার মিষ্টি সুর তখনও যেন ভেসে আসছে···

মধু রিপুরূপ মুদারম্
মধু রিপুরূপ মুদারম্
সুখদং সুখদং ভবসারম্

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে শেষ রাতের ঠাণ্ডায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কে জানে—শিশিরে কাপড়-চোপড় ভিজে গিয়েছে। ফরসা হবার আর দেরি নেই।

দেখতে দেখতে এখানে ছ-সাত মাস হয়ে গেল। এখানে সময় কাটে কোথা দিয়ে বুঝতে পারি নে। সকালে আখড়ার কাজ করি, বিকেলে গোটাকতক ছেলে নিয়ে একটা পাঠশালা করি, তাতে যা পাই উদ্ধব বাবাজীর হাতে তুলে দিই। একদিন মালতী আমায় বললে— ছেলে পড়িয়ে যা পান, তা আপনি উদ্ধব-জ্যাঠার হাতে দেন কেন? থাকা-খাওয়ার দরুন টাকা নেওয়া ত এখানে নিয়ম নেই, ও-টাকা আপনি নিজে রেখে দেবেন, আপনারও ত নিজের টাকার দরকার আছে। আমি বললাম—তা কি ক'রে হয় মালতী, আমি এম্নি খেতে পারি নে। আর আমি ত থাওয়া থাকা ব'লে টাকা দিই নে, বিগ্রহের সেবার জন্মে দিই। এতে দোষ কি?

সে দিন মালতী আর কিছু বললে না। দিন-চারেক পরে আবার এক দিন ওই কথাই তুল্‌লে। টাকা আমি কেন দিই? আখড়া ত হোটেলখানা নয় যে এখানে টাকা দিয়ে খেতে হবে? ওতে তার মনে বাধে। তা ছাড়া আমার ত টাকার দরকার আছে। আমি তাকে বুঝিয়ে বলি, টাকা না-দিতে দিলে আমার এখানে থাকা হবে না। চলে যেতে হবে। সেদিন থেকে মালতী এ-নিয়ে আর কিছু বলে না।

পাড়াগাঁয়ের দিনগুলো অদ্ভুত কাটে!…দীঘির পাড়ে রাঙামাটির উঁচু বাঁধে এ-সময়ে একরকম ফুল ফোটে, ছায়া প'ড়ে এলে মাঝে মাঝে একা গিয়ে বসি। বাগ্‌দীদের মেয়েরা হাঁটুপর্য্যন্ত কাপড় তুলে মাছ ধরে, আখড়ার গোয়াল থেকে সাঁজালের ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে ওড়ে—তালের দীর্ঘসারির ফাঁক দিয়ে এই সন্ধ্যায় কতদূর দেখতে পাই—দাদার দোকান,

দাদার বাতাসার কারখানা, সীতার শ্বশুর-বাড়ি, তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা, নিমচাঁদের বৌ, শৈলদি।...

মালতীর স্বভাব কি মধুর! কি খাটুনিটা খাটে আখড়ায়—এক দিন উঁচু কথা শুনি নি ওর মুখে—কারও ওপর রাগ দেখি নি—বাপের মেয়ে বটে!

আখড়ায় ছোট একটা অশ্বত্থ-চারা আছে, উদ্ধব দাস রোজ স্নান ক'রে এসে গাছটা প্রদক্ষিণ করে, গাছটাতে জল দেয়। এ তার রোজ করাই চাই। একদিন মালতীকে ডেকে বলি—তোমার উদ্ধব-জ্যাঠা পাগল নাকি? ও-গাছটার চারি পাশে ঘোরার মানে কি? মালতী বললে—কেন ঘুরবে না; সবাই ত আর আপনার মত নাস্তিক না। অশথগাছ নারায়ণ—ওর সেবা করলে নারায়ণের সেবা করা হয়—জানেন কিছু? আমি বললুম—তাহ'লে তুমিও সেবাটা সুরু ক'রে পুণ্যি কিছু ক'রে নাও না সময় থাকতে?

মালতী শাসনের সুরে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা থাক্‌। আপনি ও-রকম পরের জিনিষ নিয়ে টিটকিরি দেন কেন? ওদের ওই ভাল লাগে, করে। আপনার ভাল লাগে না, করবেন না। তা নয়, সারাদিন কেবল এর খুঁৎ ওর খুঁৎ—ছিঃ, আপনার এ-স্বভাব সারবে কবে?

বললাম—তোমার মত উপদেশ দেওয়ার মানুষের দেখা পেতাম যদি তাহ'লে এত দিন কি আর স্বভাব সারে না? তা সবই অদৃষ্ট!

কথা শেষ ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেই মালতী রাগ ক'রে আমার সাম্‌নে থেকে উঠে গেল।

বিকেলে কিন্তু ওকে আমার কাছেই আসতে হ'ল আবার। নিকটে নকাশিপাড়া গাঁয়ে একটা যাত্রার দল ছিল, তাদের অধিকারী এসে উদ্ধব দাসকে বলে—বাবাজী, তিন মাস ব'সে আছি, বায়না-পত্তর একদম বন্ধ। দল ত আর চলে না। কাল্‌না থেকে ভাল বাজিয়ে

এনেছিলাম—ঢোলকে যখন হাত দেবে, আঃ, যেন মেঘ ডাকচে, বাবাজী! তা আপনাদের আখড়ায় এক দিন শ্যামসুন্দরজীউকে শুনিয়ে দিই। কিছু খরচ দিতে হবে না, তেল তামাক আর কিছু জলখাবার—

—জলখাবার-টাবার হবে না পাল-মশায়। তা ছাড়া আসর খাটানো ওসব কে করে? এখন থাক্।

মালতী আমায় এসে বললে—উদ্ধব-জ্যাঠাকে বলুন, যাতে যাত্রাটা হয়। আমি জলখাবার দেব, জ্যাঠাকে সেজন্যে ভাবতে হবে না। আপনাকে কিন্তু আসরের ভার নিতে হবে।

আমি বললাম—আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমি পারব না।

মালতী মিনতির সুরে বললে—লক্ষ্মীটি, নিতেই হবে। যাত্রা যে আমি কতকাল শুনি নি! দেশের দলটা উৎসাহ না-পেলে নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আসরের ভার নিলেই আমি ওদের ব'লে পাঠাই।

—না, আমি পারবো না, সোজা কথা। তুমি ওবেলা ও-রকম রাগ ক'রে চলে গেলে কেন?

—তাই রাগ হয়েছে বুঝি? কথায় কথায় রাগ।

—রাগ জিনিষটা তোমার একচেটে যে! আর কারও কি রাগ হ'তে আছে?

—আচ্ছা, আমি আর কখনও ও-রকম করব না। আপনি বলুন ওদের—কেমন ত?

যাত্রা হয়ে গেল—মালতী ওদের ছানা খাওয়ালে পেট ভ'রে। বললে—বাবা রাস্তা থেকে লোক ডেকে এনে খাওয়াতেন আর আমরা মুখ ফুটে যারা খেতে চাইছে, তাদের খাওয়াব না? দলে ছোট ছোট ছেলেরা আছে, রাত জেগে চেঁচিয়ে শুধু-মুখে ফিরে যাবে, এ কখনও হয়?

মালতী অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থ পড়েছে। সময় পেলেই বিকেলে আমার কাছে বই নিয়ে আসে, দু-জনে পুকুর-পাড়ে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। আমার হয়েছে কি, সব সময় ওকে পেতে ইচ্ছে করে, নানা কথাবার্ত্তায় ছল-ছুতোয় ওকে বেশীক্ষণ কাছে রাখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিকেলের দিকে ছাড়া সারাদিন ওর দেখা পাওয়া ভার। ওর কাছে বুদ্ধের কথা বলি, সেণ্ট ফ্রান্সিসের কথা বলি। ও আমাকে শ্রীচৈতন্যের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনায়।

এক দিন হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল মালতী বই লেখে। কি কাজে পুকুরের ঘাটে গিয়েছি দুপুরের পরে, দেখি বাঁধন-সিঁড়ির ওপর জামগাছের ছায়ায় একখানা খাতা প'ড়ে আছে—পাশেই দোয়াত কলম—খাতাখানা উল্টে দেখি মালতীর হাতের লেখা। এখানে ব'সে লিখতে লিখতে হঠাৎ উঠে গিয়েছে। অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল—না-দেখে পারলাম না, প্রথমেই ওর গোটা গোটা মুক্তার ছাঁদে একটা সংস্কৃত শ্লোক লেখা :—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

* * *

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ

তার পরে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণন, বৃন্দাবনের প্রকৃতি বর্ণনা মাঝে মাঝে। খাতার ওপরে লেখা আছে—"পাষণ্ডদলন-গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত।"

দেখছি, এমন সময় মালতী কোথা থেকে ফিরে এসে আমার হাতে খাতা দেখে মহাব্যস্ত হয়ে বললে—ও কি? ও দেখছেন কেন? দিন আমার খাতা—

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম—এইখানে পড়ে ছিল, তাই দেখছিলাম কার খাতা—

—না দিন ও দেখবার যো নেই।

—যখন দেখে ফেলেছি তখন তার চারা নেই। কে জানতো তুমি কবি! এ শ্লোকটা কিসের?

মালতী সলজ্জ সুরে বললে—চৈতন্যচরিতামৃতের। কেন দেখছেন, দিন—

—শোনো মালতী—লিখছ এ বেশ ভাল কথাই। কিন্তু তোমার এ লেখা সেকেলে ধরনের। পাষণ্ডদলনের অনুকরণের বই লিখলে একালে কে পড়বে? তুমি আজকালকার কবিতার বই কিছু পড় নি বোধ হয়?

মালতী আগ্রহের সুরে বললে—কোথায় পাওয়া যায়, আমায় দেবেন আনিয়ে? আমি ত জানি নে আজকালকার কবিতার কি বই আছে—আনিয়ে দেবেন? আমি দাম দেবো।

দাম দেওয়ার কথা বলাতে আমার মনে ঘা লাগল। মালতী কাছে থেকেও যেন দূরে। বড় অদ্ভুত ধরনের মেয়ে, ও একালেরও নয়, সেকালেরও নয়। এই পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে, যেখানে কোন আধুনিকতার ঢেউ এসে পৌঁছয় নি, কিন্তু বুদ্ধিমতী এমন, যে আধুনিকতাকে বুঝতে ওর দেরি হয় না। এমন সুন্দর চা করে, শ্রীরামপুরে শৈলদিরা অমন চা করতে পারত না। নিজে মাছমাংস খায় না, কিন্তু আমার জন্যে এক দিন মাংস রাঁধলে রান্নাঘরের উনুনেই। আমায় প্রায়ই বলে—আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে বলবেন। আপনি ত আর বৈষ্ণব হন নি যে মাছমাংস খাবেন না! আমায় বলবেন, আমি রেঁধে দেব এখন।

*

*

মালতী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী বটে, কিন্তু বেশ সুশ্রী। ওর টান ক'রে বাঁধা চুল ও ছেলেমানুষের মত মুখশ্রীর একটা নবীন, সতেজ সুকুমার লাবণ্য—বিশেষ ক'রে যখন মুখে ওর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়, কিংবা একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে মুখ উঁচু ক'রে হাসে—তখন সে বিজয়িনী, তখন সে পুরুষের সমস্ত দেহ, আত্মাকে সুন্দরী মৎস্যনারীর মত মুগ্ধ ক'রে কূলের কাছের অগভীর জল থেকে টেনে বহুদূরের অথৈ জলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওর সে-রূপ যখন-তখন দেখা যায় না। কালেভদ্রে দৈবাৎ হয়ত একবার চোখে পড়তে পারে। আমি একবার মাত্র দেখেছিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সারাদিন খররৌদ্র ও গুমটের পরে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে মেঘ উঠে সারা আকাশ জুড়ে ফেললে এবং হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল। আখড়ার বাইরের মাঠে কাঠ, ধান, ছোলা, তুলো সব রোদে দেওয়া ছিল। কেউ তোলে নি, আখড়ায় আবার ঠিক সেই সন্ধ্যার সময়টাতে লোকজন কেউ নাই। আমিও ছিলাম না। মাঠের মধ্যে বেড়াচ্ছিলাম—ঝড় উঠতেই ছুটে আখড়ায় এসে দেখি মালতী একা মহাব্যস্ত অবস্থায় জিনিষপত্র তুলছে। আমায় দেখে বললে—দৌড়ে আলোটা জ্বেলে আনুন, অন্ধকারে কিছু কি ছাই টের পাচ্ছি—সব উড়ে গেল—

সঙ্গে সঙ্গে এল বৃষ্টি···

ওকে দেখলাম নতুন চোখে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে সে একবার এখানে একবার ওখানে বিদ্যুতের বেগে ছুটোছুটি করতে লাগল—অদ্ভুত কাজ করবার শক্তি—দেখতে দেখতে সেই ঘোর অন্ধকার আর ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ক্ষিপ্রনিপুণতার সঙ্গে অর্দ্ধেক জিনিষ তুলে দাওয়ায় নিয়ে এসে

ফেললে। এদিকে আমি অন্ধকারে দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি নে দেখে ছুটে এসে বললে—কোথায় দেশলাই রেখেছিলেন মনে আছে? কোথা থেকে হাতড়ে দেশলাই বার করলে—তার পর সেই ঝড়ের ঝাপটার মধ্যে আলো জ্বালা—সে এক কাণ্ড! অন্ধকারে দু-জনে মিলে অনেক চেষ্টার পরে শেষে ওরই ক্ষিপ্রতা ও কৌশলে আলো জ্বল্‌ল।

আলো জ্বেলে আমার হাতে দেশলাই দিয়ে আমার মুখের অসহায় ভঙ্গীর দিকে চেয়ে গলা কেমন এক ধরনে উঁচু ক'রে হেসে উঠল—ছুটোছুটির ফলে কানের পাশের চুল আলুথালু হয়ে মুখের দু-পাশে পড়েছে, ফুল্ল শ্রমোজ্জ্বল গণ্ডদেশে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখে উজ্জ্বল কৌতুকের হাসি—দু-জনে মিলে আলো ধরাচ্ছি, ওর মুখ আমার মুখের অত্যন্ত কাছে—সেই মুহূর্ত্তে আমি ওর দিকে চাইলাম—আমার মনে হ'ল মালতীকে এতদিন ঠিক দেখি নি, আমি ওকে নতুন রূপে দেখলাম, ওর বিজয়িনী নারী রূপে। মনে হ'ল মালতী সত্যিই সুন্দরী, অপূর্ব্ব সুন্দরী।—কিন্তু বেশীক্ষণ দেখার অবকাশ পেলাম না ওর সে রূপ, আলো জ্বেলেই ও আবার ছুটল এবং আমার আনাড়ি-সাহায্যের অপেক্ষা না ক'রেই বাকী জিনিষ আধ-ভেজা, আধ-শুক্‌নো অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে দাওয়ায় এনে জড় করলে।······

এক দিন পুকুরে সকালের দিকে ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতার দিতে দিতে মালতী গিয়ে পড়েছে গভীর জলে। সেই সময় আমিও জলে নেমেছি। আমি জানতাম না যে ও এ-সময়ে নাইতে এসেছে, কারণ সাধারণতঃ ও স্নান করে অনেক বেলায়, আখড়ার কাজকর্ম্ম মিটিয়ে। নাইতে নাইতে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে চেয়ে দেখি মালতী নেই, তার ঘড়াও নেই।

আমি প্রথমে ভাবলাম মালতী মাঝপুকুরে ইচ্ছে ক'রে ডুব দিয়েছে বোধ হয়। বিশেষতঃ সে সাঁতার জানে—কিন্তু খানিক পরে যখন ও উঠল না, তখন আমার ভয় হ'ল, আমি তাড়াতাড়ি সেখানটাতে সাঁতার দিয়ে গেলাম, হাতড়ে দেখি মালতী নেই, ডুব দিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে ওকে পেলাম—চুলে কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে কেমন বেকায়দায়, অতিকষ্টে তাকে ভাসিয়ে নিজে ডুবে জল খেতে খেতে ডাঙার কাছে নিয়ে এলুম। মালতী তখন অৰ্দ্ধ-অচৈতন্য, আমার ডাক শুনে আখড়া থেকে সবাই ছুটে এল—মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ওর শরীর সুস্থ হ'ল। উদ্ধব বাবাজী বকলে, আমি বকলাম, সবাই বকলে।

(এই দিনটা থেকে ওর ওপর আমার একটা কি যে মায়া পড়ে গেল।) সেদিন সন্ধ্যাবেলা কেবলই মনে হ'তে লাগল ও এখানে নিঃসহায়, একেবারে একা। ও সবার জন্যে খেটে মরে। ওর বাপের ধানের জমির উপস্বত্ব আখড়াসুদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজীরা ভোগ করছে, কিন্তু ওর মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই? ও সকলের ময়লা জামা-কাপড় কেচে বেড়াবে, ভাত রেঁধে খাওয়াবে—সৰ্ব্বরকমে সেবা করবে, ওকে ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই ওকে মুখের মিষ্টি তোষামোদে নাচিয়ে নিজেদের স্বার্থ ষোল আনার ওপর সতের আনা বজায় রাখছে, কিন্তু ওর সুখ-দুঃখ কেউ দেখ্‌ছে? এই যে আজ পুকুরের ঘাটে ডুবে মরে যাচ্ছিল আর একটু হ'লে আমি যদি না থাকৃতাম!

ভগবান আমাকে এ কিসের মধ্যে এনে ফেললেন, এ কি জালে দিন-দিন জড়িয়ে পড়ছি আমি! এদের আখড়াতে যে বিগ্রহ আছেন, তাঁকে এরা মানুষের মত সেবা করে। সকালবেলা তাঁকে বাল্যভোগ দেওয়া হয়, দুপুরের ভোগ ত আছেই। ভোগের পর দুপুরের বিগ্রহকে খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। বৈকালে বৈকালিক ভোগ দেওয়া হয়—ফল, মিষ্টান্ন। রাত্রে আবার খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে

দেয়—শীতের রাত্রে বিগ্রহের গায়ে লেপ আশে পাশে বালিশ। উদ্ধব দাস বাবাজী সেদিন লাল শালু কাপড়ের ভাল লেপ ক'রে এনেচে বিগ্রহের ব্যবহারের জন্যে—আগের লেপটা অব্যবহার্য্য হয়ে গিয়েছিল।

এ-সব পুতুল-খেলা দেখলে আমার হাসি পায়। সেদিন সন্ধ্যার সময় একা পেয়ে মালতীকে বললাম—তোমাদের এতদিন হুঁস্ ছিল না মালতী? ছেঁড়া লেপটা এই শীতে কি ব'লে দিতে ঠাকুরকে? যদি অসুখ-বিসুখ হ'ত, এই তেপান্তরের মাঠে না ডাক্তার, না কবিরাজ, দেখত কে তখন? ছিঃ ছিঃ, কি কাণ্ড তোমাদের?

মালতী রাগে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। ও এ-সব কথা আর কাউকে ব'লে দেয় না ভাগ্যে, নইলে উদ্ধব দাস আখড়া থেকে আমায় বিদেয় দিতে এক বেলাও দেরী করত না। অনেক কথা আমি বলি ওদের আখড়া সম্বন্ধে, উদ্ধব দাস সম্বন্ধে—যা অপরের কানে উঠলে আমায় অপমানিত হ'য়ে বিদায় হ'তে হ'ত, কিন্তু মালতী কোন কথা প্রকাশ করে নি কোনদিন। আজকাল মালতী আমার দিকে একটু টেনে চলে ব'লে আখড়ার অনেকের কাছে সেটা চক্ষুশূলের ব্যাপার হয়ে উঠেছে—আমি তা বুঝি।

১৩

শ্রাবণ মাসের প্রথমে আমার পাঠশালা গেল উঠে। আর আমার এখানে শুধুহাতে থাকা অসম্ভব। মালতীকে এক দিন বললাম—শোন, আমি চলে যাচ্ছি মালতী—

সে অবাক হয়ে বললে—কেন চলে যাবেন?

—কতদিন এসেছি ভাবো ত এখানে? প্রায় দশ মাস হ'ল—মালতী চুপ ক'রে থেকে বললে—ঘুরে আবার আসবেন ক'বে?

—ভগবান জানেন। নাও আসতে পারি।

মালতীর মুখের স্বাভাবিক হাসি-হাসি ভাবটা যেন হঠাৎ নিবে গেল। বললে—কেন আসবেন না? আখড়ার কত কাজ বাকী আছে মনে নেই?

ওর মুখ দেখে আমার আবার মনে হ'ল ওর কেউ নেই, এখানে ও একেবারে একা। ওকে বুঝবার মানুষ এই গ্রাম্য অশিক্ষিত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মধ্যে কে আছে? আমার কাছেই ওর যা-কিছু অভিমান আবদার খাটে—ওর মধ্যে যে লীলাময়ী কিশোরী আছে, সে তার নারীত্বের দর্প, গর্ব্ব ও অভিমান প্রকাশ ক'রে সুখ পায় একমাত্র আমার কাছে—আমি তা জানি। তা ছাড়া, ও এখনও বালিকা, ওর ওপর আমার মনে কি যে একটা অনুকম্পা জাগে···ওকে সকল দুঃখ, বিপদ থেকে আড়াল ক'রে রাখি ইচ্ছা হয়। শ্রাবণ মাসে নীল মেঘের রাশি দ্বার-বাসিনীর চারি ধারের দিগন্তবিস্তৃত তালীবনশোভা-মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যায় রোজ রোজ···আমি দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, দেখে দেখে মনে কত কি অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট

আকাঙ্ক্ষা জাগে—মনে হয় ছোট্ট কোন কলস্বনা গ্রাম্য নদীতীরে খড়ের ঘরে মালতীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার পাতবো···আমরা দু-জনে এম্‌নি সব বর্ষা-মেদুর শ্রাবণ-দিনে ব'সে ব'সে কত কথা বলব, কত আলোচনা করব, ওকে রাঁধাতে দেব না, কাজ করতে দেব না, আমার কাছ থেকে উঠতে দেব না—কত বিশ্বাসের কথা, ভক্তির কথা, জ্ঞানের কথা—ও ভগবানের কথা, সাধু-মোহন্তের কথা, আকাশের তারাদের কথা—ও আমায় বুঝবে, আমি ওকে বুঝবো। কিন্তু তা হবার নয়। মালতী ওর বাপের আখড়া ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না—আমি অনেকবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন ক'রে ওর মনের ইচ্ছা বুঝেছি। আমি ওকে চাই একান্ত আমার নিজস্ব-ভাবে—এখানে থাকলে ও দিনে রাতে কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে ওকে সে-ভাবে পাওয়া অসম্ভব। এই আখড়াই হয়েছে ওর আর আমার মধ্যে ব্যবধান। আমি এখান থেকে ওকে নিয়ে যেতে চাই। আমিও এখানে থাকতে পারব না চিরকাল। মালতীকে ভালবাসি, কিন্তু ওকে বিবাহ ক'রে এই রাঢ়-অঞ্চলের এক গ্রাম্য আখড়ায় চিরকাল কি ক'রে কাটাবো বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সেজে? আমি ওকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

এক দিনের একটা ব্যাপারে মালতীকে আরও ভাল ক'রে চিনলুম। দ্বারবাসিনী গ্রামের বৃদ্ধ শম্ভু বাঁড়ুয্যে চার-পাঁচ দিনের জ্বরে মারা গেলেন। তিনি এখানকার সমাজে একঘরে ছিলেন—এটা আমি আগে জানতাম। তাঁর একমাত্র বিধবা কন্যাকে নিয়ে কি-সব কথা কি উঠেছিল—তাই থেকে গ্রামে শম্ভু বাঁড়ুয্যে একঘরে হয়। শম্ভু বাঁড়ুয্যে কোথাও যেতেন না, কারও সঙ্গে মিশতেন না, তাঁর হাতেও দু-পয়সা ছিল—সবাই বলত টাকার গুমর।

বেলা পাঁচটার সময় মালতী এসে বললে—শুনেছেন ব্যাপার? শম্ভু

সেই দুপুর থেকে এক জন লোকও ওদের বাড়ির উঠোন মাড়ায় নি। মড়া-কোলে মেয়েটা দুপুর থেকে ব'সে আছে—ওর মা ত বাতে পঙ্গু, উঠতে পারে না। আপনি আসুন, দু-জনে মড়া ত দোতলা থেকে নামাই—তার পর উদ্ধব-জ্যাঠাকে বলেছি আখড়ার লোকজন নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে—ব্রাহ্মণের মড়া অপর জাতে ছুঁলে ওদের মনে কষ্ট হবে—তাই চলুন আপনি আর আমি আগে নামাই—তার পর আমাদেরই নিয়ে যেতে হবে অজয়ের ধারে—পারবেন ত? তিন জনে ধরাধরি ক'রে সেই ঘোরানো ও সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে মড়া নামানো—ওঃ সে এক কাণ্ড আর কি! মালতী আর শম্ভু বাঁড়ুয্যের মেয়ে নীরদা এক দিকে—আমি অন্য দিকে। নীরদা দেখলুম খুব শক্ত মেয়ে—বয়সে মালতীর চেয়ে বড়—বছর বাইশ হবে ওর বয়েস, মালতীর মত মেয়েলী-গড়নের মেয়ে নয়, শক্ত, জোরালো হাত-পা, একটু পুরুষ-ধরনের। মালতী খুব ছুটোছুটি করতে পারে বটে, কিন্তু ওর গায়ে তেমনি শক্তি নেই। নীরদার সাহায্য না পেলে সেদিন শুধু মালতীকে দিয়ে মড়া নামানো সম্ভব হ'ত ব'লে মনে হয় না। শেষ পর্য্যন্ত গাঁয়ের লোক এল এবং তারাই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। আমিও সঙ্গে গেলুম, মেয়েদের যেতে হ'ল না, মালতী রইল নীরদার কাছে। নীরদা আমায় বললে—দাদা, শ্রাদ্ধের সময় কিন্তু আপনাকে সব ভার নিতে হবে। আর কারও হাতে দিয়ে আমার বিশ্বাস হবে না। রুণি ত আছেই, আপনাকে অন্য কিছু খাটাবো না, ভঁাড়ারের ভার আপনাকে হাতে নিতে হবে, নইলে এ-সব পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার আপনি জানেন না।

বেশ ঘটা ক'রেই শ্রাদ্ধ হ'ল। মালতী বুক দিয়ে পড়ে কি খাটুনিটাই খাট্‌লে! মালতী, তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। ঘুম নেই, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, বসা নেই—কিসে কাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে, কেউ নিন্দে করবে না ওদের, কোন জিনিষ-অপচয় না হয় ওদের,

সে-ই একমাত্র লক্ষ্য। পরের কাজে এমনি ক'রে নিজেকে ঢেলে দিতে তুমি পার তোমার বাবার রক্ত তোমার গায়ে বইছে বলে।

নীরদাকেও চিনলুম সেদিন।

রাত দশটা। রান্নাঘরের দরজার কাছে শূন্য ডালের গামলা, লুচির ধামা, ডান্‌লার বাল্‌তির মধ্যে নীরদা দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিন কি খাটুনি খেটেছে সে! চরকীর পাক ঘুরেছে মালতীর সঙ্গে সমানে সেই সকাল থেকে—এর মধ্যে আবার পীড়িতা মায়ের দেখাশুনা করেছে ওপরে গিয়ে! ঘামে ও শ্রমে মুখ রাঙা, (নীরদার রং বেশ ফর্সা) চুল আলুথালু হয়ে মুখের পাশে কপালে পড়েছে।

আমি বাইরের ক-জন লোককে খাওয়াব ব'লে কি আছে না-আছে দেখতে রান্নাঘরে ঢুকেছি। নীরদা বললে—দাদা, কিছু নেই আর। ক-জন লোক? আচ্ছা দাঁড়ান, ময়দা মাখ্‌ছি, দিচ্ছি ভেজে।

আমি বললুম—আর তুমি আগুনের তাতে যেও না নীরদা। তোমার চেহারা যা হয়েছে! আচ্ছা দাঁড়াও—মালতীকে বলি একটু মিছরির সরবৎ তোমায় বরং দিয়ে—

নীরদা বললে—দাঁড়ান, দাঁড়ান দাদা। রুণি কতবার খাওয়াতে এসেছিল—সে কি চুপ ক'রে থাকবার মেয়ে?

তারপর হেসে বললে—আজ যে একাদশী, দাদা।

আমার চোখে জল এল। আর কিছু বললাম না। মেয়েমানুষের মত সহ্য করতে পারে কোন্ জাত? অনেক শিখলাম এদের কাছে এই ক-মাসে।

মাকে দেখেছি, বৌদিদিকে দেখেছি, সীতাকে দেখেছি, শৈলদিকে দেখেছি, এদেরও দেখলাম। অথচ এই নীরদাকে ভেবেছিলুম অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে, ওর কথাবার্ত্তায় রাঢ় দেশের টান বড় বেশী ব'লে।

মালতী আখড়ায় ফিরে এসে আমায় বললে—অনেকগুলো সন্দেশ এনেছি, খান—নীরদা-দিদি জোর ক'রে দিলে। ভাল সন্দেশ, দ্বারবাসিনীতে এ-রকম করতে পারে না, শিউড়ি থেকে আনানো।

তার পর কেমন এক ধরনের ভঙ্গি ক'রে হাসতে হাসতে বললে—বসুন, ঠাঁই ক'রে দিই আপনাকে। ও-বেলার লুচি আছে, দই আছে,—নীরদা-দিদি এক রাশ খাবার দিয়েছে বেঁধে—

ওকে এত ছেলেমানুষ মনে হয় এই-সব সময়ে!

ঘরে কেউ নেই, নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে ব'সে ও আমায় খাওয়ালে—খেতে খেতে একবার ওর মুখের দিকে চাইলাম। কি অপূর্ব্ব স্নেহ-মমতামাখা দৃষ্টি ওর চোখে! মালতীর কাছে এত ঘনিষ্ঠ যত্ন এই কিন্তু প্রথম। বললে—আমি কি আর দেখিনি যে আজ সারাদিন আপনি শুধু খেটেছেন আর পরিবেশন করেছেন, খাওয়া যা হয়েছিল ও-বেলায় আপনার, তার আমি সন্ধান রাখি নি ভেবেছেন? খান,—না—ও লুচি ক-খানা খেতেই হবে।

খাবো কি, লুচি গলায় আটকে যেতে লাগল—সে কি অপূর্ব্ব উল্লাস, আমার সারাদেহে কিসের যেন শিহরণ! আজ সারাদিনের ভূতগত খাটুনির মধ্যেও মালতী দৃষ্টি রেখেছিল আমি কি খেয়েছি না-খেয়েছি তার ওপর!

ঘন বর্ষা নামল। সারা মাঠ আঁধার ক'রে মেঘ ঝুপসি হয়ে উপুড় হয়ে আছে। এই-সব দিনে মালতীকে সর্ব্বদা পেতে ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে ঘরের কোণে বসে ওর সঙ্গে সারা দিনমান বাজে

বকি। কিন্তু ও আসে না, এমনই সব বর্ষার দিনে আখড়ার যত সব খুচ্‌রো কাজে ও ব্যস্ত থাকে।

দু-একবার যখন দেখা হয় তখন বলি—মালতী, এস না কেন?

মালতী বলে সে আসবে। তার পর এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা কেটে যায়, ও আসে না। আমার রাগ হয়, অভিমান হয়। ও যদি আমার জন্যে একটুও ভাবত, তাহ'লে কি আর না-এসে পারত? ওর কাছে কাজই বড়, আমি কেউ নই। কিন্তু হয়ত অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ মালতী এসে পড়ে। প্রায়ই আসে বিকেলের দিকে এমন কি সন্ধ্যার সময়। চুলটি টান-টান ক'রে বেঁধে, পান খেয়ে ফুল্ল ওষ্ঠাধর রাঙা ক'রে হাসিমুখে আমার দাওয়ার সামনে এসে বলে—কি করছেন?

—এস মালতী, সারাদিন দেখি নি যে?

—আপনার কেবল—সারাদিন দেখি নি, আর এই তখন ডাকলুম এলে না কেন, আর কেন আস না—এই-সব বাজে কথা। আসি কখন? দেখছেন ত। খেয়ে উঠেছি এই ত ঘণ্টাখানেক আগে। কাজ ছিল।

—কি কাজ ছিল আমি আর জানিনে মালতী? উদ্ধব-বাবাজীর কোণের ঘরে মেজেতে চাটাই পেতে ব'সে তোমার সেই কবিতার বই লিখছিলে—আমি দেখি নি বুঝি?

—বেশ দেখেছেন ত দেখেছেন। আসুন বিষ্ণুমন্দিরে সন্দে দেখিয়ে আসি—একা ভয় করে।

বাস্তবিকই আমি ওকে একমনে বই লিখতে দেখেছিলাম। প্রায়ই দেখি। মালতী ঠিক পাগল, আচ্ছা, পাষণ্ডদলনের অনুকরণে লেখা ওর বই কে পড়বে যে রাত নেই দিন নেই বই লিখ্‌ছে! ওর মুখ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ওই এক খেয়াল ওর। মালতীর সঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরে গেলাম। মালতীর এই এক গুণ, ও যখন মেশে

তখন মেশে নিঃসঙ্কোচে, উদার ভাবে। সে-সম্বন্ধে কোনো বাধা বা সংস্কার ও মানে না। কেন এই সন্ধ্যাতে আমার সঙ্গে একা যাবে পুকুরপাড়ের বিষ্ণুমন্দিরে—এ-সব সঙ্কোচ নেই ওর। মন্দিরের পথে যেতে যেতে মনে হ'ল মালতীকে পেয়ে আমার এই বর্ষাসন্ধ্যাটি সার্থক হ'ল। ওকে ছেড়ে আর কিছু চাই নে। কাঞ্চনফুলতলায় গিয়ে বললাম—সে গানটা গাও না, সেদিন গাইছিলে গুণগুণ করে!

মালতী ছেলেমানুষের মত ভঙ্গিতে বললে—উদ্ধব-জ্যাঠা যে শুনতে পাবেন?

—তা পাবেন, পাবেন।

—তবে আসুন পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসি।

মালতীর মুখে গানটা বেশ লাগে—দু-তিনবার শুনলাম।

আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়নতারা হৃদয়ে মোর রাধা-প্যারী
আমার বুকের কোমল ছায়ায় লুকিয়ে খেলে বনবিহারী

গান শেষ হ'লে বললাম—শোন একটা কথা বলি মালতী, তুমি এস না কেন? তোমাকে না দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। আজ সারাদিন বসেছিলুম ঘরের দাওয়ায়, এমন বর্ষা গেল—তুমি চোষট্টিবার আমার ঘরের সামনে দিয়ে যাও, একবার ত এলে পারতে? তোমার সে-সব নেই। শুধু কাজ আর কাজ। এই যে তোমাকে পেয়েছি, আর আমার যেন সব ভুল হয়ে গিয়েছে—সত্যি বলছি মালতী!

মালতী মুখ নীচু ক'রে হাসি হাসি মুখে চুপ ক'রে রইল।

আমি বললাম—হাসলে চলবে না মালতী। কথার আমার উত্তর দাও। তুমি কি ভাবো আমি তোমার এখানে পড়ে আছি খেতে পাই নে বলে তাই? তা নয়।

—কে বলেছে আপনাকে যে না-খেতে পেয়ে এখানে আছেন? আমি আপনাকে বলেছি নাকি?

—যাক ওসব বাজে কথা। আমার কথার উত্তর দাও।

মালতী আবার ছেলেমানুষী আরম্ভ করলে। মুখ নীচু ক'রে হাঁটুর কাছে ঠেকিয়ে মৃদু মৃদু হাসিমুখে হাত দিয়ে শানের ওপর কি আঁকজোক কাটতে লাগল, কখনই ওর কাছে আমার কথার সোজা জবাব পেলাম না।

এক দিন বেড়াতে গিয়ে বাঁধের ওপর ব'সে আমার অবস্থাটা ভেবে দেখলুম। আমি এমন জড়িয়ে পড়েছি যে নড়বার সাধ্য নেই এতটুকু। ও আমার জীবনের সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছে—কি উদ্দেশ্যে এই দু-বছর পথে পথে ঘুরেছি সে উদ্দেশ্য এখন হয়ে পড়েছে গৌণ। এখন মালতীই সব, মালতীই আমার বিশ্বের কেন্দ্র, ও যখন আসে তখন জীবনে আর কিছু চাইবার থাকে না, ও যেদিন আসে, যেদিন হেসে কথা বলে—আমার মত সুখী লোক সেদিন জগতে আর কেউ থাকে না, মাঠের ওপর সূর্য্যাস্ত সেদিন নতুন রঙে রঙীন হয়, বিচালি-বোঝাই গাড়ীগুলো দ্বারবাসিনীর হাটের দিকে যায়, তাদের চাকার শব্দও ভাল লাগে, আখড়ার বাবাজীরা নিমগাছে উঠে নিমপাতা পাড়ে—সেই যেন এক নতুন দৃশ্য। মালতী যেদিন আসে না, কি ভাল ক'রে কথা বলে না, সারাদিন আমার মনে শান্তি থাকে না, ওরই কথা ভাবি সারাক্ষণ—কতক্ষণে দেখা হবে, কতক্ষণে কথা বলবো। মালতী আমায় এমন জালেও জড়িয়ে ফেলেছে।

হয়ত আমি এখান থেকে যেতাম না—হয়ত শেষ পর্য্যন্ত থেকেই

যেতে হ'ত—কিন্তু যেদিন মালতী আমার কাছে ব'সে পুকুরঘাটে গান গাইলে পরদিনই দুপুরের পরে উদ্ধব-বাবাজী আমায় ডেকে বললে—একটা কথা বলি আপনাকে—কিছু মনে করবেন না। আপনার এখানে অনেক দিন হয়ে গেল, আমাদের আখড়ার নিয়ম অনুসারে তিন দিন মাত্র এখানে অতিথ্-বোষ্টমের থাকবার কথা। আপনার প্রায় এগারো মাস হ'ল—

আমি চুপ ক'রে রইলাম, কারণ ওর মুখ দেখেই আমার মনে হ'ল এটা কথার ভূমিকা—আসল কথাটা এখনও বলে নি। ঘটলও তাই। একটু ইতস্ততঃ ক'রে উদ্ধব বললে—তাতেও কিছু না—কি জানেন, আপনার রুণির সঙ্গে এই মেলামেশাটা ভাল দেখাচ্ছে না। আপনার কাছে ব'সে পুকুরঘাটে বিকেলে গান গেয়েছিল—একথা নিয়ে সবাই—বুঝলেন না, মেয়েমানুষের নামে দুর্ণাম রট্‌তে দেরি লাগে না। আমি ওর অভিভাবক—এসব যাতে না হয় আমার দেখা উচিত ব'লেই আপনাকে জানাচ্ছি এ-কথা। রুণি-মা সেরকম মেয়ে নয়। আমি সেটা খুবই জানি, কিন্তু লোকে ত—রাগ করবেন না, ভেবে দেখুন। লোকে যদি ওর নামে পাঁচটা কথা ওঠায় বা বলে সেটা আমার উচিত, হতে না-দেওয়া—নয় কি ?

আমি বললাম—সেটা আমার অন্যায় হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আপনি ত বলেছিলেন, মালতীর যদি ইচ্ছে হয়—ওর বাবার ওর ওপর আদেশ আছে—

—কিন্তু ওর বাবা কণ্ঠিধারী বৈষ্ণব ছিলেন—আপনি ব্রাহ্মণ বটে, বৈষ্ণব নন, তার ওপর আপনি খৃষ্টানী মতের লোক, আপনার সঙ্গে কি ক'রে ওর বিয়ে হ'তে পারে ?···ও বৈষ্ণবের মেয়ে, বৈষ্ণবের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। তবে মালতীর এতে কি ইচ্ছে জানুন, সে যদি বলে, আমার আপত্তি নেই। ওর বাবা ওরই ওপর সে ভার দিয়েছিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যার সময় ওকে নির্জ্জনে পেলাম। ওকে বললাম—একটা কথা বলব মালতী? তুমি অভয় দেবে?

মালতী কৌতুকের সুরে বললে—উঃ মাগো—যাত্রার দলের মত কথা শুনে আর বাঁচি নে। কি বলবেন বলুন না?

—তুমি কি চিরকাল এই ভাবে জীবন কাটাবে? না হাসিখুশী না দরকারী কথা। সব তাতেই হাস কেন—ভেবে দেখ আমি কি বলছি—

—কেন এ জায়গা কি খারাপ? এমন চমৎকার মাঠ, দীঘি—আপনি সেদিন কি কবিতাটা বলছিলেন সেই—

মালতী কথা শেষ না-ক'রেই ছেলেমানুষী হাসি সুরু করলে। আমি বললাম—না, মালতী লক্ষ্মীটি, ওভাবে কথা উড়িয়ে দিও না। আমি তোমায় চাই। তোমায় বিয়ে ক'রে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই। কি বল তুমি?

মালতীর মুখের হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল—সে কেমন বিস্ময়-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে—তার পরেই তার মুখেচোখে ঘনিয়ে এল লজ্জা! ওর এ-ধরনের লজ্জা আমি কখনও দেখি নি।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। মালতীর মুখে উত্তর নেই। বললাম—ভেবে উত্তর দিও। এখুনি চাইনে তোমার উত্তর। তাড়াতাড়ি কিছু না-বলাই ভাল।

মালতী এতক্ষণ মুখ নীচু ক'রে ছিল—এইবার মুখ তুলে কিন্তু অন্য দিকে চেয়ে বললে—কিন্তু এ-জায়গা ছেড়ে যেতে হবে কেন?

ছেড়ে যেতে হবে এই জন্যে মালতী যে, আমি ত তোমাকে এখানে আখড়ায় থাকতে দিতে পারব না। আমিও এখানে চিরদিন কাটাতে পারি নে।

মালতীর মুখের ভাবে আমার মনে হ'ল আমার মুখে এ-কথা যেন ওর পক্ষে অপ্রত্যাশিত। ও কি ভেবেছে আমিও চিরকাল

এই আখড়াতেই থেকে যাব? ওর মুখ দেখে মনে হ'ল আমার এ-কথায় ও মনে বেদনা পেয়েছে। আমার মন মমতায় ভরে উঠল। আমি কথাটা যতদূর সম্ভব নরম করতে পারা যায় ক'রে বললাম— তুমি এখনও ছেলেমানুষ। নিজের সম্বন্ধে বিচার ক'রে দেখতে পারার ক্ষমতা এখনও হয় নি। তুমি একা এখানে কি করবে বল? উদ্ধব-বাবাজীও চিরকাল থাকবেন না। এই মাঠের মধ্যে আখড়ায় চিরজীবন কাটাবে একা একা?

মালতী মুখ নীচু ক'রেই আস্তে আস্তে নরম সুরে বললে— বাবা মরণকালে এর ভার সঁপে দিয়েছিলেন উদ্ধব-জ্যাঠার ওপর নয়, আমারই ওপর। বাবার বিষ্ণুমন্দির আমায় শেষ ক'রে তুলতে হবে। উদ্ধব-বাবাজী চিরদিন থাকবেন না বলেই ত আমার এখানে আরও থাকা দরকার। বাবার ধানের জমি পাঁচ জনে লুটেপুটে খাবে অথচ আখড়ার দোর থেকে অতিথ্-বোষ্টম গরিব লোকে ফিরে যাবে খেতে না পেয়ে এ আমি বেঁচে থেকে দেখতে পারব না। তাতে কোথাও গিয়ে আমার শান্তি হবে?

মালতীর মুখে এ-ধরনের গম্ভীর কথা—বিশেষ করে ওর নিজের জীবন নিয়ে—এই প্রথম শুনলাম। সব জিনিষ নিয়ে ও হালকা হাসি-ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেয়, এই ওর স্বভাব। ও এ-ধরনের কথা বলতে পারে তা আমি ভাবি নি। বললাম—মালতী, এটা কি তোমার মনের কথা? জীবনটা এই ক'রে কাটাবে? এতেই শান্তি পাবে? আমি যে-প্রস্তাব করেছি, তাতে তুমি তাহ'লে রাজি নও? কারণ আমি এখানে থাকতে পারব না চিরকাল এটা নিশ্চয়।

শেষ কথাটা বলতে আমার বুক বেদনায় টনটন ক'রে উঠল, তবুও বলতে হ'ল।

মালতী অনেকক্ষণ বিমুখী হয়ে ব'সে রইল। কাপড়ের একটা

আঁচল পাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ছেলেমানুষের মত সেটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করলে অনেক ক্ষণ। আমার মনে হ'ল ও হয়ত কাঁদছে, নয়ত কান্না চেপে রাখবার চেষ্টা করছে।

তার পরে আমার দিকে একবার চেয়েই আবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—কি করব বলুন, আমার অদৃষ্টে ভগবান এই লিখেছেন, এই আমায় করতে হবে।

আমার কেমন একটা অভিমান হ'ল, বললাম—এই তাহ'লে তোমার শেষ কথা? বেশ মালতী।

মালতী কথার উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইল মুখ নীচু ক'রে। আবার আমার মনে হ'ল ও কাঁদছে, কিম্বা কান্না চেপে রাখবার চেষ্টা করছে—একবার মনে হ'ল ওর ডাগর চোখ দুটি জলে ভ'রে এসেছে—কিন্তু অভিমানের আবেগে আমি সেদিকে ফিরেও চাইলাম না।

রাত্রে বাইরে ব'সে ভাবলুম। সারারাত্রিই ভাবলুম।

মালতীকে ছেড়েই যেতে হ'ল শেষ-পর্য্যন্ত?

ও না এক দিন আমায় বলেছিল···আখড়ার কত কাজ বাকী আছে মনে নেই?

আমার ওপর কিসের দাবিতে একথা বলেছিল ও?

সে-দাবি অগ্রাহ্য ক'রে নিষ্ঠুর ভাবে যাব চলে?

যদি না যাই—তবে এখানে আখড়ার মোহন্ত সেজে চিরকাল থাকতে হবে। এই গ্রাম্য বৈষ্ণবদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও আচার-সংস্কারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হবে।

নিস্তব্ধ তারাভরা রাত্রি। দীঘির পার থেকে হু-হু হাওয়া বইছে।

নীল আকাশের দেবতা, যাঁর ছবি এই বিশাল মাঠের মধ্যে সন্ধ্যার মেঘে, কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ায়, এই রকম তারাভরা অন্ধকার আকাশের তলে কতবার আমার মনে এসেছে তাঁকে পাওয়া আমার

হঠাৎ ফুরিয়ে না যায়···যে দেবতা সকল ধর্ম্মের অতীত, দেশ কালের অতীত···যাঁর বেদী যেমন এই পৃথিবীতে মানুষের বুকে, তেমনি ওই শাশ্বত নীলাকাশে, অনন্ত নক্ষত্রদলের মধ্যে···মর্ত্তে ও অমর্ত্তে তাঁর সৃষ্টি বীণার দুই তার···আমার মনে হোমের আগুন তিনি প্রজ্বলিত রাখুন সুদীর্ঘ যুগসমূহের মধ্যে···শাশ্বত সময় ব্যেপে। আমার যা-কিছু মনের শক্তি, যা-কিছু বড়, তাই দিয়ে তাঁকে বুঝতে চাই। গণ্ডীর মধ্যে তিনি থাকেন না।

পরদিন খুব ভোরে—আখড়ার কেউ তখনও বিছানা থেকে ওঠে নি—কাউকে কিছু না জানিয়ে আমি দ্বারবাসিনীর আখড়া থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কিসের সন্ধানে বেরিয়েছি তা আমি জানি নে—আমার সে সন্ধানের আশা আলেয়ার মত হয়ত আমাকে পথভ্রান্ত ক'রে পথ থেকে বিপথে নিয়ে গিয়ে ফেলবে—শুধু আমি এইটুকু বুঝি যে, যে-কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে আমার চোখের অস্বচ্ছ দৃষ্টির সাম্‌নে তার প্রবৃদ্ধমান রূপ ক্ষীণ হয়ে আসবে—আমার কাছে সেই সন্ধানই সত্য—আর সব মিথ্যে, সব ছায়া।

লোচনদাসের আখড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কোন্ দিকে যাব তার কিছুই ঠিক নেই। বর্ষাকাল কেটে গিয়েছে, আকাশ নির্ম্মল, শরতের সাদা লঘু মেঘখণ্ড নীল আকাশ বেয়ে উড়ে চলেছে, মণিহারী ঘাটের কাছে গঙ্গা পার হবার সময় দেখলুম গঙ্গার চরের কাশ-বনে কি অজস্র কাশফুলের মেলা! খানিকটা রেলে খানিকটা পায়ে হেঁটে এলাম কহলগাঁয়ে। গঙ্গার ধারে নির্জ্জন স্থানটি বড় ভাল লাগল। ষ্টেশনের কাছেই পাহাড়, সাম্‌নে যে-পাহাড়টা, তার ওপরে ডাক-বাংলা—এখানে

আচ্ছা রাত কাটালাম। ডাক-বাংলার কাছে কি চমৎকার এক প্রকার বন্যফুল ফুটেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে তার সুগন্ধে ডাক-বাংলার বারান্দা আমোদ ক'রে রেখেছে।

এক দিন কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে শুনলাম ক্রোশখানেক দূরে গঙ্গার ধারে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে একজন সাধু থাকেন। একখানা নৌকা ভাড়া ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। বটেশ্বরনাথ পাহাড় দূর থেকে দেখেই আমার মনে হ'ল এমন সুন্দর জায়গা আমি কমই দেখেছি, এখানে শান্তি ও আনন্দ পাব। গঙ্গার ধারে অনুচ্চ ছোট পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় জঙ্গল, নানা ধরনের বুনো গাছ, এক ধরনের হলদে পাপড়ি বড় বড় ফুল ফুটেছে [illegible] মত গাছে, নাম জানিনে। একটা বড় গুহা আছে পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের ঢালুতে জঙ্গলের মধ্যে। গুহার মুখের কাছে প্রাচীন একটা বটগাছ, বড় বড় ঝুরি নেমেছে, ঘন ছায়া, পাকা বটফল তলায় প'ড়ে আছে রাশি রাশি। সাধুটির সঙ্গে আলাপ হ'ল, বাড়ি ছিল তাঁর মাদ্রাজে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় চেহারায় হিন্দুস্থানী। সাধুটা খুব ভাল লোক, লম্বাচওড়া কথা নেই মুখে, বাঙালী বাবু দেখে খুব খাতির করলেন। নিজে কাঠ কুড়িয়ে এনে চা ক'রে খাওয়ালেন আমার সম্বন্ধে দু-একটা কথা জিগ্যেস্ করলেন। বললেন, আপনি এখানে যতদিন ইচ্ছে থাকুন, এখানে খরচ খুব কম। আমি এর আগে মুঙ্গেরে কষ্টহারিণীর ঘাটে ছিলাম, শহরবাজার জায়গা, এত খরচ পড়ত যে টিকতে পারলাম না। তাও বটে, আর দেখুন বাবুজী, সাধুরা চিড়িয়ার জাত, আজ এখানে, কাল ওখানে—এক জায়গায় কি ভাল লাগে বেশী দিন?

লোকজন বিশেষ নেই, স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন, কথা বলবার লোক নেই, তার প্রয়োজনও বোধ করি নে বর্ত্তমানে—সারা দিনের মধ্যে সন্ধ্যার সময় সাধুজীর সঙ্গে ব'সে একটু আলাপ করি। এতদিন

কোথাও যে-শান্তি পাই নি, এখানে তার দেখা মিলেছে, একদিন পাহাড়ের ওপরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে একটা সুঁড়ি-পথ পেলাম। পাহাড়ের গা কেটে পথটা করা হয়েছে, ডাইনে উঁচু পাহাড়ের দেওয়ালটা, বাঁয়ে অনেক নীচে গঙ্গা, ঢালুটাতে চামেলীর বন, একটা প্রাচীন পুষ্পিত বকাইন গাছ পথের ধারে। কিছুদূর গিয়ে দেখি, পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা কতকগুলো বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি— গবর্ণমেণ্টের নোটিশ টাঙানো আছে এই মূর্ত্তিগুলো কেউ নষ্ট করতে পারবে না ইত্যাদি। আমি জানতাম না এদের অস্তিত্ব। জায়গাটা অতি চমৎকার, সূর্য্যাস্তের সময় সেদিন পীরপৈঁতির অনুচ্চ শৈলমালার ওপরের আকাশটা লাল হয়ে উঠল, গঙ্গার বুকে আকাশজোড়া রঙীন মেঘমালার ছায়া, খোদাই-করা দেবদেবীর মূর্ত্তি গোধূলির চাপা আলোয় কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য শ্রী ধারণ করেছে—সে শ্রী বড় অদ্ভুত, কোন মূর্ত্তির নাক ভাঙা, কোনটার হাত নেই, বেশীর ভাগ মূর্ত্তিরই মুখ খসে গিয়েছে—কিন্তু গোধূলি রক্ত-পিঙ্গল আকাশের ছায়ায় যক্ষিণী যেন জীবন্ত হয়ে উঠল ; পাথরে কাটা পীন স্তনযুগল যেন রক্তমাংসের ব'লে মনে হ'ল, লুম্বিনী উদ্যানের ছায়াতরুমূলে শায়িতা আসন্ন-প্রসবা মায়া-দেবীর চোখের পলক যেন পড়ে পড়ে···তার পর চামেলীর বন কালো হয়ে গেল, গঙ্গার বুকে নোঙর-করা বড় বড় কিস্তির মাঝিরা হনুমানজীর ভজন গাইতে সুরু ক'রে দিলে, পাহাড়ের পূব দিকে ছোট কেওলিন খনিটাতে মজুরদের ছুটির ঘণ্টা পড়ল—আমি তখনও অবাক হয়ে দাঁড়িয়েই আছি।···রাঢ় দেশের মাঠে সেই খালের ধারের তালবনে সেদিন যে অদ্ভুত ধরনের শান্তি ও আনন্দ পেয়েছিলুম, সেটা আবার পাবার আশায় কত ক্ষণ অপেক্ষা করলুম—কিন্তু পেলাম কই? তার বদলে একটা ছবি মনে এল।

আমি জানি এ-সব কথা ব'লে কি কিছু বোঝানো যায়? যায় না

হয়েছে, সে কি ঘরের লেখা পড়ে কিছু বুঝতে পারবে, না আমিই বোঝাতে পারবো? মনে হ'ল কোথায় যেন এক জন পথিক আছেন, ঐ নীল আকাশ, ঐ রঙীন মেঘমালা, এই কলরবপূর্ণ জীবনধারার পেছনে তিনি চলেছেন···চলেছেন···কোথায় চলেছেন নিজেই হয়ত জানেন না। তাঁর কোন সঙ্গী নেই, তাঁকে কেউ বোঝে না, তাঁকে কেউ ভালবাসে না। অনাদি অনন্তকাল ধরে তিনি একা একা পথ চলেছেন। এই দৃশ্যমান বিশ্ব, এদের সমস্ত সৌন্দর্য্য—তিনি আছেন বলেই আছে।

আমি তাঁকে ছোট ক'রে দেখতে চাইনে। তাঁকে নিয়ে পুতুল-খেলার বিরুদ্ধে ছোটবেলা থেকে আমি বিদ্রোহ ক'রে আসছি। তিনি বিরাট, মানুষে দশহাজার বছর তাঁকে যত বুঝে এসেছে আগামী দশ হাজার বছরে তাঁকে আরও ভাল ক'রে বুঝবে। এক-আধ জন মানুষে কি করবে? সমগ্র মানব জাতি যুগে যুগে তাঁকে উপলব্ধির পথে চলেছে। আমি তাঁকে হঠাৎ বুঝে শেষ করতে চাই নে—কোটী যোজন দূরের তারার আলো যেমন লক্ষ বৎসর ধরে পৃথিবীতে আসছে···আসছে···তেমনি তাঁর আলোও আমার প্রাণে আসছে···হয়ত সিকি পথও এখনও এসে পৌঁছয় নি—কত যুগ, কত শতাব্দী, এখনও দেরী আছে পৌঁছবার। এই ত আমার মনের আসল য়্যাড্‌ভেন্‌চার (adventure), এ যেন আমার হঠাৎ ফুরিয়ে না যায়। আমি খুঁজে বেড়াবো···এই খোঁজাই আমার প্রাণ, বুদ্ধি, হৃদয়কে সঞ্জীবিত রাখ্‌বে, আমার দৃষ্টিকে চিরনবীন রাখ্‌বে।

আমি হয়ত এজন্মে তাঁকে বুঝবো না, হয়ত বহু জন্মেও বুঝবো না—এতেই আনন্দ পাব আমি, যদি তিনি আমার মনের বেদীতে হোমের আগুন কখনও নিবে যেতে না দেন, শাশ্বত যুগসমূহের মধ্যে, সুদীর্ঘ অনাগত কাল ব্যেপে। আমি চাই ওই নীল আকাশ, ওই সবুজ চর,

কলনাদিনী গঙ্গা, দূরের নীহারিকাপুঞ্জ, মানুষের মনোরাজ্য, ওই হলদে-ডানা প্রজাপতি, এই শোভা, এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে তাঁকে পেতে।

লোচনদাসের আখড়াতেই সবাই বললে, আমি নাস্তিক, কারণ আমি বল্‌তাম নাম-জপ করা কেন? ঈশ্বরের নাম দিতে পেরেছে কে? শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধব বাবাজী আমাকে আখড়া ছাড়িয়ে দিল এই জন্যে বোধ হয়।

এক দিন বৈকালে গঙ্গায় নাইতে নেমেছি—কাটারিয়ার ওপারের বহুদূর দিকচক্রবালের প্রান্ত থেকে কালো মেঘ ক'রে ঝড় এল, গঙ্গার বুকে বড় বড় ঢেউ উঠ্‌ল, আমার মুখে কপালে মাথায় বুকে ঢেউ ভেঙে পড়ছে, ওপারের চরের উপর বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, জলের সুঘ্রাণ পাচ্ছি—এরকম কত ঝটিকাময় অপরাহ্ণ ও কত নীরন্ধ্র অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা মনে এল—আমারই জীবনের কত সুখদুঃখময় মুহূর্ত্তের কথা মনে এল—

মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হ'ল, তাকে আনন্দও বল্‌তে পারি, প্রেমও বল্‌তে পারি, ভক্তিও বল্‌তে পারি। তার মধ্যে ও তিনটেই আছে। বটেশ্বরনাথের পাহাড়টার ঠিক ধূসর স্তূপের দিকে চেয়ে, দূর, দূর, দিগন্তের দিকে চেয়ে যেখানে বাংলা দেশ, যেখানে মালতী আছে, যেখানে এমন কত সুন্দর বর্ষার সন্ধ্যা মধুর আনন্দে কাটিয়েছি, কত জ্যোৎস্নারাত্রে শুক্‌নো মকাই-ঝোলানো চালাঘরের দাওয়ার তলায় ব'সে দুজনে কত গল্প করেছি, তার মুখে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে···কতবার অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে সে এসেছে—আবার কতবার ডাকলেও আসে নি, কতবার চোখাচোখি হ'লেই হেসে ফেলেছে—এ কথা মনে হয়ে আমার মনে কেমন একটা উন্মাদনা, আনন্দ, প্রেম, ভক্তি

আরও কত কি ভাবের উদয় হ'ল একটা বড় ভাবের মধ্যে দিয়ে। ওই একটার মধ্যে সবটা ছিল। তাদের আলাদা আলাদা করা যায় না—কিন্তু তারই প্রেরণায় আমার আঙুল আপনা-আপনি বেঁকে গেল, গঙ্গার জলে মা, বাবা, হীরু-জ্যাঠার নামে তর্পণ করলুম, ভগবানের নামে সমস্ত দেহ-মন নুয়ে এল, জলের ওপরই মাথা নত ক'রে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করলুম। সীতার জন্যে করুণ সহানুভূতিতে চোখে জল এল। হঠাৎ ঘোর বৈষয়িকতার জন্যে জ্যাঠামশায়ের প্রতি অনুকম্পা হ'ল—আবার সেই সৃষ্টিছাড়া অপরূপ মুহূর্তেই দেখলুম মালতীকে কি ভালই বাসি, মালতীর সহায়হীন, সম্পদহীন, ছন্নছাড়া মূর্ত্তি মনে ক'রে একটা মধুর স্নেহে, তাকে সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে বাঁচাবার আগ্রহে তাকে রক্ষা করবার, আশ্রয় দেবার, ভালবাসবার, ভাল করবার, তার মনে আনন্দ দেবার, তার সঙ্গে কথা বলবার আকুল আগ্রহে সমস্ত মন ভরে উঠ্‌ল—কি জানি সে মুহূর্ত্ত কি ক'রে এল সেই মেঘান্ধকার বর্ষণমুখর সন্ধ্যাটিতে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন সেই মহামুহূর্ত্তে আমার মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত পুলকের, গৌরবের, অনুভূতির সঞ্চয়হীন বিপুল দানে আত্মপ্রকাশ করলে। সেদিন দেখ্‌লুম ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকার ভক্তির প্রকৃতি মালতীর প্রতি আমার ভালবাসার চেয়ে পৃথক নয়। ও একই ধরনের, একই জাতীয়। যেখানে হৃদয়ের অনুভূতি নেই, ভালবাসা নেই, সেখানে ঈশ্বরও নেই। ভগবানের প্রতি সেদিন যে-ভক্তি আমার এল—তা এল একটা অপূর্ব্ব আনন্দের রূপে—সত্যিকার ভক্তি একটা joy of life···আত্মা, দেহ, মন সেখানে আনন্দে, মাধুর্য্যে আপ্লুত হয়ে যায়।

ঠিক মালতী আমাকে ভালবেসেছে বা আমি মালতীকে ভালবেসেছি এই ভেবে যেমন হয় তেমনি। কোন পার্থক্য নেই। একই অনুভূতি—

দুটো আলাদা আলাদা নাম মাত্র। এতেও মন অবশ হয়ে যায় আনন্দে —ওতেও।

উপলব্ধি ক'রে বুঝলুম যদি কেউ আমাকে আগে এ-সব কথা বল্‌ত, আমার কখনই বিশ্বাস হ'ত না। হওয়া সম্ভবও নয়।

সাধুজী সন্ধ্যাবেলা রোজ ধর্ম্মকথা পড়েন। আমি মনে মনে বলি—সাধুজী আপনি জীবন দেখেন নি। ভালবেসেছেন কখনও জীবনে? প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছেন? যে কখনও নরুণ হাতে নিতে সাহস করে নি, সে যাবে তলোয়ার খেল্‌তে? শুক্‌নো বেদান্তের কথার মধ্যে ঈশ্বর নেই—যেখানে ভাব নেই, ভালবাসা নেই, হৃদয়ের দেওয়া-নেওয়া নেই, আপনাকে হারিয়ে ফেলা, বিলিয়ে দেওয়া নেই—সেখানে ভগবান নেই, নেই, নেই। হৃদয়ের খেলা যে আস্বাদ করেছে, ও-রস কি জিনিস যে বোঝে—ভগবানকে ভালবাসার প্রথম সোপানে সে উঠেছে।

আমি মালতীর কথা এত ভাবি কেন? সে আমাকে এত অভিভূত ক'রে রেখেছে কেন দিন, রাত, সকাল, সন্ধ্যা?...এই বিক্রমশিলা বিহারের পাহাড়মালা, বন-শ্রেণী পাদমূলে প্রবাহিতা পুণ্যস্রোতা নদী, সন্ধ্যারপটে রাঙা সূর্য্যাস্ত, বনচামেলীর উগ্র উদাস গন্ধ—এ-সবের মধ্যে সে আছে, তার হাসি নিয়ে, তার মুখভঙ্গি নিয়ে, তার গলার সুর নিয়ে, তার শতসহস্র টুক্‌রো কথা নিয়ে, তার ছেলেমানুষী ভঙ্গি নিয়ে। কেন তাকে ভুলি নি, কেন তার জন্যে আমার মন সর্ব্বদাই উদাস, উন্মুখ, ব্যাকুল, বেদনায় ভরা, স্মৃতির মাধুর্য্যে আপ্লুত, নিরাশার যন্ত্রণাময়—হঠাৎ তাকে এত ভালবাসলুম কেন? তার কথা মনে যখন আসে, তখন কেওলিন খনির উপরকার পাহাড়চূড়াটায় একটা বকাইন গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে সারাদিন তার কথা ভাবি—খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকে না, ভালও

লাগে না—তার মুখের হাসির স্মৃতিতেই যেন আমায় শান্তিময়, নিভৃত, গৃহকোণ, তার কথার সুর দূরের ব্যবধান ঘুচিয়ে, মাঠ নদী বন পাহাড় পার হয়ে ভেসে এসে আমায় প্রদীপ-জ্বালানো, শান্ত আঙিনায় ছোট্ট খড়ের রান্নাঘরের এক পাশে উপবিষ্ট নিরীহ গৃহস্থ সাজায়—জীবনে তাই যেন চেয়ে এসেছি, সব দুরাশা, সব-কিছু ভুলিয়ে দেয়, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে যায়···এদিকে রোদ চড়ে ওঠে কিংবা সূর্য্য ঢলে পড়ে, বটেশ্বরনাথের পাহাড় রঙে রঙে রাঙা হয়, পাখীর গান হঠাৎ যায় থেমে—সাধুজীর চেলা বর্ম্মানারায়ণ আমাকে খুঁজ্‌তে আসে চা খাবার জন্যে···তখন অনিচ্ছা-সত্ত্বে উঠতে হয়···গাঁজার ধোঁয়ায় অন্ধকার সাধু-বাবাজীর গুহার সাম্‌নে ব'সে দুধবিহীন কড়া চা খেতে খেতে হনুমান-চরিত শুনতে হয়।

সাধুজী আমাকে ভালবাসেন। এই জন্যেই ওর এখানে আছি। এখানে পয়সার্ খরচ নেই বললেই হয়। বারোটা টাকা এনেছিলুম, সাধুজীর হাতে তুলে দিয়েছি—নিতে চান্ নি—আমি পীড়াপীড়ি ক'রে দিয়েছি। একবেলা খাই মকাইয়ের ছাতু, একবেলা রুটি আর ঢেঁড়সের তরকারী। অন্য কিছু এখানে মেলে না। কেওলিন খনির ম্যানেজার মাঝে মাঝে কহলগাঁও থেকে মাছ আনায়, সেদিন ওর বাংলোতে আমায় খেতে বলে—কারণ সাধুর এখানে ওসব কারবার হবার যো নেই।

মালতীর সঙ্গে আবার দেখা হবে না? কিন্তু কি ক'রে হবে তা ত বুঝি নে। আমি আবার সেখানে কোন্ ছুতোয় যাবো? উদ্ধবদাস-বাবাজী আমায় ভাল চোখে দেখতো না। দু-একবার অসন্তোষ প্রকাশও করেছিল, মালতীর সঙ্গে যখন বড় মিশছি—তখন। দু-একবার আমায় এমন আভাসও দিয়েছিল যে এখানে বেশী দিন আর থাক্‌লে ভাল হবে না। ও-সবে আমি ভয় করি নে। সপ্তসিন্ধুপারের দেশ থেকে, মালতীকে আমি ছিনিয়ে আন্‌তে পারি, যদি আমি জান্‌তাম যে মালতীও

আমায় চায়। কিন্তু তাতে আমার সন্দেহ আছে। সেই সন্দেহের জন্যেই ত বেদনা, যা-কিছু যন্ত্রণা। কি জানি, বুঝতে পারি নে সবখানি। রহস্যময়ী মালতীর মনের খবর পুরো এক বছরেও পাই নি।

এক-একবার কিন্তু আমার মনের গভীর গোপন তল থেকে কে বলে, অত সন্দেহ কেন তোমার মনে? তোমার চোখ ছিল কোথায়? মালতীকে বোঝ নি এক বছরেও?

মালতী—কি মাধুর্য্যের রূপ ধরেই সে মনে আসে! তার কথা যখনই ভাবি, অস্ত-আকাশের অপরূপ শোভায়, পাহাড়ের ধূসর ছায়ায়, গঙ্গার কলতানের মধ্যে, ওপারের খাসমহলের চরে কলাইওয়ালীরা মাথায় কলায়ের বোঝা নিয়ে ঘরে যখন ফেরে, যখন সাদা পাল তুলে বড় বড় কিস্তি কহলগাঁয়ের ঘাট থেকে বাংলা দেশের দিকে যায়···কিংবা যখন গঙ্গার জলে রঙীন মেঘের ছায়া পড়ে, খেয়ার মাঝিরা নিজেদের নৌকাতে বসে বিকট চীৎকার ক'রে ঠেট্ হিন্দীতে ভজন গায়—সমস্ত পৃথিবী, আকাশ পাহাড় একটা নতুন রঙে রঙীন হয়ে ওঠে আমার মনে—ওই দূর বাংলা দেশের এক নিভৃত গ্রামের কোণে মালতী আছে, যখন আবার বর্ষা নামে, খুব ঝড় ওঠে, কিংবা পুকুরের ঘাটে একা গা ধুতে যায়, কি বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখায় সন্ধ্যায়—আমার কথা তার মনে পড়ে না? আমার ত পড়ে—সব সময়ই পড়ে, তার কি পড়ে না?

মালতীকে নিয়ে মন কত ভাঙা-গড়া করি, কত অবস্থায় দুজনকে ফেলি মনে মনে, কত বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করি, আমার অসুখ হয়, সে আমার পাশে ব'সে না ঘুমিয়ে সারারাত কাটায়—কত অর্থকষ্টের মধ্যে দিয়ে দু-জনে সংসার করি—সে বলে—ভেবোনা লক্ষ্মীটি, মদনমোহন আবার সব ঠিক ক'রে দেবেন! তার ছোটখাটো সুখদুঃখ, আখড়ার বিগ্রহের ওপর গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস, তার সেবা—আমার ভাল লাগে। মনে হয় কত মেয়ে দেখেছি, সবারই খুঁত আছে, মালতীর

খুঁত নেই। আবার মেয়েরা যেখানে বেশী রূপসী, সেখানে মনে হয়েছে এত রূপ কি ভাল? মালতীর স্নিগ্ধ শ্যামল সুকুমার মুখের তুলনায় এদের এত নিখুঁৎ রূপ কি উগ্র ঠেকে! মোটের ওপর যেদিক দিয়েই যাই—সেই মালতী।

এক-একবার মনকে বোঝাই মালতীর জন্যে অত ব্যস্ত হওয়া দুঃখ বাড়ানো ছাড়া আর কি? তাকে আর দেখতেই পাব না। তাদের আখড়াতে আর যাওয়া ঘটবে না। স্বপ্নকে আঁকড়ে থাকি কেন? কিন্তু মন যদি অত সহজে বুঝতো!

মালতী একটা মধুর স্বপ্নের মত, বেদনার মত, কত দিন কানে-শোনা গানের সুরের মত মনে উদয় হয়। তখন সবই সুন্দর হয়ে যায়, সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, সাধুর বকুনি, পাণ্ডা-ঠাকুরের জ্ঞাতি-বিরোধের কাহিনী—অর্থাৎ কি ক'রে ওর জ্যাঠতুতো ভাই ওকে ঠকিয়ে এতদিন বটেশ্বর শিবের পাণ্ডাগিরি থেকে ওকে বঞ্চিত রেখেছিল তার সুদীর্ঘ ইতিহাস—সব ভাল লাগে। কিন্তু কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না তখন, ইচ্ছে হয় শুধু বসে ভাবি, ভাবি—সারা দীর্ঘ দিনমান ওরই কথা ভাবি।

বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের দিনগুলো মনে আমার অক্ষয় হয়ে থাকবে। রূপে, বেদনায়, স্মৃতিতে, অনুভূতিতে কানায় কানায় ভরা কি সে-সব অপূর্ব্ব দিন! অনেক দিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রেমের অমর মধু-মুহূর্ত্তগুলির ছায়াপাতে-তাদের স্মৃতি আমার কাছে চিরশ্যামল। শরতের দুপুরে নিভৃত পিয়ালতলায়, নিভৃত বননিবিড় অধিত্যকায় চুপ ক'রে ঝরা পাহাড়ী কুরচি ফুলের শয্যায় ব'সে চারি দিকে রৌদ্রদীপ্ত পাহাড়শ্রেণীর

রূপ ও শরতের আকাশের সাদা সাদা মেঘখণ্ডের দিকে চেয়ে চেয়ে মালতীরই ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। তিনটাঙার মাঠে বটগাছের সবুজ মগডালে সাদা সাদা বকের সারি ব'সে আছে, যেন সাদা সাদা অজস্র ফুল ফুটে আছে—কত কি রং, প্রথমে মাটির ধূসর রং, তার পর কালো সবুজ গাছপালা, তার ওপরের পর্দ্দায় নীলকৃষ্ণ পাহাড়, তার ওপরে সুনীল আকাশ ও সাদা মেঘস্তূপ, সকলের নীচে কূলে কূলে ভরা গৈরিক জলরাশি। কিসে যেন পড়েছিলুম ছেলেবেলায় মনে পড়ে—

অলসে বহে তটিনী নীর,
বুঝি দূরে—অতি দূরে সাগর,
তাই গতি মন্থর,
শ্রান্ত, শান্ত, পদসঞ্চার ধীর!

আগে প্রেম কা'কে বলে জানতাম না, জীবনে তা কি দিতে পারে, তা ভাবিও নি কোনদিন। এখন মনে হয় প্রেমই জীবনের সবটুকু। স্বর্গ কবির কল্পনা নয়—স্বর্গ এই পিয়ালতলায়, স্বর্গ তার স্মৃতিতে। নয় ত কি এত রূপ হয় এই শিলাস্তৃত অধিত্যকার, ওই উচ্চ মেঘপদবীর, ওই পুণ্যসলিলা নদীর, ওই বননীল দিগন্তরেখার!

দিনে রাতে মালতী আমার ছাড়ে কখন? সব সময় সে আমার মনে আছে। এই দুপুর, এখন সে আখড়ার দাওয়ায় পরিবেশন করছে। এই বিকেল, এখন সে কাপড় সেলাই করছে, নয় ত মুগকলাই ঝাড়ছে। এই সন্ধ্যা, এখন সে টান-টান ক'রে তার অভ্যস্ত ধরনে চুলটী বেঁধে, ফুল্লাধরে মৃদু হেসে বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখাতে চলেছে। আজ মঙ্গলবার, সারাদিন সে উপোস ক'রে আছে, আরতির পরে দুধ ও ফল খাবে। সেই নিঃসঙ্কোচে পুকুরের ঘাটে বসে বসে আমাকে গান-শোনান, আমার সঙ্গে শিবের মন্দিরে যাওয়া—খাতা পড়ে শোনান—সকলের ওপরে তার

হাসি তার মুখের সে অপূর্ব্ব হাসি! কত কথাই মনে এসে নির্জ্জনে যাপিত প্রতি প্রহরটি আনন্দবেদনায় অলস ক'রে দিত।

দূরের গিরি-সানুর গায়ে ক্রীড়ারত শুভ্র মেঘরাজির মধ্যে এমন কি কোন দয়ালু মেঘ নেই যে এই কূটজ কুসুমাস্তীর্ণ নিভৃত অধিত্যকার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পিয়ালতলার এই নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহবার্ত্তাটি শুনে জেনে নিয়ে বাংলা দেশের প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী অলকাপুরীতে পৌঁছে দেয় তার কানে?

কতবার মনে অনুশোচনা হয়েছে এই ভেবে যে কেন চলে আসতে গিয়েছিলেম অমন চুপি চুপি? তখন কি বুঝেছিলুম মালতী আমায় এত ভাবাবে! কি বুঝে আখড়া ছেড়ে এলাম পাগলের মত! এমনধারা খামখেয়ালী স্বভাব আমার কেন যে চিরকাল, তাই ভাবি। আমার মাথার ঠিক নেই সবাই যে বলে, সত্যিই বলে। এখন বুঝেছি কি ভুলই করেছি মালতীকে ছেড়ে এসে! ওকে বাদ দিয়ে জীবন কল্পনা করতে পারছি নে—এও যেমন ঠিক, আবার এও তেমনি ঠিক যে আর সেখানে আমার ফেরা হবে না।

না—মালতী, আর ফিরে যাব না। কাছে পেয়ে তুমি যদি অনাদর কর? তা সইতে পারব না। তোমার খামখেয়ালী স্বভাবকে আমার ভয় হয়। তার চেয়ে এই ভাল। আমার জীবনে তুমি পুকুরের ঘাটের কত জ্যোৎস্না-রাত্রি অক্ষয় ক'রে দিয়েছ, সেই সব জ্যোৎস্না-রাত্রির স্মৃতি, তোমার বাবার বিষ্ণুমন্দিরে কত সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়ার স্মৃতি—তোমার সে সব আদরের স্মৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাক।

এক বছর কেটে গেল, আবার শ্রাবণ মাস।

হঠাৎ দাদার শালার একখানা চিঠি পেলেম কলকাতা থেকে। দাদার বড় অসুখ, চিকিৎসার জন্যে তাকে আনা হয়েছে ক্যাম্বেল হাসপাতালে।

পত্র পেয়ে প্রাণ উড়ে গেল। সাধুজীর কাছে বিদায় নিয়ে কলকাতায় এলাম। হাসপাতালের দাদার সঙ্গে দেখা করলাম। সামান্য ব্রণ থেকে দাদার মুখে হয়েছে ইরিসিপ্লাস, আজ সকালে অস্ত্রও করা হয়ে গিয়েছে। দাদা আমায় দেখে শরীরে যেন নতুন বল পেলে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাসপাতালে বসে রইলাম দাদার কাছে। দাদা বললে, এখানে বেশ খেতে দেয় জিতু। রোজ প্রতিবেলায় একখানা বড় পাঁউরুটি আর আধ সের ক'রে দুধ দিয়ে যায়। দেখিস এখন, এখুনি আনবে। খাবি রুটী একখানা?

পরদিন সকালে আবার গেলাম হাসপাতালে। আঙুর কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম, বৌবাজারের মোড় থেকে, দাদাকে ব'সে ব'সে খাওয়ালাম। দুপুরের আগে চলে আসছি, দোর পর্য্যন্ত এসেছি, দাদা পেছু ডাকলে—জিতু, শোন্।

দাদা বিছানার ওপর উঠে বসেছে—তার চোখ দুটীতে যেন গভীর হতাশা ও বিষাদ মাখানো। বললে—জিতু, তোর বৌদিদি একেবারে নিপাট ভালমানুষ, সংসারের কিছু বোঝে না। ওকে দেখিস—

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম—ও কি কথা দাদা! তুমি সেরে ওঠ, তোমায় বাড়ি নিয়ে যাব, তোমার সংসার তুমিই দেখবে।

দাদা চুপ ক'রে রইল।

বিকেলে দাদার ওয়ার্ডে ঢুকবার আগে মনে হল, দাদা ত বিছানাতে বসে নেই! গিয়ে দেখি দাদা আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে চার্টে দেখি জ্বর উঠেছে ১০৪ ডিগ্রির ঘরে। পাশের বিছানার রোগী বললে—আপনি চলে যাবার পরে খুব জ্বর এসেছে। কোন কথা বল্‌তে পারেন নি, আপনি আসবার আগে ডেকেছিলাম, সাড়া পাই নি।

সেদিন সারাদিন তেমনি ভাবে কেটে গেল! পরদিনও তাই, দাদার জ্ঞান আর ফিরে এল না—জ্বরও কম্‌ল না, পরদিন রাত্রে আমি রোগীর কাছে রইলাম।

ওঃ, কি বর্ষা সে রাত্রে! ঘনকৃষ্ণ শ্রাবণের মেঘপুঞ্জে আকাশ ছেয়ে গিয়েছে, নির্ণিরীক্ষ অন্ধকারে কোথাও একটা তারা চোখে পড়ে না। একখানা বই পড়ছিলাম দাদার বিছানার ধারে ব'সে। রাত বারোটায় একবার নার্স এল। আমি তাকে বললাম—রোগীর অবস্থা খারাপ—একবার রেসিডেণ্ট মেডিকেল অফিসারকে ডাকাও। ডাক্তার এল, চলেও গেল। রাত তখন দেড়টা। বাইরে কি ভীষণ মুসলধারে বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ ভেঙে পড়বে বুঝি পৃথিবীর ওপরে—সৃষ্টি বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

একজন ছাত্র এসে রোগী দেখে বললে—ইন্‌জেক্‌শন্ দিতে হবে।

আমি বল্‌লাম—বেশ দিন—

তার পর আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। ঘন মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার। হাসপাতালের বারান্দাতে কুলিরা ঘুমুচ্ছে। টাটেনাস্ ওয়ার্ড থেকে অনেকক্ষণ ধরে আর্ত্ত পশুর মত চীৎকার শোনা যাচ্ছে—একবার সেটা থাম্‌ছে, আবার জোরে জোরে হচ্ছে। সাম্‌নের ওয়ার্ডে মেম নার্সটা ঘুরে বেড়াচ্ছে বারান্দাতে।

বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে হেড্ লাইট জ্বালিয়ে একখানা মোটর এসে

ওয়ার্ডের সাম্‌নে দাঁড়াল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তদারক করতে এসেছেন। দাদাকে তিনি দেখ্‌লেন। নার্সকে কি বললেন। ছাত্রটীকে ডেকে কি জিগ্যেস্‌ করলেন। ছাত্রটী আর একটা ইন্‌জেক্‌শন্‌ দিলে।

রাত আড়াইটে। বৃষ্টি আবার সুরু হয়েছে। হাসপাতালের বারান্দার ওদিকের আলোগুলো নিবিয়ে দিয়েছে—অনেকটা অন্ধকার।

দাদার সঙ্গে অনেক কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল। ছেলেবেলাকার কথা, দার্জ্জিলিঙের কথা। সেই আমরা কার্ট রোড ধ'রে উম্‌ল্লাঙের মিশন-হাউস্‌ পর্য্যন্ত বেড়াতে যেতুম, মনে আছে দাদা? একদিন থাপা তোমাকে আমাকে কাদার পুতুল গড়িয়ে দিয়েছিল! মুরগীর ঘরে লুকিয়ে তুমি আর আমি মিছরি চুরি ক'রে সরবৎ খেতুম? তুমি দোকান করলে আটঘরাতে বাবা মারা যাওয়ার পরে পাঁচ সের নুন, আড়াই সের আটা, পাঁচ পোয়া চিনি নিয়ে—সবাই ধার নিয়ে দোকান উঠিয়ে দিলে! বৌদিদিকে কি বলব দাদা?

এবার এসে দাদার খাটের পাশে বসে রইলাম! একটানা বৃষ্টি-পতনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে কেবল টিটেনাস্‌ ওয়ার্ড থেকে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়েও সেই আর্ত্ত চীৎকারটা শোনা যাচ্ছে। একটা ছোট ছেলের টন্‌সিল কাটা হয়েছিল—সে একবার ঘুম ভেঙে উঠে খাবার জল চাইলে। কুলিটা উঠে তাকে জল দিলে।

এই কুলিগুলো, ওই বুড়ো মেথরটা, নার্সেরা—এরা ঘুমোয় কখন? সারারাত জেগে জেগে রোগীদের ফাইফরমাজ্‌ খাটছে। দাদার অবস্থা খারাপ ব'লে সবাই এসে একবার ক'রে দেখে যাচ্ছে। নার্স যে কতবার এল! সবাই তটস্থ···দাদাকে বাঁচাবার জন্য সবারই যেন প্রাণপণ চেষ্টা। বাঁচলে সবাই খুশী হয়। নার্স একবার আমায় বললে—তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও বাবু। সারারাত জেগে ব'সে থাকলে অসুখ করবে তোমারও।

হাসপাতালটিকে আমার মনে হ'ল স্বর্গ। আর্ত্তের সেবা যেখানকার মানুষে মনপ্রাণ দিয়ে করে, সে স্বর্গই। ওই বুড়ো মেথরটা এখানকার দেবদূত। যেদিন কয়েক শতাব্দী আগে শ্রীচৈতন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন, কিংবা, শঙ্করাচার্য্য সংসারের অসারত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন—তাঁদের স্বপ্নে এই স্বর্গের কল্পনা ছিল। চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্ত্তনের দলে নবদ্বীপের গঙ্গার তীরে এই বুড়ো মেথরটা যোগদান করতে পারত, তিনি ওকে কোল দিতেন, ঝাড়খণ্ডের পথে শ্রীক্ষেত্র রওনা হবার সময়ে ওকে পার্শ্বচর ক'রে নিতেন। রাত সাড়ে তিনটে। রাত আজ কি পোয়াবে না? বৃষ্টি একটু থেমেছে। আকাশ কিন্তু মেঘে মেঘে কালো।

এই সময়ে দাদার নাভিশ্বাস উপস্থিত হ'ল! কলের ঘোলা জল দাদার মুখে দিলাম। কানের কাছে গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করলাম। এই বিপদের সময় কি জানি কেন মালতীর কথা মনে পড়ল। মালতী যদি এখানে থাক্‌ত! আটঘরার অশ্বত্থতলার সেই বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা মনে পড়ল—হে দেব, দাদার যাওয়ার পথ আপনি সুগম ক'রে দিন। আপনার আশীর্ব্বাদে তার জীবনের সকল ত্রুটী, সকল গ্লানি ধুয়ে মুছে পবিত্র হোক্; যে সমুদ্র আপনার অনন্ত শয্যা, যে লোকালোক পর্ব্বত আপনার মেখলা—সে-সব পার হয়েও বহুদূরের যে পথে দাদার আজ যাত্রা, আপনার কৃপায় সে পথ তার বাধাশূন্য হোক, নির্ভয় হোক্, মঙ্গলময় হোক্।

পাশের বিছানার রোগী বললে—একবার মেডিকেল অফিসারকে ডাকান না?

আমি বললাম—আর মিথ্যে কেন?

তার পর আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। আমার ঘুম এসেছে, ভয়ানক ঘুম। কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখ্‌তে পারি নে। এর

মধ্যে নার্স দু-বার এল, আমি তা ঘুমের ঘোরেই জানি—আমায় জাগালে না। পা টিপে টিপে এল, পা টিপে টিপেই চলে গেল।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হবার দেরি নেই, হাসপাতালের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে—কিন্তু ঘন কালো মেঘে আকাশ ঢাকা দিনের আলো যদিও একটু থাকে, বোঝা যাচ্ছে না। দাদার খাটের দিকে চেয়ে আমি বিস্ময়ে কেমন হ'য়ে গেলাম। এখনও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি নাকি? দাদার খাটের চারি পাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ওরা দাদার খাটটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। শিয়রের কাছে মা, ডানদিকে বাবা, বাবার পাশেই আটঘরার সেই হীরু রায়—স্যালাইনের টিনটা যেখানে ঝোলানো, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের চা-বাগানের নেপালী চাকর থাপা, ছেলেবেলায় দাদাকে সে কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছিল। তার পরই আমার চোখ পড়ল খাটের বাঁ-দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোটকাকীমার মেয়ে পানী। এদের মূর্ত্তি এত সুস্পষ্ট ও বাস্তব যে একবার আমার মনে হ'ল ওদের সকলেই দেখছে বোধ হয়। পাশের খাটের রোগীর দিকে চেয়ে দেখলুম, সে যদিও জেগে আছে এবং মাঝে মাঝে দাদার খাটের দিকে চাইছে—কিন্তু তার মুখ চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল মুমূর্ষু দাদাকে ছাড়া সে আর কিছু দেখছে না। অথচ কেন দেখতে পাচ্ছে না, এত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সজীব মানুষগুলোকে কেন যে ওরা দেখে না—এ ভেবে ছেলেবেলা থেকে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

আমি জানি এসব কথা লোককে বিশ্বাস করানো শক্ত। মানুষ চোখে যা দেখে না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা পারে না—তা বিশ্বাস করতে সহজে রাজি হয় না। এই জন্যে হাসপাতালের এই রাত্রিটির কথা আমি একটি প্রাণীকেও বলি নি কোনদিন।

দু-তিন মিনিট কেটে গেল। ওরা এখনও রয়েছে। আমি চোখ

মুছলাম, এদিক-ওদিক চাইলাম—চোখে জল দিলাম উঠে। এখনও ওরা রয়েছে। ওদের সবারই চোখ দাদার খাটের দিকে। আমি ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পানীর কাছে দাঁড়ালাম। ওরা সবাই হাসিমুখে আমার দিকে চাইলে। কত কথা বলব ভাবলাম মাকে, বাবাকে, পানীকে—থাপা কবে মরে গিয়েছে জানি নে—সে এখনও তাহ'লে আমাদের ভোলে নি?···তাকেও কি বলব ভাবলাম—কিন্তু মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুল না। এই সময়ে নার্স এল। আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছি নার্স কি এদের দেখতে পাবে না? এই ত সবাই এরা এখানে দাঁড়িয়ে। নার্স কিন্তু এমন ভাবে এল যেন আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। দাদার মুখের দিকে চেয়ে বললে—এ ত হয়ে গিয়েছে—এ কুলি, কুলি—

কুলি খাটটাকে ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে দিতে এল।

তখনও ওরা রয়েছে।···

তার পর আমার একটা অবসন্ন ভাব হ'ল—আমার সেই সুপরিচিত অবসন্ন ভাবটা। যখনই এ-রকম আগে দেখতাম, তখনই এ-রকম হ'ত। মনে পড়ল কত দিন পরে আবার দেখলাম আজ—বহুকাল পরে এই জিনিষটা পেয়েছি—হারিয়ে গিয়েছিল, সন্ধান পাই নি অনেক দিন, ভেবেছিলুম আর বোধ হয় পাব না—আজ দাদার শেষশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তা ফিরে পেয়েছি। আমার গা যেন ঘুরে উঠল—পাশের চেয়ারে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লাম।

নার্স আমার দিকে চেয়ে বললে—পুওর বয়!

জীবনে নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন কাজ একেবারে করি নি তা নয়, কিন্তু বৌদিদিকে দাদার মৃত্যু-সংবাদটা দেওয়ার মত নিষ্ঠুর কাজ আর যে কখনও করি নি, একথা শপথ ক'রে বলতে পারি। বেলা দুটোর সময় দাদার বাড়ী গিয়ে পৌছলাম। পথে দাদার শ্বশুর-বাড়ীর এক সরিকের সঙ্গে দেখা। আমার মুখের খবর শুনেই সে গিয়ে নিজের বাড়িতে অবিলম্বে খবরটি জানালে। বোধহয় যেন বৌদিদির ওপর আড়ি করেই ওদের বাড়ির মেয়েরা—যারা দাদার অসুখের সময় কখনও চোখের দেখাও দেখতে আসে নি—চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিলে। বৌদিদি তখন অত বেলায় দুটো রেঁধে ছেলেমেয়েকে খাইয়ে আঁচিয়ে দিচ্ছে। নিজে তখনও খায় নি। পাশের বাড়িতে কান্নার রোল শুনে বৌদিদি বিস্ময়ের সুরে জিগ্যেস্ করছে—হ্যাঁ রে বিনু, ওরা কাঁদছে কেন রে? কি খবর এল ওদের? কারও কি অসুখ-বিসুখ?

এমন সময়ে আমি বাড়ি ঢুকলাম। আমায় দেখে বৌদিদির মুখ শুকিয়ে গেল। বললে—ঠাকুরপো! তোমার দাদা কোথায়?

আমি বললাম—দাদা নেই, কাল মারা গিয়েছে।

বৌদিদি কাঁদলে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমার মুখের দিকে চেয়ে।

পাশের বাড়িতে তখন ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা ছন্দে ও সুরে শোক-প্রকাশের ঘটা কি! পাড়ার অনেক মেয়ে এলেন সান্ত্বনা দিতে বৌদিদিকে। কিন্তু একটু পরে যখন বৌদিদি পুকুরের ঘাটে নাইতে গেল সঙ্গে এক জন যাওয়া দরকার নিয়মমত—তখন একটা অজুহাতে যে যার বাড়িতে গেল চলে। আমি বিস্মিত হ'লাম এই ভেবে যে

এরা তো বৌদিদির বাপের বাড়িরই লোক! তার একটু পরে বৌদিদি খানিকটা কাঁদলে। হঠাৎ কান্না থামিয়ে বললে, শেষকালে জ্ঞান ছিল ঠাকুরপো? সেই ত মরেই গেল—হাসপাতালে না নিয়ে গেলেই হ'ত! তবু আপনার জন কাছে থাক্‌ত!

আমি বললাম, বৌদিদি তুমি ভেবো না, এখানে যে-রকম গতিক দেখছি তাতে এখানে থাকলে দাদার চিকিৎসাই হ'ত না। এখানে কেউ তোমায় তো দেখে না দেখছি। হাসপাতালের লোকে যথেষ্ট করেছে। বাড়িতে সে রকম হয় না। আমাদের অবস্থার লোকের পক্ষে হাসপাতালই ভাল।

বৌদিদির বাবা মা কেউ নেই—মা আগেই মারা গিয়েছিলেন—বাবা মারা গিয়েছেন আর-বছর। একথা কলকাতাতেই বৌদিদির ভাইয়ের মুখে শুনেছিলুম। বৌদিদির সে ভাইটিকে দেখে আমার মনে হয়েছিল এ নিতান্ত অপদার্থ—তার ওপর নিতান্ত গরীব, বর্ত্তমানে কপর্দ্দকহীন বেকার—তার কিছু করবার ক্ষমতা নেই। বয়সও অল্প, সে কলকাতা ছেড়ে আসে নি, সেখানে চাকুরীর চেষ্টা করছে।

ভেবে দেখলাম এদের সংসারের ভার এখন আমিই না-নিলে এতগুলি প্রাণী না খেয়ে মরবে। দাদা এদের একেবারে পথে বসিয়ে রেখে গেছে। কাল কি করে চলবে সে সংস্থানও নেই এদের। তার ওপর দাদার অসুখের সময় কিছু দেনাও হয়েছে।

এদের ছেড়ে কোথাও নড়তে পারলুম না শেষ পর্য্যন্ত। কালীগঞ্জেই থাকতে হ'ল। এখান থেকে দাদার সংসার অন্য স্থানে নিয়ে গেলুম না, কারণ আটঘরাতে এদের নিয়ে যাবার যো নেই, অন্য জায়গায় আমার নিজের রোজগারের সুবিধা না-হওয়া পর্য্যন্ত বাড়িভাড়া দিই কি ক'রে?

এ সময়ে সাহায্য সত্যি সত্যিই পেলুম দাদার সেই মাসীমার কাছ থেকে—সেই যে বাতাসার কারখানার মালিক কুণ্ডু-মহাশয়ের তৃতীয়

পক্ষের স্ত্রী—সেবার যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিলেন। এই বিপদের সময় আমাদের কোন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর কাছ থেকে সে-রকম সাহায্য আসে নি।

ক্রমে মাসের পর মাস যেতে লাগল।

সংসার কখনও করি নি, করবো না ভেবেছিলুম। কিন্তু যখন এ-ভাবে দাদার ভার আমার ওপর পড়ল, তখন দেখলাম এ এক শিক্ষা—মানুষের দৈনন্দিন অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে, ছোটখাটো ত্যাগ-স্বীকারের মধ্যে দিয়ে, পরের জন্যে খাটুনি ও ভাবনার মধ্যে দিয়ে, তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দিয়ে এই যে এতগুলি প্রাণীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনযাত্রার গুরুভার নিজের ওপর নিয়ে সংসার-পথের চলার দুঃখ—এই দুঃখের একটা সার্থকতা আছে। আমার জীবন এর আগে চলেছিল শুধু নিজেকে কেন্দ্র ক'রে—পরকে সুখী ক'রে নিজেকে পরিপূর্ণ করার শিক্ষা আমায় দিয়েছে—মালতী। পথে বেরিয়ে অনেক শিক্ষার মধ্যে এটিই আমার জীবনে সব চেয়ে বড় শিক্ষা।

কত জায়গায় চাকুরি খুঁজিলাম। আমি যে লেখাপড়া জানি বাজারে তার দাম কাণাকড়িও না। হাতের কোন কাজও জানি নে, সব তাতেই আনাড়ি। কুণ্ডু-মহাশয়ের স্ত্রীর সুপারিশ ধরে বাতাসার কারখানাতেই খাতা লেখার কাজ জোগাড় করলাম—এ কাজটা জানতাম, কলকাতায় চাকুরীর সময় মেজবাবুদের জমিদারী সেরেস্তায় শিখেছিলাম তাই রক্ষে। কিন্তু তাতে ক'টা টাকা আসে? বৌদিদির মত গৃহিণী তাই ওই সামান্য টাকার মধ্যে সংসার চালানো সম্ভব হয়েছে।

ফাল্গুন মাস পড়ে গেল। গাংনাপুরের হাটে আমি কাজে বেরিয়েছি গরুর গাড়ী ক'রে। মাইল-বারো দূর হবে, বেগুন-পটলের বাজরার ওপরে চটের থলে পেতে নিয়ে আমি আর তনু চৌধুরী ব'সে। তনু চৌধুরীর বাড়ি নদীয়া মেহেরপুরে, এখানকার বাজারের সাহাদের

পাটের গদির গোমস্তা, গাংনাপুরে খরিদ্দারের কাছে মাল দেখাতে যাচ্ছে।

গল্প করতে করতে তনু চৌধুরী ঘুমিয়ে পড়ল বাজরার উপরেই। আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি। পথের ধারে গাছে গাছে কচি পাতা গজিয়েছে, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পথের পাশে মাঠের মধ্যে সর্ব্বত্র।

শেষরাত্রে বেরিয়েছিলুম, ভোর হবার দেরি নেই, কি সুন্দর ঝিরঝিরে ভোরের হাওয়া, পূব আকাশে জ্বলজ্বলে বৃশ্চিক রাশির নক্ষত্রগুলো বাঁশবনের মাথায় ঝুঁকে পড়েছে—যেন ওই দ্যুতিমান তারার মণ্ডলী পৃথিবীর সকল সুখদুঃখের বাস্তবতার বন্ধনের সঙ্গে ঊর্দ্ধ আকাশের সীমাহীন উদার মুক্তির একটা যোগ-সেতু নির্ম্মাণ করেছে—যেন আমাদের জীবনের ভারক্লিষ্ট যাত্রাপথের সংকীর্ণ পরিসরের প্রতি নক্ষত্র-জগৎ দয়াপরবশ হয়ে জ্যোতির দূত পাঠিয়েছে আমাদের আশার বাণী শোনাতে—যে কেউ উঁচু দিকে চেয়ে দেখবে, চলতে চলতে সেই দেখতে পাবে তার শাশ্বত মৃত্যুহীন রূপ। যে চিনবে, যে বলবে আমার সঙ্গে তোমার আধ্যাত্মিক যোগ আছে—আমি জানি আমি বিশ্বের সকল সম্পদের, সকল সৌন্দর্য্যের, সকল কল্যাণের উত্তরাধিকারী—তার কাছেই ওর বাণী সার্থকতা লাভ করবে।

এই প্রস্ফুট বন-কুসুম-গন্ধ আমার মনে মাঝে মাঝে কেমন একটা বেদনা জাগায়, যেন কি পেয়েছিলুম, হারিয়ে ফেলেছি। এই উদীয়মান সূর্য্যের অরুণ রাগ অতীত দিনের কত কথা মনে এনে দেয়। সব সময় আমি সে-সব কথা মনে স্থান দিতে রাজি হই নে, অতীতকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা আমার রীতি নয়। তাতে দুঃখ বাড়ে বই কমে না। হঠাৎ দেখি অন্যমনস্ক হয়ে কখন ভাবছি, দ্বারবাসিনীর আখড়া থেকে সেই ভোরে যে আমি চুপি চুপি পালিয়ে এসেছিলাম—কাউকে না

জানিয়ে, মালতীকে ত একবার জানালে পারতাম—মালতীর ওপর এতটা নিষ্ঠুর আমি হয়েছিলুম কেমন ক'রে!

ওকথা চেপে যাই—মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করি। আগে যতটা কষ্ট হ'ত এসব চিন্তায় এখন আর ততটা হয় না, এটা বেশ বুঝতে পারি। মালতীকে ভুলে যেতে থাকি—কিছুদিন পরে আরও যাব। এক সময় যে এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে আজ সপ্তসিন্ধুপারের দেশের রাজকন্যার মত অবাস্তব হয়ে আসছে। হয়ত একদিন একেবারেই ভুলে যাব। জীবন চলে নিজের পথে নিজের মর্জ্জিমত—কারও জন্যে সে অপেক্ষা করে না। মাঝে মাঝে মনে আনন্দ আসে—যখন ভাবি বহুদিন আগে রাঢ়ের বননীল দিগ্বলয়ে ঘেরা মাঠের মধ্যে যে-দেবতার স্বপ্ন দেখেছিলুম তিনি আমায় ভুলে যান নি। তাঁরই সন্ধানে বেরিয়েছিলাম, তিনি পথও দেখিয়েছেন। এই অনুদার রুদ্ধগতি জীবনেও তিনি আমার মনে আনন্দের বাণী পাঠিয়েছেন।

এতেও ঠিক বলা হ'ল না। সে আনন্দ যখন আসে তখন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তখন কি করি, কি বলি কিছু জ্ঞান থাকে না—সে এক অন্য ব্যাপার। আজও তাই ঠিক হ'ল। আমি হঠাৎ পথের ধারে একটা ঝোপের ছায়ায় নেমে পড়লুম গাড়ী থেকে। তনু চৌধুরী বললে—ও কি, উঠে এস। তনু চৌধুরী জানে না আমার কি হয় মনের মধ্যে এ-সব সময়ে, কারও সাহচর্য্য এসব সময়ে আমার অসহ্য হয়, কারও কথায় কান দিতে পারি নে—আমার সকল ইন্দ্রিয় একটা অনুভূতির কেন্দ্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে—একবার চাই শালিখের ছানাগুলো ধান্যকণা খুঁটে খাচ্ছে যেদিকে, তাদের অসহায় পক্ষভঙ্গিতে কি যেন লেখা আছে—একবার চাই তিসির ফুলের রঙের আকাশের পানে—ঝলমল প্রভাতের সূর্য্যকিরণের পানে, শস্যশামল পৃথিবীর পানে—কি রূপ! এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে আমার দ্বিজত্ব, এক গৌরবসমৃদ্ধ, পবিত্র নবজন্ম।

মনে মনে বলি, আপনি আমায় এ-রকম করে দেবেন না, আমায় সংসার করতে দিন ঠাকুর। দাদার ছেলেমেয়েরা, বৌদিদি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে ওদের অন্নের জন্যে, ওদের আমি ত ফেলে দিতে পারব না! এখন আমায় এ-রকম নাচাবেন না।

বৈকালের দিকে পায়ে হেঁটে গাংনাপুরের হাটে পৌছলাম। তনু চৌধুরী আগে থেকেই ঠিক করেছে আমার মাথা খারাপ। রাস্তার মধ্যে নেমে পড়লাম কেন ও-রকম?

ফিরবার পথে সন্ধ্যার রাঙা মেঘের দিকে চেয়ে কেবলই মনে হ'ল ভগবানের পথ ঐ পিঙ্গল ও পাটল বর্ণের মেঘপর্ব্বতের ওপারে কোনো অজানা নক্ষত্রপুরীর দিকে নয়, তাঁর পথ আমি যেখান দিয়ে হাঁটছি, ওই কালু-গাড়োয়ান যে পথ দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এ পথেও। আমার এই পথে আমার সঙ্গে পা ফেলে তিনি চলেছেন এই মুহূর্ত্তে—আমি আছি তাই তিনিও আছেন। যেখানে আমার অসাফল্য সেখানে তাঁরও অসাফল্য, আমার যেখানে জয়, সেখানে তাঁরও জয়। আমি যখন সুন্দরের স্বপ্ন দেখি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আদর করি, পরের জন্যে খাটি—তখন বুঝি ভগবানের বিরাট শক্তির সপক্ষে আমি দাঁড়িয়েছি—বিপক্ষে নয়। এই নীল আকাশ, অগ্নিকেতন উল্কাপুঞ্জ, বিদ্যুৎ আমায় সাহায্য করবে। বিশ্ব যেন সব সময় প্রাণপণে চেষ্টা করছে শিব ও সুন্দরের মধ্যে নিজের সার্থকতাকে খুঁজতে, কিন্তু পদে পদে সে বাধা পাচ্ছে কি ভীষণ! বিশ্বের দেবতা তবুও হাল ছাড়েন নি—তিনি অনন্ত ধৈর্য্যে পথ চেয়ে আছেন। নীরব সেবাব্রত সূর্য্য ও চন্দ্র আশায় আশায় আছে, সমগ্র অদৃশ্যলোক চেয়ে আছে—আমিও ওদের পক্ষে থাকব। বিশ্বের দেবতার মনে দুঃখ দিতে পারব না। জীবনে মানুষ তত ক্ষণ ঠিক শেখে না অনেক জিনিষই, যতক্ষণ সে দুঃখের সম্মুখীন না হয়। আগে স্রোতের শেওলার মত ভেসে ভেসে কত

বেড়িয়েছি জীবন-নদীর ঘাটে ঘাটে—তটপ্রান্তবর্ত্তী যে মহীরুহটি শত স্মৃতিতে তিলে তিলে বৰ্দ্ধিত হয়ে স্নানার্থিনীদের ছায়াশীতল আশ্রয় দান করেছে—সে হয়ত বৈচিত্র্য চায় নি তার জীবনে—কিন্তু একটি পরিপূর্ণ শতাব্দীর সূর্য্য তার মাথায় কিরণ বর্ষণ করেছে, তার শাখা-প্রশাখায় ঋতুতে ঋতুতে বনবিহঙ্গদের কৌতুক বিলাস কলকাকলী নিজের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে—তার মৃদু ও ধীর, পরার্থমুখী গম্ভীর জীবন-ধারা নীল আকাশের অদৃশ্য আশীর্ব্বাদতলে এই একটি শতাব্দী ধরে বয়ে এসেছে—বৈচিত্র্য যেখানে হয়ত আসে নি—গভীরতায় সেখানে করেছে বৈচিত্র্যের ক্ষতিপূরণ। প্রতিদিনের সূর্য্য শুক্রতারার আলোকোজ্জ্বল রাজপথে রাঙা ধূলি উড়িয়ে রজনীর অন্ধকারে অদৃশ্য হন—প্রতিদিনই সেই সন্ধ্যায় আমার মনে কেমন এক প্রকার আনন্দ আসে—দেখি যে পুকুরের ধারে বর্ষার ব্যাঙের ছাতা সূর্য্যের অমৃত কিরণে বড় হয়ে পুষ্ট হয়ে উঠেছে—দেখি উইয়ের ঢিবিতে নতুন শাখা ওঠা উইয়ের দল আজানা বায়ুলোক ভেদ ক'রে হয়েছে মরণের যাত্রী, শরতের কাশবন জীবন-সৃষ্টির বীজ দূরে দূরে, দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে রিক্ততার মধ্যেই পরম কাম্য সার্থকতাকে লাভ করেছে—দারিদ্র্য বা কষ্ট তুচ্ছ, পৃথিবীর সমস্ত বিলাস লালসাও তুচ্ছ, আমি কিছুই গ্রাহ্য করি নে যদি এই জাগ্রত চেতনাকে কখনও না হারাই—যদি হে বিশ্বদেবতা, বাল্যে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যেমন সকাল-বেলাকার সূর্য্যের আলোয় সোনার রঙে রঞ্জিত হ'তে দেখতুম—তেমনি যদি আপনি আপনার ভালবাসার রঙে আমার প্রাণ রাঙিয়ে তোলেন—আমিও আপনাকে ভালবাসি যদি—তবে সকল সংকীর্ণতাকে, দুঃখকে জয় ক'রে আমি আমার বিরাট চেতনার রথচক্র চালিয়ে দিই শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পথে, জন্মকে অতিক্রম ক'রে মৃত্যুর পানে, মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে আবার আনন্দ-ভরা নবজন্মের কোন অজানা রহস্যের আশায়।

১৫

দাদার মৃত্যুর মাস-তিনেক পরে বাতাসার কারখানার কুণ্ডুমশায় হঠাৎ মারা গেলেন। এতে আমাকে বিপদে পড়তে হ'ল। কুণ্ডুমশায়ের প্রথম পক্ষের ছেলেরা এসে কারখানা ও বাড়িঘর দখল করলে। কুণ্ডু মশায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিতান্ত ভালমানুষ পেয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তার হাতের হাজার দুই নগদ টাকা বার ক'রে নিলে। টাকাগুলো হাতে না-আসা পর্য্যন্ত ছেলের বৌয়েরা সৎশাশুড়ীকে খুব সেবাযত্ন করেছিল, টাকা হস্তগত হওয়ার পরে ক্রমে ক্রমে তাদের মূর্ত্তি গেল বদলে। যা দুর্দ্দশা তার সুরু করলে ওরা! বাড়ির চাকরাণীর মত খাটাতে লাগল, গালমন্দ দেয়, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। আমি একদিন গোপনে বললাম—মাসীমা, পঞ্চুকে ডাকঘরের পাস-বই দিও না বা কোন সই চাইলেও দিও না। তুমি অত বোকা কেন তাই ভাবি! আগের টাকাগুলো ওদের হাতে দিয়ে বসলেই বা কি বুঝে?

ডাকঘরের পাস-বইয়ের জন্যে পঞ্চু অনেক পীড়াপীড়ি করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মাসীমা দিয়েই দিত—আমি সেখানা নিজের কাছে এনে রাখলাম গোপনে। কত টাকা ডাকঘরে আছে না জানতে পেরে পঞ্চু আরও ক্ষেপে উঠল। বেচারীর দুর্দ্দশার একশেষ ক'রে তুললে। কুণ্ডুমশায়ের স্ত্রীর বড় সাধ ছিল সৎছেলেরা তাকে মা ব'লে ডাকে, সে সাধ তারা ভাল করেই মেটালে! একদিন আমার চোখের সামনে সৎমাকে ঝগড়া ক'রে খিড়কীদোর দিয়ে বাড়ির বার ক'রে দিলে। আমি মাসীমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলাম, চিঠি লিখে তার এক দূরসম্পর্কের ভাইকে আনালাম—সে এসে মাসীমাকে নিয়ে গেল।

আমার অসাক্ষাতে মাসীমা আবার বৌদিদির হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে ব'লে গেল যাবার সময়—জিতু মাসীমা বলেছিল আমি তিলির মেয়ে, কিন্তু বেঁচে থাক সে, ছেলের কাজ করেছে। আমার জন্যেই তার কারখানার চাকরিটা গেল, যত দিন অন্য কিছু না-হয়, এতে চালিয়ে নিও, বৌমা। আমি দিচ্ছি এতে কিছু মনে ক'রো না, আমার তিন কুলে কেউ নেই, নিতুর বৌয়ের হাতে দিয়ে যদি সুখ পাই, তা থেকে আমায় নিরাশ ক'রো না।

পঙ্কু কারখানা থেকে আমায় ছাড়িয়ে দিলেও আমি আর একটা দোকানে চাকরি পেলাম সেই মাসেই। সৎমায়ের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করার দরুণ কালীগঞ্জের কেউই ওদের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, মাসীমার অমায়িক ব্যবহারে সবাই তাকে ভালবাসত। তবে পঙ্কুদের টাকার জোর ছিল, সব মানিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একদিন সীতার শ্বশুরবাড়ী গেলাম সীতাকে দেখতে। দাদা মারা যাওয়ার পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কারণ এক বেলার জন্যেও ওরা সীতাকে পাঠাতে রাজী হয় নি। সীতা দাদার নাম ক'রে অনেক চোখের জল ফেললে। দাদার সঙ্গে ওর শেষ দেখা মায়ের মৃত্যুর সময়ে। তার পর আমার নিজের কথা অনেক জিগ্যেস্ করলে। সন্ধ্যাবেলায় ও রান্নাঘরে বসে রাঁধছিল, আমি কাছে বসে গল্প করছিলাম। ওর শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল না, বসতবাটিটা বেশ বড়ই বটে, কিন্তু বাস করবার উপযুক্ত কুঠুরী মাত্র চারটি, তাদেরও নিতান্ত জীর্ণ অবস্থা, চুণবালি-খসা দেওয়াল, কার্ণিসের ফাটলে বট অশ্বত্থের গাছ। রান্নাঘরের এক দিকের ভাঙা দেওয়াল বাঁশের চাঁচ দিয়ে বন্ধ, কার্ত্তিক মাসের হিম তাঁতে আটকাচ্ছে না। সীতার বড়-জা ওদিকে আর একটা উনুনে মাটির খুলিতে টাট্‌কা খেজুর-রস জ্বাল দিচ্ছিলেন, তিনি বললেন—যা হবার হয়ে গেল ভাই, এইবার তুমি

একটা বিয়ে কর দিকি? এই গাঁয়েই বাঁড়ুয্যেবাড়িতে ভাল মেয়ে আছে, যদি মত দাও কালই মেয়ে দেখিয়ে দিই।

সীতা চুপ ক'রে রইল। আমি বললাম—একটা সংসার ঘাড়ে পড়েছে, তাই অতি কষ্টে চালাই, আবার একটা সংসার চালাব কোথা থেকে দিদি?

সীতা বললে—বিয়ে আর কাউকে করতে বলি নে মেজদা, এ অবস্থায় বড়দারও বিয়ে করা উচিত হয় নি। তোমারও হবে না। তার চেয়ে তুমি সন্নিসি হয়ে বেড়াচ্ছিলে, ঢের ভাল করেছিলে। আচ্ছা মেজদা, তুমি নাকি খুব ধার্ম্মিক হয়ে উঠেছ সবাই বলে?

আমি হেসে বললাম—অপরের কথা বিশ্বাস করিস্ নাকি তুই? পাগল! ধার্ম্মিক হলেই হ'ল অমনি—না? আমি কি ছিলাম না-ছিলাম তুই ত সব জানিস সীতা। আমার ধাতে ধার্ম্মিক হওয়া সয় না, তবে আমার জীবনের আর একটা কথা তুই জানিস নে, তোকে বলি শোন।

ওদের মালতীর কথা বললুম, দু-জনেই একমনে শুনলে। ওর বড়-জা বললে—এই ত ভাই মনের মত মানুষ ত পেয়েছিলে—ওরকম ছেড়ে এলে কেন?

আমি বললাম—এক তরফা। তাতে দুঃখই বাড়ে, আনন্দ পাওয়া যায় না। সীতা ত সব শুন্‌লি, তোর কি মনে হয়?

সীতা মুখ টিপে হেসে বললে—এক তরফা ব'লে মনে হয় না। তোমার সঙ্গে অত মিশত না তা হ'লে—বা তোমার সঙ্গে কোথাও যেত না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—তুমি আর একবার সেখানে যাও, মেজদা। আমি ঠিক বলছি, তুমি চলে আসবার পরেই সে বুঝতে পেরেছে তার আখড়া নিয়ে থাকা ফাঁকা কাজ। ছেলেমানুষ, নিজের

মন বুঝতে দেরি হয়। এইবার একবার যাও, গিয়ে তাকে নিয়ে এস ত?

সীতা নিজের কথা বিশেষ কিছু বলে না, কিন্তু ওর ওই শান্ত মৌনতার মধ্যে ওর জীবনের ট্র্যাজেডি লেখা রয়েছে! ওর স্বামী সত্যিই অপদার্থ, সংসারে যথেষ্ট দারিদ্র্য, কখনও বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-পয়সা আনবার চেষ্টা করবে না। এক ধরনের নিষ্কর্ম্মা লোকেরা মনের আলস্য ও দুর্ব্বলতা প্রসূত ভয় থেকে পূজো-আচ্চার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে, সীতার স্বামীও তাই। সকালে উঠে ফুল তুলে পূজো করবে, স্নানের সময় ভুল সংস্কৃতে স্তবপাঠ করবে, সব বিষয়ে বিধান দেবে, উপদেশ দেবে। একটু আদা-চা খেতে চাইলাম—সীতাকে বারণ ক'রে ব'লে দিলে রবিবারে আদা খেতে নেই। দুপুরে খেয়ে উঠেই বিছানায় গিয়ে শোবে, বিকেল চারটে পর্য্যন্ত ঘুমুবে—এত ঘুমুতেও পারে! এদিকে আবার ন'টা বাজতে না-বাজতে রাত্রে বিছানা নেবে। সীতা বই পড়ে ব'লে তাকে যথেষ্ট অপমান সহ্য করতে হয়। বই পড়লে মেয়েরা কুলটা হয়, শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে।

দেখলাম লোকটা অত্যন্ত দুর্ম্মুখও বটে। কথায় কথায় আমার মুখে একবার যীশুখৃষ্টের নাম শুনে নিতান্ত অসহিষ্ণু ও অভদ্র ভাবে ব'লে উঠল—ওসব ম্লেচ্ছ ঠাকুর দেবতার নাম ক'রো না এখানে, এটা হিন্দুর বাড়ি, ওসব নাম এখানে চলবে না।

সীতার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলাম, নইলে এ-কথার পর আমি এ বাড়িতে আর জলস্পর্শ করতাম না। সীতা ওবেলা পায়েস পিঠে খাওয়াবার আয়োজন করছে আমি জানি, তার আদরকে প্রত্যাখ্যান করতে কিছুতেই মন সরল না। আমি রাগ ক'রে চলে গেলে ওর বুকে বড় বিঁধবে। ওকে একেবারেই আমরা জলে ভাসিয়ে দিয়েছি সবাই মিলে। সীতা একটাও অনুযোগের কথা উচ্চারণ করলে

না। কারুর বিরুদ্ধেই না। বৌদিদিকে ব'সে ব'সে একখানা লম্বা চিঠি লিখলে, আসবার সময় আমার হাতে দিয়ে বললে—আমায় পাঠাবে না কালীগঞ্জে, তুমি মিছে ব'লে কেন মুখ নষ্ট করবে মেজদা। দরকার নেই। তার পর জল-ভরা হাসি হাসি চোখে বললে—আবার কবে আসবে? ভুলে থেক না মেজদা, শীগগির আবার এসো।

পথে আসতে আসতে দুপুরের রোদে একটা গাছের ছায়ায় বসে ওর কথাই ভাবতে লাগলুম। উমপ্লাঙের মিশন-বাড়ির কথা মনে পড়ল, মেমেরা সীতাকে কত কি ছুঁচের কাজ, উল-বোনার কাজ শিখিয়েছিল যত্ন ক'রে। কার্ট রোডের ধারে নদীখাতের মধ্যে বসে আমি আর সীতা কত ভবিষ্যতের উজ্জল ছবি এঁকেছি ছেলেমানুষী মনে—কোথায় কি হয়ে গেল সব। মেয়েরাই ধরা পড়ে বেশী, জগতের দুঃখের বোঝা ওদেরই বইতে হয় বেশী ক'রে। সীতার দশা যখনই ভাবি, তখনই তাই আমার মনে হয়।

মনটাতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে সীতার স্বামীর একটা কথায়। সে আমায় লক্ষ্য ক'রে একটা শ্লোক বললে কাল রাত্রে। তার ভাবার্থ এই—গাছে অনেক লাউ ফলে, কোন লাউয়ের খোলে কৃষ্ণনাম গাইবার একতারা হয়, কোন লাউ আবার বাবুর্চ্চি রাঁধে গোমাংসের সঙ্গে।

তার বলবার উদ্দেশ্য, আমি হচ্ছি শেষোক্ত শ্রেণীর লাউ। কেন না, আমি ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের আচার মানি নে। দেবদেবীর পূজো আচ্চা করি নে ওর মত। এই সব কারণে ও আমাকে অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখে বুঝলাম এবং বোধ হয় নিজেকে মনে মনে হরিনামের একতারা বলেই ভাবে।

ভাবুক তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার মতের সঙ্গে মিল না হ'লেই সে যদি আমায় ঘৃণা করে তবে আমি নিতান্ত নাচার।

কোন্ অপরাধে আমি বাবুর্চ্চির হাতে-রাঁধা লাউ? ছেলেবেলায় হিমালয়ের ওক্ পাইন বনে তপস্যাস্তব্ধ কাঞ্চনজঙ্ঘার মূর্ত্তিতে ভগবানের অন্য রূপ দেখেছিলাম, তাই? রাঢ়দেশের নির্জ্জন মাঠের মধ্যে সন্ধ্যায় সেবার সেই এক অপরূপ দেবতার ছবি মনে এঁকে গিয়েছে, তাই? সেই অজানা নামহীন দেবতাকে উদ্দেশ ক'রে বলি—যে যা বলে বলুক। আমি আচার মানি নে, অনুষ্ঠান মানি নে, সম্প্রদায় মানি নে, কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত মানি নে, গোঁড়ামি মানি নে, আমি আপনাকে মানি। আপনাকে ভালবাসি। আপনার এই বননীল দিগন্তের রূপকে ভালবাসি, বিশ্বের এই পথিক রূপকে ভালবাসি। আমার এই চোখ, এই মন জন্মজন্মান্তরেও এই রকমই রেখে দেবেন। কখনও যেন ছোট ক'রে আপনাকে দেখতে শিখি নে। আর আমার উপাসনার মন্দির এই মুক্ত আকাশের তলায় যেন চিরযুগ অটুট থাকে। এই ধর্ম্মই আমার ভাল।

বাড়ি ফিরে দেখি বৌদিদি অত্যন্ত অসুখে পড়েছে।

মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কারও সাহায্য পাই নে, ছেলে-মেয়েটা ছোট ছোট—দাদার বড় মেয়েটি আট বছরের হ'ল, সে সমস্ত কাজ করে, আমি রাঁধি আবার বৌদিদির সেবাশুশ্রূষা করি। রোগিণীর ঠিকমত সেবা পুরুষের দ্বারা সম্ভব নয়, তবুও আমি আর খুকীতে মিলে যতটা পারি করি।

বৌদিদির অসুখ দিন-দিন বেড়ে উঠতে লাগল। সংসারে বিশৃঙ্খলার একশেষ—বৌদিদি অচৈতন্য হয়ে বিছানায় শুয়ে, ছেলেমেয়েরা যা খুশী তাই করচে, ঘরের জিনিষপত্র ভাঙছে, ফেলছে, ছড়াচ্ছে—এখানে

নোংরা, ওখানে অপরিষ্কার—কোন্ জিনিষ কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না, হঠাৎ অসময়ে আবিষ্কার করি ঘড়ায় খাবার জল নেই, কি লণ্ঠন জ্বালাবার তেল নেই। বাজার নিকটে নয়, অন্ততঃ দেড় মাইল দূরে এবং বাজারে যেতে হবে আমাকেই। সুতরাং বেশ বোঝা যাবে অসময়ে এসব আবিষ্কারের অর্থ কি।

প্রায় এক মাস এই ভাবে কাট্‌ল। এই এক মাসের কথা ভাবলে আমার ভয় হয়। আমি জানতুম না কখনও যে জগতে এত দুঃখ আছে বা সংসারের দায়িত্ব এত বেশী। রাত দিন কখন কাটে ভুলে গেলাম, দিন, বার, তারিখের হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলুম—কলের পুতুলের মত ডাক্তারের কাছে যাই, রোগীর সেবা করি, চাকৃরি করি, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করি। এই দুঃসময়ে দাদার আট বছরের মেয়েটা আমাকে অদ্ভুত সাহায্য করলে। সে নিজে রাঁধে, মায়ের পথ্য তৈরী করে, মায়ের কাছে বসে থাকে—আমি যখন কাজে বেরিয়ে যাই ওকে ব'লে যাই ঠিক সময় ওষুধ খাওয়াতে, কি পথ্য দিতে।

মেজাজ আমার কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়, একদিন, কোথা থেকে এসে দেখি রোগিণীর সামনের ওষুধের গ্লাসে ওষুধ রয়েছে, খুকীকে ব'লে গিয়েছি খাওয়াতে কিন্তু সে ওষুধ গ্লাসে ঢেলে মায়ের পাশে রেখে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। দেখে হঠাৎ রাগে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠল আর ঠিক সেই সময় খুকী আঁচলে কি বেঁধে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমি রুক্ষ সুরে বললাম—খুকী এদিকে এস—

আমার গলার সুর শুনে খুকীর মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। সে ভয়ে ভয়ে দু-এক পা এগিয়ে আসতে লাগল, বরাবর আমার চোখের দিকে চোখ রেখে। আমি বললাম—তোর মাকে ওষুধ খাওয়াস্ নি কেন? কোথায় বেরিয়েছিলি বাড়ি থেকে?

সে কোন জবাব দিতে পারলে না—ভয়ে নীলবর্ণ হয়ে আমার

মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ কি যে রাগ হ'ল চণ্ডালের মত! তাকে পাখার বাঁট দিয়ে আথালি-পাথালি মারতে লাগলাম—প্রথম ভয়ে মার খেয়েও সে কিছু বললে না, তার পরে আমার মারের বহর দেখে সে ভয়ে কেঁদে উঠে বললে—ও কাকা-বাবু আপনার পায়ে পড়ি, আমায় আর মারবেন না, আমি আর কখন এমন করবো না—

তার হাতের মুঠো আল্‌গা হয়ে আঁচলের প্রান্ত থেকে ছুটো মুড়ি পড়ে গেল মেঝেতে। সে মুড়ি কিন্‌তে গিয়েছিল এক পয়সার, খিদে পেয়েছিল ব'লে। ভয়ে তাও যেন তার মনে হচ্ছে কি অপরাধই সে ক'রে ফেলেছে!

আমার জ্ঞান হঠাৎ ফিরে এল। মুড়িক'টা মেজেতে পড়ে যাওয়ার ঐ দৃশ্যে বোধ হয়। নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেলাম। সমস্ত দিন ভাবলাম—ছিঃ, এ কি ক'রে বসলাম! আট বছরের কচি মেয়েটা সারাদিন ধরে খাটছে, এক পয়সার মুড়ি কিনতে গিয়েছে আর তাকে এমনি ক'রে নির্ম্মমভাবে প্রহার করলাম কোন প্রাণে?

জীবনে কত লোকের কত বিচার করেছি তাদের দোষগুণের জন্যে—দেখলাম কাউকে বিচার করা চলে না—কোন্ অবস্থার মধ্যে প'ড়ে কে কি করে সে কথা কি কেউ বুঝে দেখে?

বৌদিদির অসুখ ক্রমে অত্যন্ত বেড়ে উঠল। দিন-দিন বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল দেখে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে; এদিকে, এক মহা দুশ্চিন্তা এসে জুটল, যদি বৌদিদি নাই বাঁচে—এই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি কি করব? বিশেষ ক'রে কোলের মেয়েটাকে নিয়ে কি করি? ছোট্ট খুকী মোটে এই দশ মাসের—কি সুন্দর গড়ন, মুখ, কি চমৎকার মিষ্টি হাসি! এই দেড় মাস তার অযত্নের এক শেষ

হচ্ছে—উঠোনের নারকোলতলায় চটের থলে পেতে তাকে রদ্দুরে শুইয়ে রাখা হয়—বড় খুকী সব সময় তাকে দেখতে পারে না—কাঁদলে দেখবার লোক নেই, মাতৃস্তন্য বন্ধ এই দেড় মাস—হর্লিক খাইয়ে অতি কষ্টে চলছে। রাত্রে আমার পাশে তাকে শুইয়ে রাখি, মাঝরাত্রে উঠে এমন কান্না সুরু করে মাঝে মাঝে—ঘুমের ঘোরে উঠে তাকে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াই—বড় খুকীকে আর ওঠাই নে। রাত্রে ত প্রায়ই ঘুম হয় না, রোগীকে দেখা-শুনো করতেই রাত কাটে—মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে পড়ি। পাড়ায় এত বৌ-ঝি আছে—দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম কেউ কোনদিন বললে না যে খুকীকে নিয়ে গিয়ে একবার মাইয়ের দুধ দিই। আমি একা কত দিকে যাব—তা ছাড়া আমার হাতের পয়সাও ফুরিয়েছে। এই দেড় মাসের মধ্যে সংসারের রূপ একেবারে বদলে গিয়েছে আমার চোখে—আমি ক্রমেই আবিষ্কার করলাম মানুষ মানুষকে বিনা স্বার্থে কখনও সাহায্য করে না—আমি দরিদ্র, আমার কাছে কারুর কোন স্বার্থের প্রত্যাশা নেই, কাজেই আমার বিপদে কেউ উঁকি মেরেও দেখতে এল না। না আসুক, কিন্তু কোলের খুকীটাকে নিয়ে যে বড় মুস্কিলে পড়ে গেলাম! ও দিন-দিন আমার চোখের সামনে রোগা হয়ে যাচ্ছে, ওর অমন কাঁচা সোনার রঙের ননীর পুতুলের মত ক্ষুদে দেহটিতে যেন কালি মেড়ে দিচ্ছে দিন-দিন—কি করবো ভেবে পাই নে, আমি একেবারেই নিরুপায়। স্তন্যদুগ্ধ আমি ওকে দিতে ত পারি নে?

কিন্তু এর মধ্যে আবার মুস্কিল এই হ'ল যে স্তন্যদুগ্ধ ত দূরের কথা, গরুর দুধও গ্রামে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। গোয়ালারা ছানা তৈরি ক'রে কল্‌কাতায় চালান দেয়, দুধ কেউ বিক্রী করে না। এক জন গোয়ালার বাড়িতে দুধের বন্দোবস্ত করলাম—সে বেলা বারোটা-একটার এদিকে দুধ দিত না। খুকী খিদেতে ছট্‌ফট্ করত, কিন্তু চুপ ক'রে থাকত—

একটুও কাঁদত না। আমার বুড়ো-আঙুলটা তার মুখের কাছে সে সময় ধরলেই সে কচি অসহায় হাত দুটি দিয়ে আমার আঙুলটা ধরে তার মুখের মধ্যে পূরে দিয়ে ব্যগ্র, ক্ষুধার্ত্ত ভাবে চুষত—তা থেকেই বুঝতাম মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত এই হতভাগ্য শিশুর স্তন্যক্ষুধার পরিমাণ।

ওকে কেউ দেখতে পারে না—দু-একটি পাড়ার মেয়ে যারা বেড়াতে আসত, তারা ওকে দেখে নানা রকম মন্তব্য করত। ওর অপরাধ এই যে ও জন্মাতেই ওর বাবা মারা গেল, ওর মা শক্ত অসুখে পড়ল। খুকীর একটা অভ্যাস যখন-তখন হাসা—কেউ দেখুক আর নাই দেখুক, সে আপন মনে ঘরের আড়ার দিকে চেয়ে ফিক্ ক'রে একগাল হাসবে। তার সে ক্ষুধাশীর্ণ মুখের পবিত্র, সুন্দর হাসি কতবার দেখেছি—কিন্তু সবাই বলত, আহা কি হাসেন, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখছে? উঠোনের নারকোলতলায় চট পেতে রোদ্রে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, কত দিন দেখেছি নীল আকাশের দিকে চোখ দুটি তুলে সে আপন মনে অবোধ হাসি হাসছে। সে অকারণ, অপ্রার্থিত হাসি কি অপূর্ব্ব অর্থহীন খুশীতে ভরা! ছোট্ট দেহটি দিন-দিন হাড়সার হয়ে যাচ্ছে, অমন সোনার রং কালো হয়ে গেল, তবুও ওর মুখে সেই হাসি দেখছি মাঝে মাঝে—কেন হাসে, কি দেখে হাসে কে বলবে?

এক এক দিন রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি ও খুব চেঁচিয়ে কাঁদছে। মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। বড় খুকীকে বলতাম, একটু দুধ দে ত গরম ক'রে, হয়ত খিদের কাঁদছে। সব দিন আবার রাত্রে দুধ থাকত না। সেদিন আঙুল চুবিয়ে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়াতে হ'ত। একদিন সকালে ওর কান্না দেখে আর থাকতে পারলাম না—রোগীর সেবা ফেলে দু-ক্রোশ তফাতের একটা গ্রাম থেকে নগদ পয়সা দিয়ে আধসের দুধ জোগাড় ক'রে নিয়ে এসে ওকে খাওয়ালুম। গোয়ালাকে কত খোসামোদ করেও বেলা বারোটার আগে কিছুতেই দুধ দেওয়ানো গেল না।

মানুষ যদি বিবেচনাহীন হয়, নির্ব্বোধ হয় তবে বাইরে থেকে তাকে পশুর চেয়েও নিষ্ঠুর মনে করা দোষের নয়। যখন খুকীর দুধের জন্যে আমি সারা গ্রামখানার প্রত্যেক গোয়ালাবাড়ি খুঁজে বেড়িয়েছি যদি সকালের দিকে কেউ একটু দুধ দিতে পারে—যে বলেছে হয়ত ওখানে গেলে পাওয়া যাবে সেখানেই ছুটে গিয়েছি, আগাম টাকা দিতে চেয়েছি কিন্তু প্রতিবারই বিফল হয়ে ফিরে এসেছি—সে সময় ঠিক আমার বাড়ির পাশেই সুরপতি মুখুয্যের বাড়িতে দেড় সের ক'রে দুধ হ'ত। সুরপতি সস্ত্রীক বিদেশে থাকেন, বাড়িতে থাকেন তাঁর বিধবা বড় ভাজ নিজের একমাত্র বিধবা মেয়ে নিয়ে। এঁদের অবস্থা ভাল, দোতলা কোঠা বাড়ি, ছ-সাতটা গরু, জমিজমা, ধানভরা গোলা। সকালে মায়েঝিয়ের চা খাবার জন্যে দুধ দোয়া হয়, মেয়েটা নিজেই গাই দুইতে জানে, সকালে আধ সের দুধ হয়, দুপুরে বাকী এক সের। ওঁরা জানেন যে দুধের জন্যে খুকীর কি কষ্ট যাচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে কথা হয়েছে অনেকবার, আমায় অনেকবার প্রৌঢ়া মহিলাটি জিগ্যেসও করেছেন আমি দুধের কোনো সুবিধা করতে পারলাম কি না—দু-চার দিন সকালে ডেকে আমায় চাও খাইয়েছেন, কিন্তু কখনও বলেন নি এই দুধটুকু নিয়ে গিয়ে খুকীকে খাওয়াও ততক্ষণ। আমিও কখনও তাঁদের বলি নি এ নিয়ে, প্রথমতঃ আমার বাধ-বাধ ঠেকেছে, দ্বিতীয়তঃ, আমার মনে হয়েছে এঁরা সব জেনেও যখন নিজে থেকে দুধের কথা বলেন নি, তখন আমি বললেও এরা ছলছুতো ক'রে দুধ দেবেন না। তবুও আমি এঁদের নিষ্ঠুর বা স্বার্থপর ভাবতে পারি নে—বিবেচনাহীনতা ও কল্পনাশক্তির অভাব এঁদের এরকম ক'রে তুলেছে।

কতবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি—"ওর কষ্ট আমি আর দেখতে পারি নে, আপনি ওকে একটু দুধ দিন।"

ওর মুখের সে অবোধ উল্লাসের হাসি প্রতিবার ছুরির মত আমার বুকে বিঁধেছে। কতবার মনে মনে ভেবেছি আমি যদি দেশের ডিক্‌টেটর হতাম, তবে আইন ক'রে দিতাম শিশুদের দুধ না-দিয়ে কেউ আর কোন কাজে দুধকে লাগাতে পারবে না।

কতবার ভেবেছি বৌদিদি যদি না বাঁচে, এই কচি শিশুকে আমি কি ক'রে মানুষ করব? স্তন্যদুগ্ধ একে কেউ দেবে না এই পাঁড়াগাঁয়ে, বিলিয়ে দিলেও মেয়েসন্তান কেউ নিতে চাইবে না—নিতান্ত নীচু জাত ছাড়া। আটঘরাতে থাকতে ছেলেবেলায় এরকম একটা ব্যাপার শুনেছিনু—গ্রামের শশিপদ ভট্‌চাজের স্ত্রী মারা যায় দুটি শিশুসন্তান রেখে। শশিপদ ভট্‌চাজের কেউ ছিল না—এদিকে শিশু দুটিই মেয়ে, অবশেষে যদু মুচির বৌ এসে মেয়ে দুটিকে নিয়ে গিয়েছিল।

এই সোনার খুকীকে সেই রকম বিলিয়ে দিতে হবে পরের হাতে? কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে চেয়ে এই ভাবনায়। এই বিপদে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে মালতীর কথা। মালতী আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, সে কোন উপায় বার করবেই, যদি খুকীকে বুকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। সে চুপ ক'রে থাকতে পারবে না। তার ওপর অভিমান ক'রে চলে এসেছিলাম, দেখা পর্য্যন্ত ক'রে আসি নি আসবার সময়—আর তার পর এতদিন কোন খোঁজখবর নিই নি—একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিই নি, আমার বিপদের সময়ে সে আমার সব দোষ ক্ষমা ক'রে নেবে।

কিন্তু খুকী আমায় সব চিন্তা থেকে মুক্ত ক'রে দিলে। তার যে হাসি কেউ দেখতে চাইত না, একদিন শেষরাত্রি থেকে সে হাসি চিরকালের জন্য মিলিয়ে গেল। অল্পদিনের জন্যে এসেছিল কিন্তু বড় কষ্ট পেয়ে গেল। কিছুই সে চায় নি, শুধু একটু মাতৃস্তন্য, কি লোলুপ হয়ে উঠেছিল তার জন্যে, তার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দুটি দিয়ে ব্যগ্রভাবে আমার

আঙুলটা আঁকড়ে ধরে কি অধীর আগ্রহে সেটা চুষত মাতৃস্তন ভেবে! আমারও কি কম কষ্ট গিয়েছে অবোধ শিশুকে এই প্রতারণা করতে? জগতে কত লোক কত সঙ্গত অসঙ্গত খেয়াল পরিতৃপ্ত করবার সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছে, আর একটি ক্ষুদ্র, অস্ফুটবাক্ শিশুর নিতান্ত ন্যায্য একটা সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল কেন তাই ভাবি।

১৬

বৌদিদি ক্রমে সেরে উঠলেন, কিছুদিন পরে আমার হঠাৎ একদিন একটু জ্বর হ'ল। ক্রমে জ্বর বেঁকে দাঁড়াল, আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। দিনের পর দিন যায় জ্বর ছাড়ে না। একুশ দিন কেটে গেল। দিনের রাতের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি যেন, কখন রাত কখন দিন বুঝতে পারি নে সব সময়। মাঝে মাঝে চোখ মেলে দেখি বাইরের রোদ একটু একটু ঘরে এসেছে তখন বুঝি এটা দিন। বিছানার ওপাশটা ক্রমশঃ হয়ে গেল বহু দূরের দেশ, আফ্রিকা কি জাপান, ওখানে পৌছনো আমার শরীর ও মনের শক্তির বাইরে। অধিকাংশ সময়ই ঘোর-ঘোর ভাবে কাটে—সে অবস্থায় যেন কত দেশ বেড়াই, কত জায়গায় যাই। যখন যাই তখন যেন আর আমার অসুখ থাকে না, সম্পূর্ণ সুস্থ আনন্দে মন ভরে ওঠে, রোগশয্যা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। ছেলেবেলাকার সব জায়গাগুলোতে আবার গেলাম যেন, আটঘরার বাড়ি বাদ গেল না। হঠাৎ ঘোর কেটে যায়, দেখি কুলদা ডাক্তার বুকে নল বসিয়ে পরীক্ষা করছে।

একবার মনে হ'ল দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে, আমি দ্বারবাসিনীতে যাচ্ছি খুকীকে কোলে নিয়ে। দুর্গাপুরের ডাঙা পার হয়ে গেলাম, আবার সেই

কাঁদোড় নদী, সেই তালবন, রাঙা মাটির পথ। মালতী বড় ঘরের দাওয়ায় বসে কি কাজ করছে। উদ্ধবদাস আমায় দেখে চিনলে, কাছে এসে বললে—বাবু যে—কি মনে ক'রে এতদিন পরে? আপনার কোলে ও কে? মালতী কাজ ফেলে মুখ তুলে দেখতে গেল উদ্ধবদাস কার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছে। তার পর আমায় চিনতে পেরে অবাক ও আড়ষ্ট হয়ে সেইখানেই বসে রইল। আমি এগিয়ে দাওয়ার ধারে গিয়ে বললাম—তুমি কি ভাববে জানিনে মালতী, কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়েই এসেছি। এই ছোট খুকী আমার দাদার মেয়ে, এর মা সম্প্রতি মারা গিয়েছে। একে বাঁচিয়ে রাখবার কোন ব্যবস্থা আমার মাথায় আসে নি। আর আমার কেউ নেই—একমাত্র তোমার কথাই মনে হ'ল, তাই একে নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। একে নাও, এর সব ভার আজ থেকে তোমার ওপর। তুমি ছাড়া আর কারও হাতে একে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না।

মালতী যেন তাড়াতাড়ি খুকীকে আমার কোল থেকে তুলে নিলে। তার পর আমার রুক্ষ চুল ও উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। পরক্ষণেই সে দাওয়া থেকে নেমে এসে বললে—আপনি আসুন, উঠে এসে বসুন।

আখড়ায় আর যেন কেউ নেই। উদ্ধবদাসকেও আর দেখলাম না। শুধু মালতী আর আমি। ও ঠিক সেই রকমই আছে—সেই হাসি, সেই মুখ, সেই ঘাড় বাঁকিয়ে কথা বলার ভঙ্গি। হেসে বললে—তার পর?

আমি বললাম—তার পর আর কি? এই এলাম।

—এতদিন কোথায় ছিলেন?

—নানা দেশে। তার পর দাদা মারা গেলেন, আমার ওপরে ওদের সংসারের ভার।

—উঃ, কি নিষ্ঠুর আপনি!

তার পর সে বললে—আপনি বসুন, খুকীর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে। একবার নীরদা-দিদিকে ডাকি।

আমি বললাম—আমি কিন্তু এখনই যাব মালতী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ফেলে রেখে এসেছি পরের বাড়িতে। আমাকে যেতেই হবে।

মালতী আশ্চর্য্য হয়ে বললে—আজই? আমি বললাম—আমার কাজ আমি শেষ করেছি, এখন তুমি যা করবে কর খুকীকে নিয়ে। আমি থেকে কি করব? আমি যাই।

মালতী স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল—আমায় নিয়ে যান তবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম—সে কি মালতী? তুমি যাবে আমার সঙ্গে? তোমার এই আখড়া?

মালতীর সঙ্গে যেদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সেদিনটি যেমন ও চোখ নামিয়ে কথা বলেছিল—ঠিক তেমনই ভঙ্গিতে চোখ মাটির দিকে রেখে স্পষ্ট ও দৃঢ় সুরে বললে—আপনি আমায় নিয়ে চলুন সঙ্গে যেখানে আপনি যাবেন। এবার আপনাকে একলা যেতে দেব না।

একচল্লিশ দিনে জ্বর ছেড়ে গেল। সেরে উঠলে বৌদিদি একদিন বললেন—জ্বরের ঘোরে 'মালতী' 'মালতী' ব'লে ডাকতে কাকে? মালতী কে ঠাকুরপো?

আমি বললাম—ও একটি মেয়ে। বাদ দাও ও-কথা। রোজ বলতাম? কত দিন বলেছি?

এই অসুখ-বিসুখে মাসীমার দেওয়া সেই একশো টাকা ত গেলই, বৌদিদির গায়ের সামান্য যা দু-একখানা গহনা ছিল তাও গেল। নতুন চাকুরীটাও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে কামালপুর ব'লে একটা গ্রাম আছে। নিতান্ত পাড়াগাঁ এবং জঙ্গলে ভরা। সেখানকার দু-এক জন জানা-শোনা ভদ্রলোকের পরামর্শে সেখানে একটা পাঠশালা খুললাম। বৌদিদিদের আপাততঃ কালীগঞ্জে রেখে আমি চলে গেলাম কামালপুরে। একটা বাড়ির বাইরের ঘরে বাসা নিলাম—বাড়ির মালিক চাকুরীরস্থানে থাকেন, বাড়িটাতে অনেক দিন কেউ ছিল না। বাড়ির পিছনে একটা বড় আম-কাঁঠালের বাগান।

পাঠশালায় অনেক ছেলে জুটল—কতকগুলি ছোট মেয়েও এল। যা আয় হয়, সংসার একরকম চলে যায়।

সময় বড় বড় মনের দাগ মুছে দেবার মন্ত্র জানে। আবার নতুন মন, নতুন উৎসাহ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একটা নতুন অধ্যায় কি রকমে সুরু হ'ল তাই এখানে বলব।

পাঠশালা খুলবার পরে প্রায় দু-বছর কেটে গিয়েছে। ভাদ্র মাস। বেশ শরতের রোদ ফুটেছে। বর্ষার মেঘ আকাশে আর দেখা যায় না। একদিন আমি পাঠশালায় গিয়েছি, একটা ছোট মেয়ে বলছে—মাষ্টার মশায়, পেনো হিরণদিদির হাত আঁচড়ে কামড়ে নিয়েছে, ওই দেখুন ওর হাতে রক্ত পড়ছে।

যে মেয়েটির হাতে আঁচড়ে নিয়েছে তার নাম হিরণ্ময়ী, বয়স হবে বছর চোদ্দ, পাঠশালার কাছেই ওদের বাড়ি—কিন্তু মেয়েটি আমার পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়েছে বেশী দিন নয়। ওর বাবার নাম কালীনাথ গাঙ্গুলী, তিনি কোথাকার আবাদের নায়েব, সেইখানেই থাকেন, বাড়িতে খুব কমই আসেন।

আমি লক্ষ্য করেছি এই মেয়েটি সকলের চেয়ে সজীব, বুদ্ধিমতী, অত্যন্ত চঞ্চলা। সকলের চেয়ে সে বয়সে যেমন বড়, সকলের চেয়ে সভ্য ও সৌখীন। কিন্তু তার একটা দোষ, কেমন একটু উদ্ধত স্বভাবের মেয়ে।

একদিন কি একটা অঙ্ক ওকে দিলাম, সবাইকে দিলাম। ওর অঙ্কটা ভুল গেল। বললাম—তুমি অঙ্কটা ভুল করলে হিরণ?

অঙ্কটা ভুলে গিয়েছে শুনে বোধ হয় ওর রাগ হ'ল—আর দেখছি সব সময়, অপর কারোর সামনে বকুনি খেলে ও খেপে ওঠে। খুব সম্ভব সেই জন্যই ও রাগের সুরে বললে—কোথায় ভুল? কিসের ভুল? ব'লে দিন না?

আমি বললাম—কাছে এস, অতদূর থেকে কি দেখিয়ে দেওয়া যায়? আমি দেখে আসছি যে কয়দিন ও এসেছে, আমার কাছ থেকে দূরে বসে।

ও উদ্ধতভাবে বললে—কেন ওখান থেকেই বলুন না? আপনার কাছে কেন যাব?

আমার মনে হ'ল ও বড় মেয়ে ব'লে আমার কাছে আসতে বোধ হয় সঙ্কোচ অনুভব করে। কিন্তু তার জন্যে ওরকম উদ্ধত সুর কেন? বললাম—কাছে এসে আঁক দেখে নিতে দোষ আছে কিছু? ও বললে—সে-সব কথার কি দরকার আছে? আপনি দিন অঙ্ক ওখান থেকেই বুঝিয়ে।

রাগে ও বিরক্তিতে আমার মন ভ'রে উঠল। আচ্ছা মেয়ে ত? মাষ্টারের সঙ্গে কথাবার্ত্তার এই কি ধরন? আর আমায় যখন এত অবিশ্বাস তখন আমার স্কুলে না-এলেই ত হয়? সেদিন আমি ওর সঙ্গে আর কোন কথাই বললাম না। পরদিনও তাই, স্কুলে এল, নিজে ব'সে ব'সে কি লিখলে বই দেখে, একটা কথাও কইলাম না। ছুটির কিছু আগে আমায় বললে—আমার ইংরিজিটা একবার ধরুন না?

আমি ওর পড়াটা নিয়ে তার পর শান্তভাবে বললাম—হিরণ, তোমার বাড়িতে ব'লো, আমি তোমাকে পড়াতে পারব না। অন্য ব্যবস্থা করতে ব'লো কাল থেকে।

হিরণ্ময়ীর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল—বললে—কেন ?

আমি বললাম—না—তুমি বড় মেয়ে, এখানে তোমার সুবিধে হবে না।

ও বললে—রাগ করেছেন নাকি ? কি করেছি আমি ?

আমি বললাম—কাল তোমার ও-কথাটা কি আমায় বলা উচিত হয়েছে হিরণ ? কি ব'লে তুমি বললে আপনার কাছে কেন যাব ?··· ওখান থেকেই বলুন না ? তুমি আমার কাছে তবে পড়তে এসেছ কেন ?···

হিরণ্ময়ী হেসে বললে—এই ! তা কি এমন বলেছি আমি ? তা যখন আপনি বলছেন দোষ হয়েছে বলাতে, তখন দোষ নিশ্চয়ই হয়েছে।

—কেন তুমি বললে ও রকম ? তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত ওকথা বলার জন্যে, তা জান ?···

হিরণ্ময়ী বললে—হাঁ, হয়েছি ! হ'ল ত ? এখন নিন।

তার পর যখন ওর অঙ্ক দেখছি, তখন হঠাৎ আমার মুখের দিকে কেমন একটা বুঝতে না-পারার দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—উঃ, আপনার এত রাগ ?···আগে ত কখনও রাগ দেখি নি এরকম ?···তখনও সে আমার মুখের দিকে সেই রকম দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করছে। ওর রকম-সকম দেখে আমি হাসি চাপতে পারলাম না—সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তে হিরণ্ময়ীকে নতুন চোখে দেখলাম। দেখলুম হিরণ্ময়ী অত্যন্ত লাবণ্যময়ী, ওর চোখ দুটি অত্যন্ত ডাগর, টানা-টানা জোড়া ভুরু দুটি কাল সরু রেখার মত, কপালের গড়ন ভারী সুন্দর, চাঁচা, ছোট, অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল।

ও তখনও আমার দিকে সেই ভাবেই চেয়ে আছে। এক মিনিটের ব্যাপারও নয় সবটা মিলে।

পরদিন থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, হিরণ্ময়ী আমার কাছ

থেকে ভজুয়ে আর বসে না—আর না ডাকলেও কাছে এসে দাঁড়ায়।

একদিন আমায় বললে—জানেন মাষ্টার-মশায়, আমার সব দল এরা—আমায় এরা ভয় করে।

অবাক্ হয়ে বললুম—কারা ?

হাত দিয়ে পাঠশালার সব ছাত্রছাত্রীদের দেখিয়ে দিয়ে বললে—এরা; আমার কথা না-শুনে কেউ চলতে পারে না।

—ভয় করে কেন ?

—এম্‌নি করে। আমি যা বলব ওদের শুনতেই হবে।

পাঠশালার সকলেরই ওপর সে হুকুম ও প্রভুত্ব চালায়, এটা এতদিন আমার চোখে পড়ে নি—সেদিন থেকে সেটা লক্ষ্য করলাম। তবে পেনো যে সেদিন ওর হাত আঁচড়ে নিয়েছিল সে আলাদা কথা। দেশের রাজার বিরুদ্ধেও ত তাঁর প্রজারা বিদ্রোহী হয় ?

রোজ রাত্রে বাসায় এসে সন্ধ্যাবেলা পরোটা গড়ি। দু-একদিন পরে সন্ধ্যাবেলা ময়দা মাখছি একা রান্না ঘরে বসে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বেশী নয়, একটা হ্যারিকেন-লণ্ঠন জ্বলছে ঘরে। কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময়ী। শশব্যস্তে উঠে বিস্মিত মুখে বললাম—হিরণ ? এস, এস, কি মনে ক'রে ?

হিরণ্ময়ীর একটা স্বভাব গোড়া থেকে লক্ষ্য করেছি, কখনই প্রশ্নের ঠিক-জবাবটি দেবে না। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে—ময়দা মাখেন বুঝি নিজে রোজ ? ওই বুঝি ময়দা মাখা হচ্ছে ?

আমি বিপন্ন হয়ে পড়লুম—চোদ্দ বছরের মেয়েকে পাড়াগাঁয়ে বড়ই বলে। আমার কাছে এ রকম অবস্থায় আসাটা কি ঠিক হ'ল ওর ? এসব জায়গার গতিক আমি জানি ত ?

বললাম—তুমি যাও হিরণ, পড়গে।

হিরণ্ময়ী হেসে বললে—তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? আমি যাব না—এই বস্‌লাম। বেজায় একগুঁয়ে মেয়ে, আমি ত জানি ওকে! বললে—একটা অঙ্ক কষে দেবেন? না—থাক, একটা গল্প বলুন না?…ও, আপনি বুঝি ময়দা মাখবেন এখন! সরুন, সরুন দিকি! আমি মেখে বেলে দিচ্ছি। কি হবে, রুটি না লুচি?…আপনি এই পিঁড়িটাতে বসে শুধু গল্প করুন।

সেই থেকে হিরণ্ময়ীর রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাকে সাহায্য করতে আসা চাই-ই। মৃদু প্রদীপের আলোতেও হাসি-হাসি মুখে সে তার খাতাখানা খুলে নামে অঙ্ক কষে—কাজে কিন্তু সে আমার রুটি পরোটা তৈরী ক'রে দেয়। কিছুতেই আমার বারণ শোনে না—ওর সঙ্গে পারব না ব'লে আমিও কিছু আর বলি নে। ওর মায়ের বারণও ও শোনে না, একদিন কথাটা আমার কানে গেল।

শুনলাম একদিন মাকে বলছে ওদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে—কেন, যাই তাই কি? আমি অঙ্ক কষতে যাই। বেশ করি—যাও।

হিরণ্ময়ীকে বললাম—শোন হিরণ, আমার এখানে সন্ধ্যাবেলা আর এস না—যখন তোমার মা বকেন। আমার কথাটা অন্ততঃ তোমার মানা উচিত। বুঝলে?

পরদিন হিরণ্ময়ী সত্যিই আর এল না। আমার সন্ধ্যাটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে ওর না আসাতে, সেদিন প্রথম লক্ষ্য করলাম। সাত-আট দিন কেটে গেল—হিরণ্ময়ী পাঠশালাতে রোজই আসে। তাকে জিজ্ঞাসা করি না অবিশ্যি কেন সে সন্ধ্যাবেলা আসে না।

একদিন সে পাঠশালাতেও এল না। দু-তিন দিন পরে জিগ্যেস্ ক'রে জানলাম সে মামার বাড়ী গিয়েছে তাঁর মায়ের সঙ্গে।

দেখে আশ্চর্য্য হলাম যে আমার পাঠশালা আর সে পাঠশালা নেই—আমার সন্ধ্যাও আর কাটে না। হিরণের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ওর মামার

বাড়ি থেকে, মেয়ে দেখাতে নিয়ে গিয়েছে—বরপক্ষ ওখানে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করবে।

মানুষের মন কি অদ্ভুত ধরনের বিচিত্র! হঠাৎ কথাটা শুনেই মনে হ'ল এ গাঁয়ের পাঠশালা উঠিয়ে দেব, অন্যত্র চেষ্টা দেখতে হবে। কেন, যখন প্রথম পাঠশালা খুলেছিলাম এ গাঁয়ে, তখন ত হিরণের অপেক্ষায় এখানে আসি নি, তবে সে থাক্‌লো বা গেল—আমার তাতে কি আসে যায়?

মাসখানেক কেটে গিয়েছে। আমি কলের মত কাজ করে যাই, একদিন সামান্য একটু বাদলামত হয়েছে—পাঠশালার ছুটি দিয়ে সকাল-সকাল রান্না সেরে নেব ব'লে রান্নাঘরে ঢুকেছি, বেলা তখনও আছে। এমন সময় দোরের কাছে দেখি হিরণ্ময়ী এসে হাসিহাসি মুখে দাঁড়িয়েছে। আমি বিস্ময়মিশ্রিত খুশীর সুরে ব'লে উঠলাম—এস, এস হিরণ,—কখন এলে তুমি? ব'সো।

হিরণ্ময়ী বললে—কেমন আছেন আপনি? তার পর সে এগিয়ে এসে সলজ্জ আড়ষ্টতার সঙ্গে ঝপ্‌ ক'রে আমার পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম ক'রে আবার সোজা হয়ে দোরের কাছে দাঁড়াল।

আমি এত খুসী হয়েছি তখন, ওকে কি বলবো ভেবেই পাইনে যেন। বললাম—ব'সো হিরণ, দাঁড়িয়ে কেন?

হিরণ্ময়ী বোধ হয় একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই এসেছিল, আমি ওর আসাটা কি চোখে দেখি—এ নিয়ে। আমার কথা শুনে—হাজার হোক্ নিতান্ত ছেলেমানুষ ত?—ও যেন ভরসা পেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা পিঁড়ি পেতে বস্‌ল। আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি সেই শিখিয়ে দিলেন, 'নয় পরিত্যাগ-প্রণালী' না কি? সব ভুলে গিয়েছি—হি-হি—

দেখলাম ওর বিয়ে হয় নি—ওকে আর কোন কথা বলি নি অবিশ্যি

তা নিয়ে। দেনা-পাওনার ব্যাপার নিয়ে সে-সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছে—দু-চার দিনে অপরের মুখে শুনলাম। আবার হিরণ্ময়ী আমার পাঠশালাতে নিত্য আসে যায়—সন্ধ্যাবেলাতেও রোজ আসে—ঝড় হোক্, বৃষ্টি হোক্, তার সন্ধ্যায় আসা কামাই যাবে না। কেন তার মা এবার তাকে বকেন না—সে কথা আমি জানি নে—তবে বকেন না যে এটা আমি জানি।

বরং একদিন হিরণ্ময়ী বললে—আজ আলো জ্বেলে একটা বই পড়ছি, মা বললে আজ যে তুই তোর মাষ্টারের কাছে গেলি নে বড়? তাই এলুম, মাষ্টার মশায়।

আমি বললাম—তা বেশ ত, গল্পের বই পড়লেই পারতে। মা না ব'লে দিলে ত আজ আসতে না?

কথাটা বলতে গিয়ে নিজের অলক্ষিতে একটা অভিমানের সুর বার হয়ে গেল—হিরণ্ময়ী সেটা বুঝতে পেরেছে অমনি! এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে এইটুকু বয়সে!—বললে—নিন্, আর রাগ করে না। ভেবে দেখুন, আপনিই না আমায় এখানে এলে তাড়িয়ে দিতেন আগে আগে?

দুঃখিত ভাবে বললাম—ছিঃ ও-কথা ব'লো না হিরণ, তাড়িয়ে আবার তোমায় দিয়েছি কবে? ও-কথাতে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

হিরণ্ময়ী মুখে কাপড় দিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে উচ্ছ্বসিত ছেলেমানুষী হাসির বন্যা এনে দিলে। ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগল—না—না দেন নি? বটে? একদিন—সেই—তাড়ালেন না! আজ আবার বলা হচ্ছে—পরে আমার সুরের নকল করতে চেষ্টা করে—'ওতে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়'—কি মানুষ আপনি!—হি-হি-হি-হি—

আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর হাসিতে উদ্ভাসিত সুকুমার লাবণ্যভরা মুখের

দিকে চেয়ে রইলাম—চোখ আর ফেরাতে পারি নে—কি অপূর্ব্ব হাসি! কি অপূর্ব্ব চোখ মুখের শ্রী!

যখন চোখ নামিয়ে নিলাম তখন সে আমার বেলুনটা তুলে নিয়ে রুটি বেলতে ব'সে গিয়েছে। সেদিন ও যখন চলে যায়, ঝোঁকের মাথায় অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই ওকে আবার বললাম—এ রকম আর এস না, হিরণ। না সত্যি বলছি তুমি আর এস না।

মনকে খুব দৃঢ় ক'রে নিয়ে কথাটা ব'লে ফেলেই ওর মুখের দিকে চেয়ে আমার বুকের মধ্যে যেন একটা তীক্ষ্ণ তীর খচ্ করে বিঁধলো। দেখলাম ও বুঝতে পারে নি আমি কেন একথা বলেছি—কি বোধ হয় দোষ ক'রে ফেলেছে ভেবে ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে উদ্বেগে ও ভয়ে।

আমার মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে রইল—যদি মুখের ভাবে কারণ কিছু বুঝতে পারে। না বুঝতে পেরে যাবার সময় দেখলাম শুষ্ক বিবর্ণ মুখে বললে—আমায় তাড়িয়ে দিলেন না? এই দেখুন—তাড়ালেন কি না।

দুঃখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। নিমগাছটার তলা দিয়ে ও ওই যাচ্ছে, এখনও বেশী দূর যায় নি, ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বলব, ছেলেমানুষকে একটু সান্ত্বনা দেব?...

ডাকলুম শেষটা না-পেরে।—শোনো ও হিরণ—শোনো—

ও দাঁড়াল না—শুনেও শুনলে না, হন্ হন্ ক'রে হেঁটে বাড়ি চলে গেল। পরদিন খুব সকালে উঠে বারান্দাতে ব'সে ব্রাউনিঙের A Soul's Tragedy পড়ছি—হিরণ এসে দাঁড়িয়ে বললে—কি কচ্ছেন?—

এস, এস হিরণ। কাল তোমাকে ডাকলাম রাত্রে, এলে না কেন? তুমি বড় একগুঁয়ে মেয়ে—একবার শোনা উচিত ছিল না কি বলছি?

মুখরা বালিকা এবার নিজমূর্ত্তি ধরলে। বললে—আমি কি কুকুর

না শেয়াল, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবেন, আবার তু ক'রে ডাকলেই ছুটে আস্‌ব? আপনি বুঝি মনে ভাবেন আমার শরীরে ঘেন্না নেই, অপমান নেই—না? আমি বলতে এলাম সকালবেলা যে আপনার পাঠশালায় আমি পড়তে আসব না—মা অনেক দিন আগেই বারণ করেছিল—তবুও আস্‌তাম, তাদের কথা না-শুনে। কিন্তু যখন আপনি কুকুর-শেয়ালের মত দূর ক'রে তাড়িয়ে—

ওর চোখে জল ছাপিয়ে এসেছে—অথচ কি তেজ ও দর্পের সঙ্গে কথাগুলো বললে সে! আমি বাধা দিয়ে বললাম—আমায় ভুল বুঝো না, ছিঃ হিরণ—আচ্ছা, চেঁচিও না বেশী, কেউ শুন্‌লে কি ভাববে। আমার কথা শোন—রাগ করে না ছিঃ।

হিরণ দাঁড়াল না এক মুহূর্ত্ত। অতটুকু মেয়ের রাগ দেখে যেমন কৌতুক হ'ল, মনে তেমনই অত্যন্ত কষ্টও হ'ল। কেন মিথ্যে ওর মনে কষ্ট দেয়েছি কাল? আহা, বেচারী বড় দুঃখ ও আঘাত পেয়েছে। আমার জ্ঞান আর হবে কবে? ছেলেমানুষকে ও-কথাটা ও-ভাবে বলা আমার আদৌ উচিত হয় নি।

মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল—ভাবলাম, এ গ্রামের পাঠশালা তুলে দিয়ে অন্যত্র যাবই। এদিকে হিরণ্ময়ীও আর আমার পাঠশালাতে আসে না। মাসের বাকী আটটা দিন পড়িয়ে নিয়ে পাঠশালা তুলে দেব ঠিক ক'রে ফেললাম। সবাইকে বলেও রাখ্‌লাম কথাটা। আগে থেকে যাতে সবাই অন্য ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারে।

যাবার দু-দিন আগে জিনিষপত্র গোছাচ্ছি—হঠাৎ হিরণ্ময়ী নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে কখন দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে ওর দিকে চাইতেই হেসে ফেললে। বললে—আপনি নাকি চলে যাবেন এখান থেকে?

আমি বললাম—যাবই ত। তার পর এত দিন পরে কি মনে করে?

হিরণ্ময়ী তার অভ্যাসমত আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বললে—কবে যাবেন?

—বুধবারে বিকেলে, গাড়ী ঠিক করা আছে, চাকদাতে গিয়ে উঠ্‌ব।

হিরণ্ময়ী একবার ঘরের চারি ধারে চেয়ে দেখলে। বললে—আপনার সে বড় বাক্সটা কই?

—সেটা কানুর বাবার কাছে বিক্রী ক'রে ফেলে দিয়েছি। অত বড় বাক্স কি হবে, তা ছাড়া সঙ্গে টেনে টেনে নিয়ে বেড়ানোও মুস্কিল।

হঠাৎ হিরণ্ময়ী ঝপ্‌ ক'রে মেজেতে ব'সে পড়ল—কর্ত্তৃত্ব ও আত্ম-প্রত্যয়ের সুরে বললে—না আপনি যেতে পারবেন না। দেখি দিকি কেমন যান?

আমার হাসি পেল ওর রকম দেখে। খুব আনন্দও হ'ল—একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ হ'ল। বললাম—তোমার তাতে কি, আমি যাই আর না-যাই? তুমি ত আর এত দিন উঁকি মেরেও দেখতে আস নি হিরণ, তুমি আমার পাঠশালা পর্য্যন্ত যাওয়া ছেড়েছ।

—ইস্! তাই বই কি!

—তুমি ভেবে দেখ তাই কি না। উড়িয়ে দিলে চলবে না, হিরণ। আমি যাবই ঠিক করেছি, তুমি আমায় আট্‌কাতে পারবে না।

কারুর জন্যে কারুর আট্‌কায় না—এ তুমি নিজেই আমায় একদিন বলেছিলে।

হিরণ্ময়ী বালিকাসুলভ হাসিতে ঘর ভরিয়ে ফেলে বললে—ওই! কথা যদি একবার সুরু ক'রে দিলেন, ত কি আর আপনার মুখের বিরাম আছে? কারুর জন্যে কারুর আটকায় না, হেন না তেন না—মাগো—কথার ঝুড়ি একেবারে!

—সে যাই হোক্, আমি যাবই।

কক্‌খনো না। ইঃ, বললেই হ'ল যাব!

আমি চুপ ক'রে রইলাম—ছেলেমানুষের সঙ্গে তর্ক ক'রে আর লাভ কি?

দেখি যে বিকেলে পাঠশালায় হিরণ্ময়ী বইখাতা নিয়ে হাজির হয়েছে। সে এসে সব ছেলেমেয়েকে বলে দিলে আমার পাঠশালা উঠবে না, আমি কোথাও যাব না, সবাই যেন ঠিক মত আসে। এমন সুরে বললে যে সে যেন আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। বললে—এই হাবু, মাষ্টারমশায় তোমায় বলেছিলেন না ধারাপাত আনতে—কেন আননি ধারাপাত? এই সোমবারের হাট থেকে আনতে ব'লে দেবে। বুঝলে?

হাবু বোকার মত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে—মাষ্টার-মশাই যে সোমবারে চলে যাবেন এখান থেকে?

হিরণ্ময়ী তাকে এক তাড়া দিয়ে বললে—কে বলেছে চলে যাবেন? মেরে হাড় ভেঙে দেব ছোঁড়ার! যা বলছি তা শোন্। বাঁদর কোথাকার—

আমি বললাম—কেন ওকে মিথ্যে বক্‌ছ হিরণ, ছেলেমানুষকে—ওর দোষ কি, আমি যাবই, কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

হিরণ্ময়ী ঝঙ্কার দিয়ে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা, হবে। যাবেন ত যাবেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অনেক দিন পরে ও রান্নাঘরে এসে ঢুকল। বললে—গুড়ের ভাঁড়টা কই!

—সেটা তিনকড়িদের দিয়ে দিইছি। দু-দিনের মত খানিকটা গুড় ওই বাটীতে রেখেছি—দুটো দিন ওতেই চলে যাবে।

হিরণ্ময়ী অন্য দিনের মত বসল না দাঁড়িয়ে রইল। একবার বাইরে যাবার সময় ও সরে দরজার কপাটের আর দেওয়ালের মধ্যের যে জায়গাটুকু, সেখানটাতে দেখি জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে গেলাম—ওখানে না, ওখানে না—কাপড়ে কালিটালি লেগে যাবে কি না—বার হয়ে এস—

ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখি ওর ডাগর চোখদুটি জলে ভ'রে টল্ টল্ করছে। হিরণ্ময়ীর চোখে জল! অবাক্, এ দৃশ্য ত কখন দেখি নি! ও জল-ভরা ধরা-গলায় বললে—আপনি বলুন, যাবেন না, মাষ্টার মশায়। আমি তখন পাঠশালায় বলতে পারলাম না ওদের সামনে। ওরা হাসবে তাহ'লে। আর কেউ নয়—আর সবাই আমায় ভয় করে, কেবল ওই মণ্টুটা বড় দুষ্টু!

তার পর আমার দিকে চোখের জল আর হাসি-মিশানো এক অপূর্ব্ব দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—যাবেন না, কেমন?

হিরণ্ময়ী এই প্রথম দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলে—এর আগে কখন দেখি নি। ছেলেমানুষ, ও কথা ত তেমন জানে না, কিন্তু ওর ডাগর সজল চোখের মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি ওর ভাষার দৈন্য ঘুচিয়ে দিয়ে এমন কিছু প্রকাশ করলে—এক জাহাজ কথাতে তা প্রকাশ করা যেত না।

আমার মনে অনুতাপ হ'ল—কেন ওকে মিথ্যে কাঁদালাম সন্ধ্যাবেলাটিতে?

জীবনের এই-সব মুহূর্ত্তেই না মানুষে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে? ব্রাউনিঙের 'পলিন্' কবিতার সেই সর্ব্বহারা লোকটির মত আমার মনও ব'লে উঠল :—I believe in God and Truth and Love !…

ওর হাতটি ধ'রে দরজার কপাটের ফাঁক থেকে বার ক'রে এনে আস্তে আস্তে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে দিয়ে বললাম—ওখানে সন্ধ্যাবেলা দাঁড়াতে নেই। বিছেটিছে বেরুতে পারে—এখানে বোস। রুটিগুলো বেলে দাও দিকি, লক্ষ্মীমেয়ে। আমি যাব না—বলছ তুমি যখন, তখন আর যাব না। চোখের জল ফেলতে আছে অবেলায়? ছিঃ—

তার পরই রুটি তৈরী করতে ব'সে যে হিরণ্ময়ী, সেই হিরণ্ময়ী—সেই মুখরা বালিকা, যে সকল কথা, এমন কর্তৃত্বের সুরে বলে যেন ওর কথা না মেনে চললে ও ভয়ঙ্কর একটা কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করবে, সেটা আবার খুব কৌতুকপ্রদ এবং ভেবে দেখলে করুণ বলেই মনে হয়, যখন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে মুখের বুলিটুকু ছাড়া ওর হুকুমের পেছনে ওর কোন জোর খাটাবার নেই—নিতান্ত অসহায় ও নিরুপায়।

প্রেম আসে এই সব সামান্য তুচ্ছ খুঁটিনাটি সূত্র ধ'রে। বড় বড় ঘটনাকে এড়ান সহজ, কিন্তু এই সব ছোট জিনিষ প্রাণে গেঁথে থাকে—ফলুই মাছের সরু চুল-চুল কাঁটার মত। গায়ের জোরে সে কাঁটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেলে, বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে বই কমে না।

পুরুষমানুষ প্রেমের ব্যাপারে আত্মরক্ষা ক'রে চলতে পারে না, যেটা অনেক সময়ে মেয়েরা পারে। যেখানে যা হবার নয়, পাবার নয়, সেখানেও তারা বোকার মত ধরা দিয়ে বসে থাকে—এবং নাকালও তার জন্যে যথেষ্ট হয়। কিন্তু পুরুষমানুষই আবার বেগতিক

বুঝলে যত সত্বর হাবুডুবু খেতে খেতেও সাঁতরে তীরের কাছে আসতে পারে—মেয়েরা গভীর জলে একবার গিয়ে পড়লে অত সহজে নিজেদের সামলে নিতে পারে না।

তবুও আমি হিরণ্ময়ীকে দূরে রাখবার চেষ্টাই করলাম।

একদিন দুপুরের পরে হিরণ্ময়ীদের বাড়িতে পুলিস এসেছে শুনলাম। পুলিস কিসের? একে ওকে জিগ্যেস্ করি কেউ সঠিক উত্তর দেয় না অথচ মনে হ'ল ব্যাপারটা সবাই জানে। এগিয়ে গেলুম—ওদের বাড়ির সামনের তেঁতুলতলায় বড় দারোগা চেয়ার পেতে ব'সে—পাড়ার লোকদের সাক্ষ্য নেওয়া চলছে। দেখলাম গ্রামে ওদের বড় মিত্র কেউ নেই। আমি আগেও যে এ-কথা না-জানতাম এমন নয়—তবে পাড়াগাঁয়ের কাণাঘুষোতে কান দিই নি।

বিকেলের দিকে হিরণ্ময়ীর মা আর বিধবা দিদিকে থানায় ধ'রে নিয়ে গেল। কাছারির মুহুরী সাতকড়ি মুখুয্যে আমার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে বললে—ও মেয়েটার তত দোষ দিই নে—মা-ই যত নষ্টের গুরুমশাই। ওই ত ওকে শিখিয়েছে? নইলে মেয়েটার সাধ্যি কি—কিন্তু মাগী কি ডাকাত! মেয়েটার প্রাণের আশঙ্কা করলি নে একবারও?

ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরি হ'ল না। সাতকড়ি আরও বললে—কালীনাথ গাঙুলী কি গ্রাম ত্যাগ করেছে সাধে? এই জন্যেই সে বাড়িমুখো হয় না, ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না।

এত কথা আমি কিন্তু জানতাম না—এই নতুন শুনলাম। আমি মুস্কিলে পড়ে গেলাম—আমি এখন কি করি? হিরণ্ময়ীর মা আর দিদি দোষী কি দোষী নয়—সে বিচারের ভার আছে অন্য বিচারকের ওপর—সাতকড়িমুখুয্যের ওপর নয়। কিন্তু এদের মোকদ্দমা উঠলে

উকীল নিযুক্ত কে করে, এদের স্বার্থ বা কে দেখে, এদের জন্যে পয়সা-খরচই বা কে করে ?

এদিকে আর এক মুস্কিল। ওর মা আর দিদিকে যখন ধ'রে নিয়ে গেল, হিরণ্ময়ী তখন ওদের বাড়ির সামনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে অন্ধকার রাত, সে রাত্রে সে একাই বা বাড়িতে থাকে কেমন ক'রে, বাড়িতে আর যখন কেউই নেই—অথচ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেউ তাকে নিজের বাড়িতে ডাকলে না। সন্ধ্যার সময় ও-পাড়ার কৈলাস মজুমদারের স্ত্রী এসে ওকে ও-অবস্থায় দেখে বললেন—ওমা, এ মেয়েটা এখানে একা দাঁড়িয়ে আছে যে! ছেলেমানুষ, বাড়িতে একা থাকবেই বা কি ক'রে? ওর মা দিদি কি করেছে জানি নে—কিন্তু ওকে আমি চিনি। ও পাগলী, আনন্দময়ী। এস ত মা হিরণ, তোমাদের হারিকেনটা বাড়ির ভেতর থেকে নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে এস। ওকে জায়গা দিলে যদি জাত না থাকে—তবে না থাকল তেমন জাত?

মজুমদার-গিন্নী যদি কোন কথা না ব'লে নিঃশব্দে হিরণ্ময়ীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন, তবে হয়ত কোনই গোলযোগ বাধতো না—কিন্তু শেষের কথাটি ব'লে ফেলে তিনি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কাজ ক'রে বসলেন। কাছেই গ্রামের সমাজপতি আচায্যি-মশায়ের বাড়ি। তাদের সঙ্গে বাধলো তুমুল ঝগড়া। শশধর আচার্য্যের স্ত্রী অনেকক্ষণ নিজের মনে একতরফা গেয়ে যাবার পর উপসংহারে বললেন—ও বড় ভাল মেয়ে—না? মুখ খুললেই অনেক কথা বেরিয়ে পড়বে। সব জানি, সব বুঝি। চুপ ক'রে থাকি মুখ বুঁজে—বলি মাথার ওপর এক জন আছেন, তিনিই দেখবেন সব—আমি কেন বলতে যাই?

মজুমদার-গিন্নী বললেন—যা কর ন-বৌ, আবার এ মেয়েটার নামে কেন যা তা বলছ? সেটাই কি ভগবান সইবেন?

আচায্যি-মশায়ের স্ত্রী বারুদের মত জ্বলে উঠলেন—আরও দ্বিগুণ চেঁচিয়ে বললেন—ধর্ম্ম দেখোনা ব'লে দিচ্ছি, ভাল হবে না। ওই রয়েছে মুখুয্যেরা, ভট্‌চায্যিরা জিগ্যেস্ কর গিয়ে। ওই মেয়ে ওই পাঠশালার মাষ্টার-ছোকরার কাছে রাত বারটা অব্‌ধি কাটিয়ে আসে—রোজ তিন-শ তিরিশ দিন। সারা রাত্তিরও থাকে এক-এক দিন। বলুক ও মেয়েই বলুক, সত্যি না মিথ্যে। ভেবেছিলুম কিছু বলব না—মরুক্ গে, যার আস্তাকুঁড়, সেই গিয়ে ঘাঁটুক, না ব'লে পারলাম না। কে ও মেয়েকে ঘরে জায়গা দিয়ে কালকে আবার একটা হাঙ্গামা বাধাতে যাবে?

আমি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলুম, কথা বলি নি—কোন পুরুষমানুষ উপস্থিত ছিল না ব'লে। চেঁচামেচি শুনে আচায্যি-মশায়, সাতকড়ি ও সনাতন রায় ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়াতেই আমি এগিয়ে গিয়ে বললুম—আপনারা আমার মায়ের মত—আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, হিরণকে এ ঝগড়ার মধ্যে মিথ্যে আনবেন না। ও আমার ছাত্রী, ছেলেমানুষ, আমার কাছে যায় সন্ধ্যেবেলা গল্প শুনতে—কোনদিন পড়েও। রাত নটা বাজতেই চলে আসে। একটা নিষ্পাপ নিরপরাধ মেয়ের নাম এ-সবের সঙ্গে না-জড়ানই ভাল! মা, আপনি ওকে বাড়িতে নিয়ে যান।

এতে ফল হ'ল উলটো। ঝগড়া না থেমে বরং বেড়ে উঠল। মজুমদার মশায়ের দুই ছেলে ও ছোট ভাই এসে মজুমদার-গিন্নীকে বকাবকি করতে লাগল—তিনি কেন ওপাড়া থেকে এসে এই-সব ছেঁড়া ল্যাটার মধ্যে নিজেকে জড়াতে যান? এ বয়সেও তাঁর জ্ঞান যদি না-হয় তবে আর কবে হবে···তিনি চলে আসুন বাড়ি। এ-পাড়ার ব্যবস্থা এ-পাড়ার লোকে বুঝবে, তিনি কেন মাথাব্যথা করতে যান—ইত্যাদি।

যাকে নিয়ে এত গোলমাল, সে ভয়ে ও লজ্জায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েই আছে ওদের বাড়ির সদর দরজায়। ওর চোখে একটা দিশেহারা ভাব, লজ্জার চেয়ে চোখের চাউনিতে ভয়ের চিহ্নই বেশী। ওর সেই কথাটা মনে পড়ল—জানেন, মাষ্টার-মশায়, আমায় সবাই ভয় করে, সবাই মানে এ পাড়ায়—আমার সঙ্গে লাগতে এলে দেখিয়ে দেব না মজা?

বেচারী মুখরা হিরণ্ময়ী!

শেষ পর্য্যন্ত কৈলাস মজুমদারের স্ত্রী ওকে না নিয়েই চলে গেলেন। তাঁর দেওর ও ছেলেরা একরকম জোর করেই তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আমি তখন এগিয়ে গিয়ে বললুম—হিরণ, তুমি কিছু ভেব না। আমি এতক্ষণ দেখছিলাম এরা কি করে। যে ভয়ে তোমাকে ডাকতে পারি নি, সে ভয় আমার কেটে গিয়েছে। তুমি একটু একলা থাক—আমি কাওরাপাড়া থেকে মোহিনী কাওরাণীকে ডেকে আনছি। সে তোমার ঘরের বারান্দাতে শোবে রাত্রে। তা'হলে তোমার রাত্রে একা থাকবার সমস্যা মিটে গেল। আর এক কথা—তুমি রান্না চড়িয়ে দাও। চাল-ডাল সব আছে ত?

কাওরাপাড়া থেকে ফিরে আসতে আধ ঘণ্টার বেশী লাগল। মোহিনী-বুড়ীকে চার আনা পয়সা দিয়ে রাত্রে হিরণদের বাড়িতে শোবার জন্যে রাজী করিয়ে এলুম। ফিরে এসে দেখি দালানের চৌকাঠে বসে হিরণ্ময়ী হাপুস্ নয়নে কাঁদছে। অনেক ক'রে বোঝালুম। বড় কষ্ট হ'ল ওকে এ অবস্থায় দেখে। বললে—মার আর দিদির কি হবে মাষ্টার-মশায়? আপনি কালই বাবাকে একটা চিঠি লিখে দিন। ওদের ফাঁসি হবে না ত?

হেসে সান্ত্বনা দিলাম। বললাম—রাঁধ হিরণ। খাওয়াদাওয়া কর।

কিছু ভেব না—আমি কাল রাণাঘাট যাব। ভাল উকীল দিয়ে জামিনে খালাস ক'রে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব, ভয় কি?

হিরণ কিছুতেই রাঁধতে চায় না—শেষে বললে—আপনিও—এখানে খাবেন কিন্তু। ঠিক ত?

ও রাঁধছে ব'সে, আমাকে রান্নাঘরেই বসে থাকতে হ'ল—ও যেতে দেয় না, ছেলেমানুষ, ভয় করে। কেবল জিগ্যেস্ করে মা আর দিদির কি হবে।

রান্না হয়ে গেল, ঠাঁই ক'রে আমায় ভাত বেড়ে দিলে। এদিকে হিরণ বড় অগোছালো, কুটনো-বাটনা, এটো-কাঁটা, ভাতের ফেন, ডালের খোসাতে রান্নাঘর এমন নোংরা ক'রে তুলেছে! ভাত বাড়তে গিয়ে উনুনের পাড়ে আঁচল লুটিয়ে পড়েছে—নিতান্ত আনাড়ি।

বললাম—দিনমানে কোন রকমে একা থেক। আমি সন্ধ্যের আগেই রাণাঘাট থেকে ফিরবো। রেঁধে খেও কিন্তু। না হ'লে বড় রাগ করব।

মোহিনী কাওরাণী এল রাত ন'টার পরে। তার পরে আমি আমার বাসায় চলে এলুম।

পরদিন রাণাঘাটে গিয়ে দেখি কেস্ ওঠে নি আদালতে। উকীল ঠিক ক'রে তার সঙ্গে জামিনের কথাবার্ত্তা ব'লে এলুম। ফিরবার সময় হিরণ্ময়ীর জন্যে দু-একটা জিনিষ কিনে নিলুম ওকে একটু আনন্দ দেবার জন্যে। ফিরে দেখি ও ব'সে ব'সে আবার কাঁদছে কালকার মত। সারাদিন বোধ হয় রাঁধে নি, কিছু খায় নি। স্নানও করে নি, দু-এক গাছা রুক্ষ চুল মুখের আশেপাশে উড়ছে। মহা বিপদে প'ড়ে গেলুম ওকে নিয়ে। কি করি এখন? ওর বাবাকে আজ রাণাঘাটে পৌঁছেই টেলিগ্রাম করেছি, যদি তা পেয়ে থাকেন, তবে কাল তিনি

এসে পৌঁছলেও ত বাঁচি। নইলে হিরণ্ময়ীকে ভাবছি কালীগঞ্জে বৌদিদির কাছে কি রেখে আসব? কারণ, এসে শুনলুম মোহিনীবুড়ী ব'লে গিয়েছে সে রাত্রে এখানে আর শুতে আসতে পারবে না।

ও আমায় দেখেই ছুটে এসে বললে—মাকে দিদিকে দেখে এলেন, মাষ্টার-মশাই? তারা কেমন আছে? খালাস পেলে না?

আমি ওদের নিজে দেখতে যাই নি, উকীলের মুখে হিরণ্ময়ীর সংবাদ-পাঠিয়ে বলেছিলুম হিরণ্ময়ীর জন্য যেন তারা কিছু না ভাবে। বললাম সে কথা।

তার পর হিরণ্ময়ী আমাকে বালতী ক'রে জল তুলে দিলে স্নানের জন্যে—ঘরে প্রদীপ জ্বেলে উনুন ধরিয়ে চায়ের জল চড়ালে। রাণাঘাট থেকে ওর জন্যে কিছু খাবার এনেছিলুম, তার বেশী অর্দ্ধেক আমায় রেকাবী ক'রে চায়ের সঙ্গে জোর ক'রে খাওয়ালে—তার পর রান্না চাপিয়ে দিলে। ওর মনে সুখ নেই, কেমন যেন মুসড়ে পড়েছে ছেলেমানুষ, নইলে ওর মত হাস্যময়ী আনন্দময়ী চঞ্চলা মেয়ে এতক্ষণ কত কথা বলত, হাসি-খুশীতে ঘর ভরিয়ে তুলত।

একবার জিগ্যেস্ করলে—রাণাঘাটে নাকি সার্কাস এসেছে সবাই বলে? দেখেছেন আপনি? এত দুঃখের মধ্যেও ওর ছেলেমানুষী মন সার্কাসের সম্বন্ধে কৌতুহলী না হয়ে পারে নি ভেবে আমার হাসি পেল।

এ-রাত্রে মোহিনী-বুড়ী এল না—আমি ওকে ঘরের মধ্যে রেখে বাইরের বারান্দাতে শুয়ে রইলুম। বারান্দায় বিছানা পাতছি, ও আবার এত সরলা, নিষ্কলুষ—আমায় অবাক হয়ে জিগ্যেস্ করলে আপনি বাইরে শোবেন কেন?

কোন নীতিবাদের সঙ্কোচ এনে ফেলে ওর নিষ্পাপ মনে দাগ দিতে

আমার বাধল। বললুম—দেখছ না কি রকম গরম আজ? বাইরে শোয়াই আমার অভ্যেস তা ছাড়া।

সারারাত দু-জনে গল্প ক'রে কাটালুম। ও ঘর থেকে কথা বলে, আমি বারান্দা থেকে তার উত্তর দিই। বাবা বোধ হয় কাল আসবেন, না? মা দিদি কবে আসবে? সার্কাসওয়ালা কোথায় তাঁবু ফেলেছে? কলকাতায় কখনও যায় নি—একবার যাবার ইচ্ছে আছে। কলকাতার থিয়েটার দেখতে কেমন? চৌধুরীরা বোধ হয় মোহিনী-বুড়ীকে বারণ ক'রে দিয়েছে এখানে আসতে। আমার শীত করছে কিনা। রাত বেশী, ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে দেবার একটা মোটা চাদর দেবো? আরব্য-উপন্যাসের মত গল্প আর নেই। আচ্ছা, অঙ্ক কত দূর শেখা যায়? বিদ্যার শেষ নেই—না? এম-এ পাস করে আরও পড়া যায়, পড়বার আছে?

ওর বাবা এলেন পরদিন সকাল দশটার সময়। তাঁর মুখে শুনলুম পুলিস থেকে তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে শীঘ্র বাড়ি এসে মেয়ের ভার নিতে। তিনি অত্যন্ত বদ্‌মেজাজী লোক, দু-একটা কথা শুনেই বুঝতে দেরী হ'ল না। আমার ওপর আদৌ তিনি প্রসন্ন হ'তে পারলেন না—তাঁর মেয়ের তত্ত্বাবধান করার জন্যে একটা ধন্যবাদ দেওয়া ত দূরের কথা, সেটাকেই তিনি আমার একটা অপরাধ ব'লে গণ্য ক'রে নিলেন এবং যে মুখুয্যে ও চৌধুরীরা পরশু সন্ধ্যেবেলা হিরণ্ময়ীকে বাড়িতে জায়গা দিতে চায় নি তাদেরই বাড়িতে খোষামোদ ক'রে তাদের সঙ্গে এ-বিপদে পরামর্শ চাইতে গেলেন।

আরও একটা ব্যাপার দেখলুম তিনি হিরণ্ময়ীকে আদৌ দেখতে পারেন না। আমার সামনেই ত তাকে তাড়না, তর্জ্জন-গর্জ্জন যথেষ্ট করলেন এ নিয়ে, যে সে-রাত্রে চৌধুরী-গিন্নীর পায়ে পড়ে কেন অনুরোধ

করে নি তাকে জায়গা দেবার জন্যে। কারণ, তারা দেখলুম লাগিয়েছে যে তাদের কি আর ইচ্ছে ছিল না ওকে জায়গা দেবার? ও মেয়ের তা ইচ্ছে নয়। হিরণের অপরাধ সে মুখ ফুটে কারও কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে নি। এ ওরা কেউ বুঝল না যে, হিরণের বয়সের মেয়েরা মুখে কোন নাটুকে-ধরনের কথা বলে আশ্রয় চাইতে পারে না পরের কাছে—বিশেষ ক'রে হিরণ্ময়ীর মত একটু তেজী মেয়েরা।

আমি হিরণ্ময়ীর ভার থেকে মুক্ত হয়ে কালীগঞ্জে চলে এলুম পরদিন সকালেই। শুনেছিলুম হিরণ্ময়ীর মা ও দিদি রাণাঘাট থেকে প্রমাণাভাবে খালাস পেয়ে এসেছেন।

কালীগঞ্জে এসে বসলুম বটে, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, মনের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে। হিরণ্ময়ীর সেই শুক্‌নো মুখখানা কেবলই মনে পড়ে, সেদিন সন্ধ্যার সময় ওর যে মুখ দেখেছিলাম, যেদিন ওর মাকে আর দিদিকে থানায় নিয়ে গেল। হিরণ্ময়ীর ব্যথা,··· হিরণ্ময়ীর দুঃখ,···ওই রকম বাড়িতে, ওই গাঁয়ের আবহাওয়ায় হিরণ্ময়ীর মত মেয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়বে। কেই বা দেখবে, বুঝবে ওকে? একদিন মালতীর সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই ভাবতুম। কত ভেবেছি। এখন বুঝি কি দুর্জ্জয় অভিমান করেই চলে এসেছিলাম ওর কাছ থেকে! কিছুতেই সে অভিমান ভাঙলো না। তার পর দাদা মারা গেলেন, দাদার সংসার পড়ল ঘাড়ে, নইলে হয়ত আবার এত দিন ফিরে যেতাম। কিন্তু বৌদিদিদের নিয়ে ত দ্বারবাসিনীর আখড়াতে গিয়ে উঠতে পারি নে? এক সময় যার ভাবনায় কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে, সেই মালতী এখন আমার মনে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসছে—হয়ে এসেছে। আর ত তাকে চোখে দেখলুম না? ক্রমে তাই সে দূরে গিয়ে পড়ল। কি করব, মনের ওপর জোর নেই—নইলে আমি কি বুঝতে পারি নে কত বড় ট্র্যাজেডি এটা মানুষের জীবনের?

শ্রীরামপুরের ছোট-বৌঠাকৃরুণ আজ কোথায়? কে বলবে কেন এমন হয়!

১৭

একদিন আবার হিরণ্ময়ীকে দেখবার ইচ্ছে হ'ল। তখন মাস দুই কেটে গিয়েছে, কামালপুরে আর যাই নি. সেখানে আমার বাসায় জিনিষ-পত্র এখনও রয়েছে—সেগুলো আনবার ছুতো করেই গেলুম সেখানে। মাস দুই পরে, গ্রাম ঠাণ্ডা হয়েছে, কেবল শুনলুম হিরণ্ময়ীরা একঘরে হয়ে আছে। হিরণ্ময়ী আগেকার মতই ছুটে এল আমি এসেছি শুনে। এখানে ওর চরিত্রের একটা দিক আমার চোখে পড়ল—লোকে কি বলবে এ-ভয় ও করে না—এখানে মালতীর সঙ্গে ওর মিল আছে। কিন্তু মালতীর সঙ্গে ওর তফাৎও আমি বুঝতে পারি। হিরণ্ময়ী যেখানে দেবে, সেখানে পেছন ফিরে আর চায় না—মালতীর নানা পিছুটান। সবাই সমান ভালবাসতেও পারে না। প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রতিভার প্রয়োজন আছে। খুব বড় শিল্পী, কি খুব বড় গায়ক যেমন পথেঘাটে মেলে না—খুব বড় প্রেমিক বা প্রেমিকাও তেমনি পথেঘাটে মেলে না। ও প্রতিভা যে কোন বড় সৃজনী প্রতিভার মতই দুর্লভ। এ-কথা সবাই জানে না, তাই যার কাছে যা পাবার নয়, তার কাছে তাই আশা করতে গিয়ে পদে পদে ঘা খায় আর ভাবে অন্য সবারই ভাগ্যে ঠিকমত জুটেছে, সে-ই কেবল বঞ্চিত হয়ে রইল জীবনে। নয়ত ভাবে তার রূপগুণ কম, তাই তেমন ক'রে বাঁধতে পারে নি।

হিরণ্ময়ীর তনুলতায় প্রথম যৌবনের মঞ্জরী দেখা দিয়েছে। হঠাৎ যেন বেড়ে উঠেছে এই দু মাসের মধ্যে। আমায় বললে—কখন এলেন? আসুন আমাদের বাড়িতে। মা বলে দিলেন আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে। কত দিনের ছুটি দিয়েছিলেন পাঠশালাতে, দেড় মাস পরে খুললো?

—ভাল আছ হিরণ? উঃ মাথায় কত বেড়ে গিয়েছ?

—এত দিন কোথায় ছিলেন? বেশ ত লোক? সেই গেলেন আর আসবার নামটি নেই।

হয়ত দু-বছর আগেও এ-কথা কেউ বললে বেদনাতুর হয়ে ভাবতাম আহা, দ্বারবাসিনীতে ফিরলে মালতীও আমায় এ-রকম বলত। কিন্তু সময়ের বিচিত্র লীলা। এ সম্পর্কে মালতীর কথা আমার মনেই এল না।

দু-দিন কামালপুরে রইলাম, হিরণ্ময়ী এ কথা ভাবে নি যে, আমি আমার জিনিষপত্র আনতে গিয়েছি ওখানে, সে ভেবেছিল আমি আবার পাঠশালা খুলব। ওখানেই থাকব। এবার কিন্তু সে আসবার সময় তর্ক, ঝগড়া করলে না, যেমন ক'রে থাকে। ও শুধু শুক্‌নো মুখে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আমার যাওয়া। ওর সে আগেকার ছেলেমানুষী যেন চলে গিয়ে একটু অন্য রকম হয়েছে। তবুও কত অনুরোধ করলে ওখানে থাকবার জন্যে—গাঁ এখন ভাল হয়ে গিয়েছে, কেন আমি যাচ্ছি, গাঁয়ের ছেলেরা তবে পড়বে কোথায়?

কামালপুর গাঁ পিছু ফেলেছি, মাঠের রাস্তা, গরুর গাড়ী আস্তে আস্তে চলেছে। কি মন খারাপ যে হয়ে গেল! মাঠের মধ্যে কচি মটর-শাক, খেঁসারি-শাকের শ্যামল সৌন্দর্য, শিরিষগাছের কাঁচা সুঁটি ঝুলছে, বাসুদেবপুরের মরগাঙের আগাড়ে নতুন ঘাসের ওপর গরুর দল চ'রে বেড়াচ্ছে। হিরণ্ময়ীর নিরাশার দৃষ্টি বুকে যেন কোথায় বিঁধে রয়েছে,

খচ্ খচ্ ক'রে বাজছে। বেলা যায় যায় চাকদারু বাজার থেকে গুড়ের গাড়ীর সারি ফিরছে, বোধ হয় বেলে কি চুয়াডাঙ্গার বাজারে রাত কাটাবে। জীবনটা কি যেন হয়ে গেল, এক ভাবি আর হয়, কোথায় চলেছি আমিই জানি নে। কেনই বা অপরের মনে এত কষ্ট দিই? এই রাঙা রোদমাখান মটর মুসুরির মাঠ যেন বটেশ্বরনাথের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সন্ধ্যায় গঙ্গার বুকে বড় বড় পাল তুলে নৌকোর সারি মুঙ্গেরের দিকে যেত, আমি মালতীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাষাণ-বাঁধানো ঘাটের ওপর বসে বসে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতুম। সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন। ঐ মরগাঙের ওপারে জমা সন্ধ্যার কুয়াশার মত —ফাঁকা, দু-দিনের জিনিষ। এখানে ফল পাকে না। জেরুসালেম পাথরের দেশ।

এর কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ীর বাবা আমার কাছে এলেন কালীগঞ্জে। আমায় একবার তাঁদের ওখানে যেতে হবে, হিরণ্ময়ী বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছে। আর একটা কথা, মেয়ের বিয়ে নিয়ে তিনি বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি গরিব, অবস্থা আমি সবই জানি, গ্রামের সমাজে একঘরেও বটে। দু-তিন জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছিল, নানা কানাঘুসো শুনে তারা পেছিয়ে গিয়েছে। মেয়েও বেজায় একগুঁয়ে, তাকে দেখতে আসছে শুনলেই সে বাড়ি থেকে পালায়। অত বড় মেয়ে, এখনও জ্ঞান-কাণ্ড হ'ল না, চিরকাল কি ছেলেমানুষী করলে মানায়? সুতরাং তিনি বড় বিপদে পড়েছেন, আমি যদি ব্রাহ্মণের এ দায় উদ্ধার না-করি তবে তিনি, কালীকান্ত গাঙ্গুলী সম্পূর্ণ নিরুপায়। আমার কি মত?

আমি আর কিছুই ভাবলাম না, ভাবলাম কেবল হিরণ্ময়ীর আশাভাঙা

চোখের চাউনি আর তার শুকনো মুখ, সেদিন যখন জিনিষপত্র বাঁধছি সেই সময়কারের।

একদিন হিরণ্ময়ী বললে—একটা কথা শোন। যেদিন তুমি প্রথম পাঠশালাতে পড়াতে এলে, আমি তোমার কাছে গেলাম, সেদিন থেকে তোমায় দেখে আমার কেমন লজ্জা করত। সেই জন্যে কাছে বসতে চাইতাম না। তার পর তুমি একদিন রাগ করলে, তাতে আমারও খুব রাগ হ'ল; তুমি তার পর বললে—আমাদের গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। সেদিন ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। এত কান্না আসতে লাগল, কান্না চাপতে পারি নে, পাছে কেউ টের পায়, ছুটে পেছনের সজ্‌নেতলায় চলে গেলাম। সব যেন ফাঁকা হয়ে গেল মনের মধ্যে। উঃ মাগো, সে যে কি দিন গিয়েছে!

হিরণ্ময়ী গুছিয়ে কথা বলতে শেখে নি এখনও।

ভগবান জানেন বিয়ের সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। সপ্ত-সমুদ্র পারের কোন দেশে অনেক দূরে এই সব সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে একটি হাস্যমুখী তন্বী কিশোরী প্রদীপ-হাতে ভাঙা বিষ্ণুমন্দিরে সন্ধ্যা দেখাতে যেত কত যুগ আগে···পুকুর পাড়ের তমাল-বনের আড়ালে তার সঙ্গে সেই যে সব কত সুখ দুঃখের কাহিনী, কত ঠাকুর দেবতার কথা, সে সব সত্যি ঘটেছিল, না স্বপ্ন? কোথায় গেল সে মেয়েটি? আর তাকে তেমন ক'রে ত চাই না? যেন কত দূরজন্মে তার

সঙ্গে সে পরিচয়ের দিনগুলো কালের কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে—তাকে যেন চিনি, চিনি, চিনি না। কেন তার স্মৃতিতে মন আর নেচে ওঠে না? কোথায় গেল সে-সব দিন, সে-সব প্রদীপ দেখানো সন্ধ্যা?

বছরখানেক পরে একদিন রাণাঘাট ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে আছি। মুর্শিদাবাদের ট্রেন থেকে অনেকগুলো বৈষ্ণব নামলো। তারা যাবে খুলনার গাড়ীতে। তাদের মধ্যে এক জনকে পরিচিত ব'লে মনে হ'ল। কাছে গিয়ে দেখি দ্বারবাসিনীর আখড়ার সেই নরহরি বৈরাগী—যে একবার জীব-গোস্বামীর পদাবলী গেয়েছিল। সে পয়লা নম্বরের ভবঘুরে, মাঝে মাঝে আখড়ায় আসত, আবার কোথায় চলে যেত। নরহরিও আমায় চিনলে, প্রণাম ক'রে বললে—এখানে কোথায় বাবু? এটা কি দেশ নাকি? আপনি ত অনেক দিন দ্বারবাসিনী যান নি। আর যাবেনই বা কি, সব শুনেছেন বোধ হয়; আখড়া আর সে আখড়া নেই। দিদিঠাকুরুণ মারা যাওয়ার পরে—

—কে?

—কেন আপনি জানেন না? মালতী দিদি-ঠাক্‌রুণ ত আজ বছর-চারেক মারা গিয়েছেন।

আমি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। নরহরি আপন মনেই ব'লে যেতে লাগল—এখন উদ্ধবদাসের এক ভাইপো তার সেবাদাসী নিয়ে কোথা থেকে এসে জুটেছে। সেই এখন কর্ত্তা! উদ্ধবদাস ত বুড়ো হয়েছে, সে কিছু দেখে-শোনে না। এখন অতিথ-বোষ্টম গেলে আর জায়গা হয় না। মালতী দিদি-ঠাক্‌রুণ ত মানুষ ছিলেন না, স্বর্গের দেবী ছিলেন, কি বাপের মেয়ে! তিনি স্বর্গে চ'লে গিয়েছেন,